নিগূঢ়ানন্দ
সহস্রারের পথে
BanglaBook.org

মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্র তন্ত্রে সহস্রার হিসেবে উল্লেখিত। সাধক মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীকে ষট্‌চক্র ভেদ করে সেই সহস্রারে নিয়ে গিয়ে সিদ্ধি অর্জন করেন। সেই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি প্রত্যেকেরই মধ্যে আছে। যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো ব্যক্তিকেই সেই কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে অলৌকিক অভিজ্ঞতা দিতে পারে। কারো বা দীর্ঘ সাধনায় কুলকুণ্ডলিনী জাগরিতা হন, কারো বা পূর্বজন্মের সংস্কারের ফলে বিচিত্র পরিবেশে অকস্মাৎ তা জেগে উঠে। বর্তমান কাহিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের কুণ্ডলিনী-সাধনার এক সত্যিকারের কাহিনি। লেখক নিজের সাধনজীবনের সত্যিকারের বিচিত্র কাহিনি এতে বর্ণনা করেছেন।

সহস্রারের পথে

নিগূঢ়ানন্দ

দে'জ পাবলিশিং ।। কলকাতা ৭০০০৭৩

সহস্রারের পথে

সুধাংশুশেখর দে

বন্ধুবরেষু

মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্র তন্ত্রে সহস্রার হিসেবে উল্লেখিত। সাধক মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনীকে ষট্‌চক্র ভেদ করে সেই সহস্রারে নিয়ে গিয়ে সিদ্ধি অর্জন করেন। সেই কুলকুণ্ডলিনী শক্তি প্রত্যেকেরই মধ্যে আছে। যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো ব্যক্তিকেই সেই কুলকুণ্ডলিনী জাগ্রত হয়ে অলৌকিক অভিজ্ঞতা দিতে পারে। কারো বা দীর্ঘ সাধনায় কুলকুণ্ডলিনী জাগরিতা হন, কারো বা পূর্বজন্মের সংস্কারের ফলে বিচিত্র পরিবেশে অকস্মাৎ তা জেগে উঠে। বর্তমান কাহিনি দ্বিতীয় পর্যায়ের কুণ্ডলিনী-সাধনার এক সত্যিকারের কাহিনি। লেখক নিজের সাধনজীবনের সত্যিকারের বিচিত্র কাহিনি এতে বর্ণনা করেছেন। কুলকুণ্ডলিনী জাগরণের সাধনায় লেখকের নিজের ব্যক্তিগত বহু অভিজ্ঞতা আছে। সেই অভিজ্ঞতার আলোতে শেষ অধ্যায়টি বর্ণনা করেছেন। আজ লেখকের occult faculty বহুজন বিদিত। যে-কোনো ব্যক্তিকে পনেরো দিনের মধ্যে দিব্যজগৎ প্রদর্শন করাতে পারেন।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

সাধক-জ্যোতিষী ননীগোপাল ভট্টাচার্য (বালি)
যোগসিদ্ধসাধক সরোজকুমার লাহিড়ী (বাক্সাড়া, হাওড়া)
সিদ্ধসাধক নিত্যানন্দ মহারাজ (গুপ্তিপাড়া, নদীয়া)
ধর্মপ্রাণ মৃত্যুঞ্জয় সামন্ত (বেহালা ফটো স্টোর্স)

বাংলাবুক.অর্গ ওয়েবসাইটে স্বাগতম

নানারকম নতুন / পুরাতন বাংলা বই এর পিডিএফ ডাউনলোড করার জন্য আমাদের ওয়েবসাইটে (BANGLABOOK.ORG) আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

সোশ্যাল মিডিয়াতে আমাদেরকে পাবেন :

বহুদিন আগের কথা। তখন সবেমাত্র বোধহয় এম. এ. পাশ করেছি। মানবদেহের যেখানেই মননশক্তির কেন্দ্রস্থল হোক না কেন, সেখানে শুধুমাত্র আমার কল্পনার জাল বুনন চলেছে। সামনে অপরিসীম রঙিন ভবিষ্যৎ। জীবনের শিক্ষা, ইতিহাসের শিক্ষা কোনোটাই প্রায় নেই। জীবনে ইতিমধ্যেই বহু বেদনা ও বঞ্চনা পেয়েছি। কিন্তু সে-সব বিস্মৃত হয়ে নির্লজ্জ লতার মত নতুন আশ্রয় জড়িয়ে ধরে আবার উঠবার চেষ্টা করছি। প্রবল ইচ্ছা বিপুলস্পন্দন পুঁইয়ের ডগার মত শুধু বেড়েই চলেছে। কে কখন দুটো ডগা কেটে নিয়ে গেছে তা নিয়ে বেদনায় মুহ্যমান হবার মত দৈন্য নেই। নবসঞ্চিত বিপুল প্রাণশক্তি শুধুই রঙিন এক ভবিষ্যতের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। যৌবনের এটাই ধর্ম। এই প্রচণ্ড প্রাণাবেগ কখনও ক্ষীণশক্তি হবে একথা ভাবা যায় না। মরুভূমিতেও দ্রাক্ষাকুঞ্জ পাওয়া যাবে বলে সে বিশ্বাস রাখে।

আমি তখন স্বপ্ন দেখছি বড় লেখক হব, বড় নামকরা ব্যক্তি হব। শত সপ্রশংস দৃষ্টির মধ্যে আমি বিশেষ এক ব্যক্তি হিসেবে বিদ্যমান। মানুষের ক্ষেত্র তার শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, বিজ্ঞানভিত্তিক দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, এইসব। এর বাইরে কিছু থাকলে থাকতেও পারে, তা নিয়ে মাথা ব্যথা নেই। ঈশ্বর বলে কেউ থাকতে পারেন থাকুন। কনভেনশনাল বিশ্বাসের মধ্যে তাঁর অস্তিত্ব যেভাবে যেটুকু আছে থাক, তাকে বিঘ্নিত করার কোনো ইচ্ছে নেই। রক্তের ধারা আপন সংস্কারবশত তাকে যতটুকু নোয়াবে, নুব্জ হব। তার বাইরে ভক্তির ভারে, বিশ্বাসের ভারে নত হবার মত কিছুমাত্র প্রচেষ্টা নেই। বিচারবিহীন মনে ঠাকুর-দেবতা, মঠ-মন্দির, থান ইত্যাদি আছে। এ সবের অস্তিত্ব, অঙ্গপ্রত্যঙ্গের রোমরাজির মত সহজ হয়ে আছে বলেই আছে। বিশেষ দৃষ্টি মেলে দেখতে গেলে হয়তো সংঘর্ষ হত। থাকতো কি থাকতো না বলা দায়।

ভারতীয় শাস্ত্রগ্রন্থগুলির মধ্যে একমাত্র উপনিষদগুলির উপরই কিছুটা শ্রদ্ধা আছে তার বাচনভঙ্গির জন্য। বেদের সংহিতা পর্বের ওপর আস্থা নেই। অনেক বক্তব্যই অবিশ্বাস্য এবং আজগুবি বলে বোধহয়। অপরিপক্ক মনের স্বপ্নবিলাস বলেই বেদের সংহিতা পর্বের শ্লোকগুলিকে মনে হয়। তবে সত্যকে হাতড়ে বেড়াবার সেখানে একটা প্রয়াস আছে। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্ত টাইপের কিছু সূক্তের মধ্যে এ প্রয়াসের প্রমাণ আছে। অথর্ববেদে একটা উন্নত চিন্তা ও দার্শনিকতার ছোঁয়া আছে। এর বাইরে আছে লজিকভিত্তিক ষড়দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, ইত্যাদি। ভারতীয় মনের এক বিশেষত্বের ছাপ আছে সেখানে। কিন্তু জঘন্যতম অষ্টাদশ পুরাণের কোনোটাতেই বিশ্বাস নেই, বরং

পুরাণ এবং পুরাণাশ্রিত সাহিত্যের ওপর বিরাট একটা ঘৃণার ভাব আছে। মহাভারতকে ইতিহাস বলেই ভাবি। তার অধ্যাত্মচিন্তার কোনো মূল্যই নেই আমার কাছে একমাত্র ভগবদ্‌গীতার অংশটুকু ছাড়া। রামায়ণকে একটা সুললিত কাব্য বলেই চিন্তা করি, তার বাইরে কিছু নয়। তবে বঙ্গসাহিত্যের কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসের প্রতি একটা করুণামিশ্রিত অবজ্ঞা আছে। মুসলমান আক্রমণে পলাতক দুর্বল বাঙালি-মনের আশ্রয়স্থল এই সময়ের রামায়ণ, মহাভারত ও মঙ্গলকাব্যগুলি। অবিশ্বাস্য গাঁজাখুরি গল্প ও বিশ্বাসে ভর্তি। বৈষ্ণব বিনয় ও পরকীয়া প্রেমের রীতি আমার মধ্যে হাসির উদ্রেক করে। পদাবলী কীর্তন শোনার কিছুমাত্র মানসিকতা নেই। বস্তুত আজও নেই। রামপ্রসাদ কমলাকান্ত ইত্যাদি শাক্তসাধকদের শ্যামাসঙ্গীত অবশ্য শুনি। বুঝি না বুঝি, বিশ্বাস করি না করি, শুনি। রক্তের ধারায় একটা শাক্ততন্ত্রের উত্তরাধিকার আছে বলে শুনি। বাঙালির রক্তে রক্তে শাক্তধর্মের প্রবাহ, তাইতো বাঙালির অধ্যাত্মিকতার পরিচয় দিতে গিয়ে বলা হয়েছে 'কালিকা বঙ্গদেশে চ।'

জাতপাত তো মানিই না, আশ্রমও মানি না। ভক্ষ অভক্ষ কিছুই বিচার করি না। আসলে কিছুই মানি না বটে, চলি সংস্কারের ঠেলাতে। বিশ্লেষণ করে সেই কথাটুকু বলতে পারি না এই যা। আমাদের অন্তরে কাজ করে সংস্কার, বাইরে কাজ করে আধুনিক জ্ঞান। দুয়ের সংঘাতে আমাদের যে একটা করুণ অবস্থা সেটা বুঝবার চেষ্টা করি না। আমরা অধিকাংশ আধুনিক হিন্দু self-contradiction-এ ভুগি। আমিও হয়তো তখন ভুগতাম।

একদিন যাচ্ছিলাম এক ধর্মসভার পাশ দিয়ে। একজন রক্তাম্বর পরিহিত সাধক ক্ষুদ্র একটি ভক্ত সমাবেশে ভাষণ দিচ্ছিলেন। অদ্ভুত সব কথা বলছিলেন। আমার সঙ্গে কয়েকজন বন্ধু ছিলেন। সবাই তারুণ্যে উজ্জ্বল। যৌবনে ভরপুর। স্বাস্থ্যে তারুণ্য ও যৌবনের তেমন চাকচিক্য না থাকলেও মনে আছে। আধুনিক রোমান্টিক কাব্যপ্রবাহে আমরা তখন ভাসমান। আমাদের আদর্শ তখন জীবনানন্দ দাশের কাব্য। সবাই পাখির নীড়ের মত দুটি চোখের কাছে নিজেদের সমর্পণ করে দেবার স্বপ্ন নিয়ে বসে আছি। শাক্ত সন্ন্যাসীর উদ্ভট দেহতত্ত্ব বর্ণনা নিতান্তই বেখাপ্পা লাগছিল। সাধক বলছিলেন; দেহের লিঙ্গমূলের কাছে কোথায় নাকি একটি পদ্ম আছে। সেই পদ্মকে বলে মূলাধার। সেই মূলাধারে নাকি একটা শিবলিঙ্গ আছে। তাঁকে সাড়ে তিন প্যাঁচে জড়িয়ে ধরে একটি সর্প নিদ্রিত রয়েছে। সেই সর্প জাগরিত হলে মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত সুষুম্না নাড়ির কয়েকটি স্তরে অবস্থিত আরও চারটি পদ্ম অতিক্রম করে সে নাকি শেষপর্যন্ত ভ্রূমধ্যস্থ আজ্ঞা চক্রে গিয়ে পৌঁছায়। তখন নাকি অলৌকিক দর্শন হয়, ঈশ্বর দর্শন হয়। তাঁর বক্তব্য ও বিশ্বাসের কথা শুনে আমার এক বন্ধু আর হাসি চাপতে পারল না। সে তখন সাম্যবাদী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত। কার্ল মার্কসের বস্তুবাদী ইতিহাস-চর্চায় বিশ্বাস করে। সে ফিক্‌ফিক্ করে

হেসে উঠল।

তা শুনে পেছনে বসা কয়েকজন বৃদ্ধ গর্জন করে উঠলেন, কী হচ্ছে তোমাদের? ভাল না লাগে চলে যাও।

আর একজন বললেন, 'দিন দিন দেশটা জাহান্নামে যেতে চলেছে।' আর একজনের কথা শোনা গেল, 'এ-সব হল সিনেমা থিয়েটারের ফল। রাজনীতির ফল।'

গুঞ্জরণ যেন ক্রমশ গর্জনে পরিণত হল। সাময়িককালের জন্য বক্তার বক্তব্য বন্ধ হয়ে গেল। তিনি স্থির দৃষ্টিতে পেছনে আমাদের দিকে তাকালেন। তারপর মাইকেই বললেন, 'কী হচ্ছে ওখানে?' একজন বোধহয় পাশ থেকে তাঁকে বলল, 'কয়েকটি ছেলে গোলমাল করছে।' মাইকেই তাঁর কণ্ঠ ধ্বনিত হল, 'হ্যাঁ তা তো করবেই। ধর্মকথায় মতি হবে কেন? মেরুদণ্ড যাদের নেই, মেরুদণ্ড আশ্রিত শক্তির কথা তাদের মনে ধরবে কেন? শক্তিক্ষয়ের পথে এগিয়ে চলেছে ওরা, শক্তি অর্জন করবে কেন?'

আমার যে বন্ধুটি হেসে উঠেছিল সে আমার হাত ধরে টানল, চল্।

পাশ থেকে দুজন বুড়ো ভদ্রলোক বলে উঠলেন, হ্যাঁ, হ্যাঁ, যাও। সৎ উদ্দেশ্যে মতি হবে কেন?

বোধহয় একটা প্রত্যুত্তর করতে যাচ্ছিল বন্ধুটি। এবার আমিই তাকে টেনে বাইরে নিয়ে এলাম।

বন্ধুটি বাইরে এসে গজগজ করতে লাগল : এইসব লোকের জন্যই দেশ জাহান্নামে যেতে চলেছে। চতুর্দিকে অনাচার অবিচার চলেছে, তার প্রতিকারের কোনো চেষ্টা নেই, অর্থহীন ধর্ম নিয়ে কচকচি। আসলে এইসব সাধু-সন্ন্যাসীরা শাসকশ্রেণীর এক ধরনের দালাল। মূল সমস্যা থেকে জনগণের দৃষ্টি বাইরে সরিয়ে দেয়। এইজন্যই কার্ল মার্কস ধর্মকে opium of the people বলেছেন। যদিও মূল কথাটা প্রুধোঁর।

সবাই গিয়ে একটা চায়ের দোকানে বসলাম। গরম চায়ে ভেতরের উত্তেজনা দমন করবার চেষ্টা করলাম। বন্ধুদের মধ্যে একজন ছিল রমেন ব্যানার্জি। রক্ষণশীল বাঁড়ুজ্জে পরিবারের ছেলে। সে চুপ করেছিল। ভাবেসাবে মনে হচ্ছিল, সাধু সন্তদের নিয়ে সমালোচনা তার তেমন পছন্দ নয়। জামার নিচে তার বুকে যে পৈতে ঝোলানো ছিল সেই পৈতেই বোধহয় তাকে এ ব্যাপারে একটা শাসনের মধ্যে রেখেছিল। চা খেতে খেতে তার সেই পৈতের দিকে নজর পড়তে আমার সাম্যবাদী বন্ধুটি, যার নাম ভূপেন বক্সী, সে বলল, একালের ছেলে হয়ে এখনও গলায় দড়ি নিয়ে ঘুরে বেড়াস কেন রমেন?

রমেন নিজেও জানে না পৈতের মানে কী। এ বাপারে না রাখার পক্ষে বা বিপক্ষে তার কোনো যুক্তিই নেই। রক্তের বিন্দুতে বিন্দুতে রয়েছে যুগযুগ সঞ্চিত একটা সংস্কারের ধারা। সেই সংস্কারের কাছে সে অন্ধভাবে আত্মসমর্পণ করে দিয়েছে এই

যা। এর লাভালাভ, গুণাগুণ কিছুই সে বিচার করে দেখে নি। দেখার মানসিকতাও নেই। বামুনের ছেলে হয়ে পৈতে গলায় রাখতে হয় তাই রেখেছে। পৈতে গলায় নিয়েও সে আধুনিকতার আমেজ রাখতে অখাদ্য-কুখাদ্য খেতে দ্বিধা করে না। কিন্তু পৈতেটা খুলে ফেলার জন্য মনের কাছ থেকে তেমন সাড়াও পায় না। ভূপেন বলল, অধিকাংশ মানুষই জীবনে বড় একটা contradiction নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। এই contradiction আর মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বুঝলি রমেন, একটা ছাড়; হয় এদিক, নয়তো ওদিক। দু'নৌকোতে পা দিয়ে চলা যায় না। তাতে নিজেরই সর্বনাশ হয় সব চাইতে বেশি।

আমার তৃতীয় বন্ধু দ্বিজেন সরকার বলল, 'পৈতে ছাড়ার হিম্মত ওর নেই, মুখে যতই ফট্‌ফট্‌ করুক না কেন। ওর গুরু কে জানিস তো?' আমরা সকলেই দ্বিজেনের দিকে তাকালাম। দ্বিজেন বলল, 'ওর গুরু হলেন ওঁকারনাথ জী। কলিযুগে ব্রাহ্মণ অবতার। বলে, একমাত্র বামুন ছাড়া আর কারো নাকি 'ওঁ' উচ্চারণের অধিকার নেই।' ভূপেন প্রায় দাঁত খিঁচিয়ে উঠল, 'শালা আমার। বানচোদ্‌ একেবারে 'ওঁ'কার পেটে নিয়ে জন্মেছে। যেন একচেটিয়া মালিকানাস্বত্ব।' হাতের সিগারেটটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে পকেট থেকে কলমটা বের করল। সাদা এক টুক্‌রো কাগজে 'ওঁ' লিখল। তারপর জুতোর নিচে ফেলে তাতে তিনটি লাথি মেরে বলল, তোর 'ওঁ'কারের তেইশ মারি।

আমি বললাম, ঐ করেই কি 'ওঁ'কারকে খতম করা যাবে? একদিন ইয়ং বেঙ্গল Down with Hinduism বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল। গরুর মাংস খেয়ে প্রতিবেশীর উঠানে হাড় ছুড়ে ফেলেছিল। কিন্তু তাতে কোনো ফয়দা হয়নি।

ভূপেন বলল, সেযুগ আর এযুগে ফারাক অনেক। ইয়ংবেঙ্গল এ-সব করেছিল একটা হুজুগে, by conviction করেনি। এটা বিজ্ঞানের যুগ, বিচারের যুগ। বিজ্ঞানের কাছেই এ-সব ভোঁতা অস্ত্র ঘায়েল হয়ে যাবে।

ভূপেনকে বললাম, যাই বলিস তাই বলিস, কোথায় যেন হিন্দুধর্মের শক্ত একটা ভিত আছে। সেই ভিতের ওপর তার মূল দাঁড়িয়ে আছে। যুগের পর যুগ ভারতবর্ষের হিন্দুসমাজ আর ধর্ম তো কম বিপদের মুখে পড়েনি! তবু কি করে টিকে আছে! শক হূণদের আক্রমণ সে কাটিয়ে উঠেছে। সেই আক্রমণে ভারতবর্ষ থেকে বৌদ্ধধর্ম লুপ্ত হয়েছে বটে, কিন্তু হিন্দুধর্ম লোপ পায়নি! মুসলমানরা ভারতের মাটি থেকে বৌদ্ধধর্মের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে দিয়েছিল, কিন্তু ৭১২ খ্রিঃ থেকে চেষ্টা করে ১৮৫৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যেও এ ধর্মকে এ-দেশের মাটি থেকে উৎপাটিত করতে পারেনি। মিশর, ইরান, মধ্য এশিয়া এইসব দেশে সে-সব দেশের প্রচলিত ধর্মকে ধ্বংস করে দিতে ইসলামের পাঁচ-সাত বছরের বেশি সময় লাগেনি। কিন্তু ভারতবর্ষে কয়েক শতাব্দী ধরে চেষ্টা করেও এ-দেশের ধর্মকে সে মুছে দিতে পারেনি। ইংরেজ শাসক ও খ্রিস্টান

পাদ্রীদের সুচতুর কলাকৌশলও বেশি লোককে হিন্দুধর্মের বুক থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে খ্রীস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করতে পারেনি। সুতরাং...

ভূপেন বলল, এ-দেশের লোকগুলো মূলত রক্ষণশীল। সেই রক্ষণশীল মানসিকতার জন্যই পুরানো বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরে রয়েছে। আর ভারতীয় সমাজের Socio economic backgroundও এতকাল তেমন পাল্টায়নি। তাই পুরানো ধর্ম এখনও এ-দেশে টিকে আছে। শিল্পবিপ্লবের পর সামাজিক পটভূমি অনেকটাই পাল্টে গেছে। পুরানো বিশ্বাস আঁকড়ে থাকা আর কিছুতেই সম্ভব নয়। বিজ্ঞান চোখে আঙুল দিয়ে ধীরে ধীরে ধর্মের ভুলগুলি ধরিয়ে দিচ্ছে। সুতরাং একাল আর সেকাল এক সময় নয়। মূলত ধর্মবিশ্বাসের কোনো ভিত্তিই নেই।[১]

গরম চা খেয়ে ভেতরের উত্তেজনা কিছুটা দমন করা গেল। তবে ভূপেন আর বিজেন যতটা গরম হয়েছিল আমি আর রমেন ততটা গরম হইনি। ভূপেন যে contradiction-এর কথা বলল, আমাদের মধ্যে সেই contradiction আছে বলেই হয়তো আমরা গরম হইনি। আমি ব্যক্তিগতভাবে রাজনীতি ও ধর্মনীতিকে পৃথক করে দেখি। ইউরোপের ধর্ম চার্চের সংগঠনভিত্তিক। খ্রিস্টানদের মূলতত্ত্ব যা-ই হোক না কেন, ওদের চার্চ-সংগঠন ধর্মকে সত্যতা থেকে অনেক দূরে সরিয়ে দিয়েছিল। সেইজন্য ইউরোপীয় যাজক সম্প্রদায় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। শেষপর্যন্ত রাজনীতিটা ওদের লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায়। ধর্ম একটা আবরণের মত কাজ করে। ফ্রান্সের গীর্জাগুলি প্রভূত সম্পত্তির মালিক ছিল। সেই সম্পদ নিজেদের হাতে রাখার জন্য এমন ব্যবস্থা করেছিল সামন্তপ্রভুরা যাতে ধর্ম আধ্যাত্মিকতা থেকে আরও দূরে সরে গিয়েছিল। সামন্তপ্রভুদের জ্যেষ্ঠ পুত্রেরা জমিদারী পেতেন। মধ্যম পুত্রেরা পেতেন বড় বড় সরকারি কাজ, সামরিক বিভাগের কাজ। কনিষ্ঠ পুত্রেরা ধর্ম প্রতিষ্ঠানে যেতেন এবং গির্জার জমিদারী ভোগ করতেন। তারা মূলত ছিল ভোগী। চার্চের জমিদারী আয় থেকে ভোগই করত। ধর্মের আবরণটা রাখত লোক-ঠকানোর জন্য। এইজন্য ষোড়শ লুই এক সময় বিশেষ একটি খ্রিস্টীয় গির্জায় বিশপ নিয়োগ সম্পর্কে বলেছিলেন, Let me at least appoint a bishop who believes in God.

এই ধরনের যে ধর্মযাজকের দল, তারা রক্ষণশীল রাজনীতির পাশে এসে দাঁড়াত। ফলে ধর্ম বিকৃত হয়ে ওঠে। সম্ভবত প্রধোঁকে অনুসরণ করে এই জন্যই Karl Marx বলেছিলেন, Religion is opium of the people. ফ্রান্সের ধর্মযাজকদের সম্পর্কে যে কথা, ইউরোপের প্রায় সব দেশের ধর্মযাজকদের ক্ষেত্রেও সেই কথা প্রযোজ্য। রাশিয়ার পবেদনোস্তেভ ও রাসপুটিনও এই ধরনের ধর্মীয় নেতা ছিলেন। এইজন্য

---

১. অবশ্য বর্তমান বিজ্ঞান প্রাচীন ধর্মের মূল তত্ত্বগুলিকেই সমর্থন করছে। 'ওঁ রূপ শব্দব্রহ্মণ তো সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক। লেখকের 'দিব্য জগৎ ও দৈবী ভাষা' ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ফরাসি বিপ্লবের সময় যেমন রুশ বিপ্লবের সময়ও তেমনি বিপ্লবীরা ধর্মের বিরুদ্ধে গিয়েছিল। বিপ্লবের পর রাশিয়াতে Anti-God Society গঠিত হয়েছিল।

ভারতবর্ষেও যে কোনো কোনো সময়ে এমনতর ঘটনা ঘটেনি তা নয়। ভারতবর্ষে সাংগঠনিক ধর্মপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে বৌদ্ধদের সময়। ফলে একসময় বৌদ্ধ বিহারগুলিও বড় বড় জমিদারির মালিক হয়ে দাঁড়ায়। তারাও ইউরোপের ধর্মযাজকদের মত ব্যবহার করতে থাকে। বৌদ্ধসঙ্ঘে অনাচার প্রবেশ করে। ভারতের মাটি থেকে বৌদ্ধধর্মের দ্রুত অবক্ষয়ের কারণগুলির মধ্যে এটিও একটি। তবে মূলত ভারতবর্ষের ধর্মীয় নেতারা রাজনীতির সঙ্গে তেমন যুক্ত নন। একালে কিছু মিশনারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে বটে তবে সেগুলি সেবার আদর্শকেই বেশি করে গ্রহণ করেছে, রাজনীতিকে নয়। কিছু কিছু গুরু আছেন, যাঁদের ভূমিকা লজ্জাজনক। তাঁরা বড়লোকের পোঁ-ধরা। সাধারণ মানুষের কাছে 'প্রতিক্রিয়াশীলতার দুর্গ' বলে চিহ্নিত। এঁদের জন্য ভারতবর্ষের ধর্মকে কেউ যদি এক সময়ে opium বলে চিহ্নিত করে তাহলে অন্যায় কিছু হয় না। কিন্তু এছাড়া, ভারতের সাধু-সন্ন্যাসীরা রাজনীতির ধার ধারেননি কখনও। তাঁদের জীবনে কোনো ধরনের বিলাসব্যসন নেই। তাঁরা কৌপীনসম্বল মাত্র। আহার? এক টুকরো রুটি। কেউ কেউ শ্মশানে মড়ার মাংস অবধি খেয়ে থাকেন। হিমালয়ের গিরিকন্দরে যাঁরা থাকেন তাঁরা ফলাহারী। প'হারী অনেক সন্ন্যাসীও আছেন। তাঁরা কখনও রাজরাজড়ার কাছে আসেন না। রাজরাজড়ারাই বরং এঁদের ভেট করার জন্য তাঁদের কাছে করুণাপ্রার্থী হন। কিন্তু রাজরাজড়ার করুণার প্রতি এঁদের বিন্দুমাত্র আকর্ষণ নেই। উনবিংশ শতকের শ্রেষ্ঠ বাঙালি সাধক শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন, 'টাকা মাটি।' অর্থের প্রতি এঁদের বিন্দুমাত্র লোভ নেই। আলেকজান্ডার যখন ভারতে এসেছিলেন, তক্ষশিলাতে তখন এক চমকপ্রদ সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলেন। পৃথিবীর ঐশ্বর্য দেখিয়েও মহামান্য আলেকজান্ডার তাঁকে প্রলুব্ধ করতে পারেননি। ক্ষমতা দেখিয়েও ভীতি সঞ্চার করতে পারেননি। একালের একজন সাধক, বালানন্দ ব্রহ্মচারী একবার যখন কাশীপুর এসেছিলেন, মহারাজ প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁকে নিজগৃহে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তাতে বালানন্দজী বলেছিলেন, 'উস্কো আনে বোলো, হামভি তো মহারাজ হ্যায়।' এইতো আমার দেশের সাধু-সন্ন্যাসী। রাজরাজড়ার তাঁরা ধার ধারেন না। তাঁরা ত্যাগের জীবন গ্রহণ করেছেন। দিয়েছেন। কারো কাছ থেকে প্রত্যাশা করেননি কখনও। বরং ধর্মের গ্লানি দেখা দিলে ধর্মপ্রতিষ্ঠানগুলিই তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে।

একসময় যখন ভারতবর্ষে ধর্মের গ্লানি দেখা দিয়েছিল, ব্রাহ্মণ্যধর্ম অনাচারে ফুলে-ফেঁপে উঠেছিল, তখন ভগবান গৌতমবুদ্ধ ও মহাবীর জিন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রচার করেছিলেন। আবার বৌদ্ধধর্মে যখন অনাচার প্রবেশ করে, তখন ব্রাহ্মণ্যধর্মের নবজাগরণ হয়ে বৌদ্ধধর্ম পড়ে যায়। ব্রাহ্মণ্যধর্মে অনাচার

দেখা দিলে ভাগবত ধর্ম বা বৈষ্ণব ধর্ম সামাজিক সাম্যের দাবি নিয়ে আত্মপ্রকাশ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ধর্মের গ্লানি রোধ করার জন্যই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কোনো সাধু-সন্ন্যাসীই তখন কৌরব পক্ষের কাছে মাথা লুটিয়ে দিয়ে দুর্যোধনের অনাচারকে সমর্থন জানাতে আসেননি। ইউরোপের ধর্মযাজকেরা যখন দুর্নীতিপরায়ণ রাজশক্তির পক্ষে এসে দাঁড়িয়েছিল, হয়তো মনে হতে পারে যে, মার্টিন লুথার বা ক্যালভিন তাদের কাছে নতি স্বীকার না করে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। কিন্তু মার্টিন লুথার বা ক্যালভিনের আন্দোলন সম্পর্কে যাঁরা জানেন, তাঁরা ভাল করেই জানেন যে, নবজাগ্রত ইউরোপের জাতীয় স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রশ্ন কি ভাবে এঁদের পেছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। সুতরাং সেই ধর্মান্দোলন যতটা ছিল রাজনৈতিক ততটা আধ্যাত্মিক নয়। কিন্তু ভারতের ধর্মান্দোলনের মূল লক্ষ্যই ছিল আধ্যাত্মিক। তবে সামাজিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতেও ভারতীয় অধ্যাত্মপুরুষেরা কুণ্ঠিত হননি। যেমন, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, গৌতম বুদ্ধ, মহাবীর জিন বা মধ্যযুগের ভক্তি আন্দোলনের ভারতীয় ধর্মগুরুরা। ধর্মীয় ও সামাজিক অনাচারের বিরুদ্ধেই এই ভক্তি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সুতরাং ভারতবর্ষের ধর্ম কখনই প্রতিক্রিয়াশীলতার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি। তাকে opium বলে চিহ্নিত করে কোনো লাভ নেই।

দ্বিজেন ও ভূপেনের চিন্তাধারা আমার এবং রমেনের তেমন পছন্দ নয়। যদিও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় আমরা এক, তবুও ধর্ম ও রাজনীতিকে আমরা পৃথক করে দেখি।

চা খাওয়া শেষ হলে আমরা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোলাম। দ্বিজেন ও ভূপেন গেল একদিকে। রমেন আমাকে নিয়ে আর একদিকে। কিছু দূর এগিয়ে যাবার পর রমেন আমাকে বলল, কোথায় যাবি এখন?

বললাম, কোথায় আর, বাড়ি যাব।

—চল্। এক জায়গায় যাই।

—কোথায়?

—জ্যোতিষীর কাছে।

—জ্যোতিষে বিশ্বাস করিস?

—জানিস এ এক আশ্চর্য জ্যোতিষী। অদ্ভুত বলে।

—তোর কিছু ফলেছে?

—হ্যাঁ।

—কী?

রমেন চুপ করে থাকল।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী ফলেছে?

ও একটু ম্রিয়মান হয়ে বলল, মাধুরীকে যে আমি পাব না, তাই বলেছিলেন।

আমি জানি রমেন তার পাশের বাড়ির মেয়ে মাধুরীকে ভালবাসত। কিন্তু সে যে ওকে পাবে না একথা তো সর্বজনসত্য ছিল। আমাদের দেশে মেয়ে, অভিভাবকদের মাথায় বোঝা হলেও, সেই বোঝা যত্রতত্র তাঁরা নামিয়ে দিতে রাজি নন। উপযুক্ত ছেলে পেলেও এখনও অনেকেই অসবর্ণে বিবাহ দেন না। বেকার পাত্র তো প্রশ্নের মধ্যেই আসে না। রমেন বেকার। তার পক্ষে কোনো মেয়েকে বিয়ে করার স্বপ্নই তো বাতুলতা। প্রেম নিতান্ত অবুঝ বলেই বেকারত্বের ধার ধারে না, সম্ভব-অসম্ভব বিচার করে না। সেইজন্য পূর্বাহ্নেই আমি রমেনকে সাবধান হতে বলেছিলাম। রমেন হয়নি। যে-কোনো কমনসেন্সের লোকই এ ধরনের প্রেমের পরিণতি বলে দিতে পারে। এ-জন্য জ্যোতিষীর প্রয়োজন হয় না। তবু, জ্যোতিষীদের জন্য আমাদের অন্তরের অন্তঃস্থলে কোথায় যেন একটি দুর্বলতা আছে। হয়তো আবহমান কালের সংস্কার ও রক্তের ধারাই আমাদের সে-পথে পরিচালিত করে। সেই দুর্বলতা আমারও ছিল। ভবিষ্যৎ এক গজ সামনেও আমাদের কাছে অন্ধকার। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আশার কোনো বাণী নেই। এই কারণে স্বাভাবিক ভাবেই ভবিষ্যৎ-বক্তাদের প্রতি, গণৎকার জ্যোতিষীর প্রতি আমাদের একটা দুর্বলতা আছে। সেই দুর্বলতা থেকেই রমেনের প্রস্তাবে সায় দিলাম, চল।

রমেন আমাকে নিয়ে হাঁটতে লাগল।

দুই

ভিড় যে না ছিল তা নয়। যত মানুষের দুঃখ-দুর্দশা বাড়ছে, ততই ভাগ্য জানার জন্য ভিড় হচ্ছে। ভাগ্যবাদ ভারতীয়দের জাতীয় চরিত্রের বিরাট এক ত্রুটি সন্দেহ নেই। তবু, 'জেনেশুনে বিষ করেছি পান।' আফিং-এর নেশার মত জ্যোতিষী গণৎকারের নেশা আমাদের টানবেই। জ্যোতিষীর বৈঠকখানা তেমন বড় নয়, তবে জ্যোতিষী হিসেবে তিনি অনেক বড় এরকম ধারণা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে বৈঠকখানা ঘর বেশ ঠাসাঠাসিই ছিল। তবে এই ঠাসাঠাসির মধ্যেও রমেনের একটা বিশেষ প্রিভিলেজ আছে বলে মনে হল। অতগুলো লোক বসে থাকা সত্ত্বেও চট করে সে ভেতরে ঢুকে গিয়ে কি ব্যবস্থা করে এল। তারপর বাইরে এসে আমাকে ডাকল, আয়।

ভেতরে ঢুকলাম। জ্যোতিষী বলতে যে ধরনের ধারণা ছিল সে রকম নয়। দাড়িগুম্ফ বিজড়িত নানা পাগলাবাবা শ্রেণির যে-সব গণৎকারের বিজ্ঞাপন দেখি কাগজে, মোটেও সেরকম নয়। একেবারে ফিটফাট ফুলবাবু। মুহুর্মুহু সিগারেট টানছেন। চোখ দুটো প্রচণ্ড রকমের উজ্জ্বল। সেই চোখে তিনি আমার দিকে তাকালেন। নমস্কার করে এগিয়ে গিয়ে তাঁর খাটে বসলাম।

রমেন আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল, আমার বন্ধু। হিস্ট্রিতে এম. এ. পাশ

করে বসে আছে।

ভদ্রলোক জ্বলজ্বল চোখে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। আমার চোখে-মুখে কপালে কি যেন বিচার করে দেখলেন। তারপর বললেন, দিন দেখি হাতখানা।

ডান হাতখানা বাড়িয়ে দিলাম। তিনি ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে খুব বিচার করে খানিকক্ষণ কি দেখলেন। তারপর বললেন, ইয়ার অব্ বার্থ বলুন।

বললাম।

কাগজে ইয়ার অব্ বার্থ লিখে কী একটা হিসেব করলেন। বারবার রমেনের দিকে তাকালেন, আপনার এই বন্ধুটিকে বোধহয় আপনারা ঠিক বুঝতে পারেন না?

রমেন বলল, একটু চাপা স্বভাবের।

জ্যোতিষী বললেন, চাপা স্বভাবের নয়, a bit introvert, অন্তরঙ্গ চিন্তায় ব্যস্ত থাকেন। শিল্পী লোক।

রমেন বলল, হ্যাঁ। কাগজে বেশ দু'একটা লেখা বেরিয়েছে।

জ্যোতিষী আমার দিকে তাকালেন, কি লেখেন?

—কবিতা। রোমান্টিক গল্প।

হেসে তিনি বললেন, ambition high, ফুলফিলড হচ্ছে না, না?

—কই আর হচ্ছে?

—হবে না।

যেন মুষড়ে পড়লাম।

হেসে তিনি আমার দিকে তাকালেন, খুব খারাপ লাগছে শুনতে, না?

বিষণ্ণ মুখেই বললাম, 'বলুন।' মনে মনে বেশ উষ্মা বোধ করলাম। এর আগেও যে কোনো জ্যোতিষীর কাছে যাইনি, তা নয়। ভাল ভাল জ্যোতিষীর কাছেও গিয়েছি। তাঁদের প্রত্যেকেই বলেছেন যে, আমি জীবনে একটা কেউকেটা হব। সাফল্য অনিবার্য। শিল্প-সাহিত্যেও যথেষ্ট নাম হবে। অথচ উনি বলছেন, হবে না। তাঁর জ্যোতিষ বিদ্যার অধিকার সম্পর্কেই সন্দেহ হল।

জ্যোতিষী আমার মনের অবস্থা বুঝতে পেরে বললেন, খুব মন খারাপ লাগছে তো! কিন্তু মন খারাপ করার কারণ নেই। হবে না বলতে আমি বলছি কবিতা ও রোমান্টিক গল্প উপন্যাসের কথা। এ লাইনে আপনার হবে না। আপনার প্রচণ্ড বুদ্ধি। পড়াশুনায়ও গভীরতা আছে। Originality প্রচণ্ড। একদিন সারা ভারত, এমনকি ভারতের বাইরেও আপনার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়বে। তবে ভিন্ন ক্ষেত্রে।

কী রকম?

আপনার মূল লাইন অধ্যাত্মতা, তন্ত্র।

তন্ত্র। আমার চোদ্দোপুরুষে কখনও তন্ত্র করেনি!

—তাই বলে আপনিও করবেন না এমন কোনো কথা নেই। তন্ত্র আপনার জন্ম-জন্মান্তরের সংস্কার।

—জন্ম-জন্মান্তর আছে?

—ভারতবর্ষ চিরকাল জন্মান্তরবাদে বিশ্বাস করেছে। পৃথিবীর সব ধর্মই আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করে।

—এমনও তো অনেকে আছেন যাঁরা বিশ্বাস করেন না?

—তারা বস্তুবাদী। এ-দেশের নন।

বললাম, এ দেশেও অনেকে ছিলেন। লোকের পুত্র বৃহস্পতি, আত্মাতে বিশ্বাস করতেন না। তিনি লোকায়ত ধর্ম সৃষ্টি করেছিলেন। অজিত কেশকম্বলিন ও মস্করি গোশালও বিশ্বাস করতেন না। চার্বাকও তাই।

জ্যোতিষী বললেন, কিন্তু ভারতবর্ষে এঁরা স্বীকৃতি পাননি। আত্মা আছে জানবেন। পরজন্মও আছে।

বললাম, বিজ্ঞান না ধরিয়ে দিলে আমরা এসব বিশ্বাস করি না।

হেসে জ্যোতিষী বললেন, আপনি একদিন নিজেই এসব বুঝতে পারবেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, তাহলে গল্প উপন্যাস কবিতায় নাম হবে না?

—না। ভগবান তা চান না।

—কেন?

—আপনাকে দিয়ে আরও মহৎ কাজ করাবেন বলে।

—কি মহৎ কাজ?

—ভারতের অধ্যাত্মতত্ত্বকে পুনর্জাগরিত করার কাজ।

অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বললাম, জানি না আপনি কি বলতে চাইছেন। ধরুন আপনার কথাই যদি সত্যি হয়, তাহলেও কবে নাগাদ তা হবে?

জ্যোতিষী বললেন, এই হাত বলে, মধ্য বয়সের আগে কিছু হবার নয়। পঞ্চাশ বছর থেকে আপনার জীবন স্টার্ট করবে। ভারতবর্ষে আপনি অমর খ্যাতি লাভ করবেন।

মনে মনে কিছুটা উৎফুল্ল হলাম সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু সবটা যে বিশ্বাস করতে পারলাম, তা নয়।

জ্যোতিষী আর একবার ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে আমার হাতে কি দেখলেন, তারপর হাসলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছেন কেন?

—আপনার ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে, সেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আসার আগে আপনার বিভ্রান্তির কথা চিন্তা করে। মহামায়ার কি আশ্চর্য লীলা!

বললাম, অনেক বড় বড় কথা বললেন। বিশ্বাস করি কী করে বলুন তো?

জ্যোতিষী বললেন, বিশ্বাস অনেকদিন করতে পারবেন না। আর এখানেই তো মজা। এই অবিশ্বাসেরও মধ্য দিয়েই অবিশ্বাস্যভাবে আপনার বিশ্বাস গড়ে উঠবে। তখন আপনি হবেন আসল একজন পরিবর্তিত মানুষ। আপনার দেহে মনে সেদিন আপনি সম্পূর্ণ এক নতুন মানুষ হবেন। আজ থাক। আসবেন মাঝে মাঝে। জ্যোতিষী আমার হাতখানা নামিয়ে দিলেন। পকেট থেকে পাঁচটা টাকা বের করে তাঁর হাতে দিলাম।

জ্যোতিষী এবার রমেনের হাতখানা টেনে নিলেন, কেমন আছেন?

—আছি একরকম।

—মনে মনে এখনও এসব চিন্তা রাখছেন কেন? আপনার সুদিন হাতের কাছে এসে গেছে। ভাল একটা চাকুরি পাবেন খুব তাড়াতাড়ি। সুন্দরী বউ নিয়ে সুখে সংসার করবেন।

আমি বললাম, আমার গৃহজীবন সম্পর্কে তো কিছু বললেন না?

জ্যোতিষী হাসলেন, রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়েন তো?

—হ্যাঁ।

—ঐ লাইনটা মনে করুন, 'বিশ্বনিখিল আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর!'

—অর্থাৎ আমার গৃহসুখ নেই, এই তো?

—রবীন্দ্রনাথের 'ভাষা ও ছন্দ' কবিতাটি মনে করুন না।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম।

তিনি বললেন, 'অলৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেন, তার বক্ষে বেদনা অপার।' অনেক বড় জিনিস করবেন জীবনে। ছোট জিনিসের কথা কখনও মনে স্থান দেবেন না।

আমি আর কিছু বললাম না। জ্যোতিষী আবার রমেনের দিকে তাকালেন—কি হয়েছে? খুব agitated মনে হচ্ছে?

রমেন বলল, আমরা চার বন্ধুতে পথে বেরিয়ে একটি ধর্মসভায় এক তান্ত্রিক সাধকের বক্তৃতা শুনছিলাম।

—হ্যাঁ।

—আমার বন্ধু ভূপেন, কম্যুনিস্ট। ও বিদ্রূপ করেছিল। তাই নিয়ে বেশ একটা গুঞ্জরন হয়। পথে রেস্টুরেন্টে এসে বসি। আমার পৈতে দেখে ওরা ক্ষেপে গিয়ে যা খুশি বলল।

জ্যোতিষী বললেন, ওদের দৃষ্টি ক্ষীণ বলেই বললেন, পৈতে কি জানেন?

আমরা দু'জনেই জ্যোতিষীর দিকে তাকালাম। তিনি বললেন, পৈতে নেওয়াকে বলা হয় উপনয়ন। উপ অর্থাৎ নিকট। নয়ন হল সত্য দৃষ্টি। সত্যের নিকট-দৃষ্টিকেই বলে উপনয়ন। পৈতে সেই সত্যদৃষ্টি খুলে দেয়। পৈতেতে আছে নটি সুতো। এজন্য

একে নগুণও বলে। পৈতে ধারণ করে নয়টা গুণের অধিকারী হতে হয়। তবেই সত্যদৃষ্টি খুলে যায়।

—ওরা এসবে বিশ্বাস করে না।

—বস্তুবাদ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়ে আছে, তাই করে না।

—ওরা ধর্মকে বলে opium.

—Karl Marx-এর কথা। প্রুধোঁর কথা।

—ওরা আত্মা, ভগবান এসবেও বিশ্বাস করে না।

—না বিশ্বাস করে কি সুখ আছে? আপনি তো Philosophy-র ছাত্র।

রমেন বলল, হ্যাঁ।

—Kant এবং Hume-এর নাম শুনেছেন?

—হ্যাঁ।

—Kant যথেষ্টই সুপণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ করেও ঈশ্বরের যথার্থ সন্ধান পাননি। তাই বলে ঈশ্বরকে অস্বীকারও তিনি করতে চাননি। কারণ, তিনি মনে করতেন যে, ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, মানুষের প্রয়োজনেই তাঁকে রাখতে হবে। না হলে সমাজে ও মানুষের জীবনে বিশৃঙ্খলা এবং হতাশা দেখা দেবে। তাই তিনি বলেছিলেন, God without certain truth, অপরপক্ষে Hume ছিলেন কট্টর বিচারবাদী লোক। বিচার-বিশ্লেষণ না করে কিছুই গ্রহণ করতে রাজি ছিলেন না। তাঁর কথা ঈশ্বর থাকুন বা না থাকুন, সত্যকে জানতে চাই। Truth without God. Hume শেষপর্যন্ত বৌদ্ধদের শূন্যতাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়েছিলেন। এই ধরনের নিরীশ্বরতাবাদের পরিণতি কি হয় জানেন?[১]

'কী?' আমরা দু'জনেই জ্যোতিষীর মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন, ঈশ্বর, আত্মা, এ-সবে বিশ্বাস না করলে existentialism আত্মপ্রকাশ করে। Existentialism বড় ভয়াবহ তত্ত্ব।

—কেন?

—মানুষ কোথা থেকে এসেছে বা কোথায় যাবে না জানতে পেরে বর্তমান অস্তিত্বটুকুকেই সব বলে ধরে নেয়। ফলে জীবনটাই অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান অস্তিত্বের বাইরে আর কিছু নেই ভেবে তারা মরিয়া হয়ে ওঠে। ইউরোপীয় লোকদের মধ্যে কাফ্‌কা, কাম্যু, সার্ত্রর এই ধরনের লেখক। অবশ্য এ-তিনের existentialism-এর চিন্তার মধ্যে ফারাক আছে। তাঁদের এই চিন্তাধারা একদলকে কম্যুনিজমের দিকে

১. শূন্যতা কিন্তু শূন্য নয়। এরও সাড়া দেবার ক্ষমতা আছে। অধুনা বিজ্ঞান প্রমাণ পেয়েছে যে, শূন্যের বুকে বৃহৎ বস্তুর আবির্ভাব হলে তার চতুর্দিকে শূন্যতাও বেঁকে যায়। এইজন্য রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "তবু শূন্য শূন্য নয়..."

ঠেলে দিয়েছে। ইউরোপের জীবনে বর্তমান উন্মাদনা ও আত্মহত্যার প্রবণতা এই তত্ত্ব থেকেই জন্ম নিয়েছে। এই ধরনের তত্ত্ব জীবনে সামান্য মাত্রও শান্তির প্রলেপ মাখাতে পারে না।[১]

বললাম, যদি existentialism সত্য হয়, তবে সত্যের জন্য এই তত্ত্বটি মেনে নিলে ক্ষতি কী? আত্মপ্রবঞ্চনা করে লাভই বা কী?

জ্যোতিষী বললেন, বর্তমান জীবনটাই একমাত্র সত্য নয়। এর পূর্বেও ছিল, পরেও থাকবে। ঈশ্বরও নিরর্থক কিছু নন। তিনিও আছেন। আমাদের মুনিঋষিরা এই জন্যই বারবার আস্তিক্যবাদের কথা বলেছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, আস্তিক্যবাদ যে সত্য, তা জানব কী করে?

জ্যোতিষী বললেন, একমাত্র তন্ত্রই এর সত্যতা প্রমাণ করে দিতে পারে।

—কি করে?

—আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে আত্মাকে আচ্ছাদন করে আছে ছয়টি আচ্ছাদন।[২] এই আচ্ছাদন হল তরোয়ালের কোষের মত। সুতরাং আত্মার এই আবরণকে কোষ বলা হয়েছে। এই কোষগুলি হল স্থূল কোষ, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, বিজ্ঞানময় কোষ ও আনন্দময় কোষ। মানুষের দেহের মধ্যে কুলকুণ্ডলিনী[৩] জাগরিত হলে—এই স্থূল কোষের বাইরে অর্থাৎ রক্তমাংসের দেহের বাইরে অন্যান্য সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর কোষের সন্ধান পাওয়া যায়।

—এ তো একটা গুহ্য ব্যাপার। সবার বোধগম্য হবে না।

—গুহ্য কেন। সবাই জানতে পারে।

—কী রকম?

—ঠাকুর দেবতার মাথার চারদিকে, বা মহাপুরুষের মাথার চারদিকে একটা জ্যোতির্বলয় দেখেছেন?

—হ্যাঁ।

—ঐ জ্যোতির্বলয়ই সূক্ষ্মদেহের দীপ্তি।

—আমরা তো মনে করি ওটা শিল্পীর কল্পনা মাত্র।

শিল্পীর কল্পনা হবে কেন, বাস্তব ক্ষেত্রেও তাই।

—যেমন?

অনেক মানুষের দেহ দেখবেন যেন জ্বলজ্বল করছে। ওই যে উজ্জ্বলতা, তাই

১. আধুনিক কালে অস্তিত্ববাদের নতুন ব্যাখ্যা দেখা দিয়েছে। সত্যের অনুসন্ধানই Existential চিন্তার মধ্যে পড়ে। Existentialism—John Macquarrie পঠিতব্য।

২. আধুনিক Parapsychology-তে একে 'Bioplasmic body' বলে।

৩. কুল (শক্তি, দ্রাবিড় শব্দ) কুণ্ড (গর্ত দ্রাবিড় শব্দ, লিঙ্গমূল ও গুহ্যদ্বারের মধ্যে এই কার্য। জাতীয় কুলের অবস্থান, O.D.B.L. দ্রষ্টব্য)।

হল সূক্ষ্ম কোষের আলো। সংযমে থাকলে, অধ্যাত্ম[১] পথে থাকলে, মানুষের মধ্যে এই দীপ্তি দেখা দেয়। এই দীপ্তিই মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে যথার্থ আলোর আকারে ফুটে বেরোয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, ধরলাম দেহের দীপ্তিই সূক্ষ্মকোষের আলো। কিন্তু এর দ্বারা আপনি কী বোঝাতে চান?

জ্যোতিষী বললেন, আমি এর দ্বারা বোঝাতে চাই যে, আমাদের স্থূল দেহটাই সব নয়। এ দেহটা নষ্ট হয়ে গেলে সূক্ষ্মদেহ থেকে যায়। সেই সূক্ষ্মদেহে আমাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা, বাসনা-কামনা দানা বেঁধে থাকে। সংস্কারের[২] সৃষ্টি হয়। সেই সংস্কার বশেই মানুষের পুনর্জন্ম হয়।

—আত্মা আর এই সূক্ষ্ম দেহ কি এক?

জ্যোতিষী হেসে বললেন, হ্যাঁ? পরমাত্মার কোনো রূপ নেই। কোনো বস্তুকণা দ্বারাও তিনি গঠিত নন। অব্যক্ত কারণে বা স্বভাবে সেই বস্তুর অতীত পরমাত্মাতে ইচ্ছা বা প্রেমের আলোড়ন হয়। পরমাত্মাতে সেই তরঙ্গ বস্তুর মৌল উপাদান সৃষ্টি করে। সেই উপাদান অণু আকারে দেখা দেয়। অণুর পারস্পরিক যোগাযোগে স্থূল বস্তু আত্মপ্রকাশ করে। এই স্থূল বস্তুর বন্ধনে মূল আত্মা স্বতন্ত্র আত্মারূপে দেখা দেয়। যেমন জলে ডোবানো হাঁড়ির জল। জলে ডোবানো হাঁড়ির জল ও নদীর জল একই। তবু মাঝখানে হাঁড়ি যেমন পার্থক্য তৈরি করে—তেমনই পরমাত্মাও বস্তুদ্বারা পৃথকভাবে বিচ্ছিন্ন সত্তা লাভ করেন। মূলত আত্মার কোনো রূপ নেই। আমাদের জৈবআত্মার চারিদিকে হাঁড়িরূপ দেহ আছে। এই দেহের ছয়টি বলয়। স্থূলদেহ নাশ হলে আত্মা সূক্ষ্মদেহের বন্ধনে থাকে। সূক্ষ্ম দেহ নাশ হলে সূক্ষ্মতর দেহের বন্ধনে থাকে। এই ভাবে শেষ সূক্ষ্মতম বন্ধন বিজ্ঞানময় কোষ পার হলে জৈব আত্মা আবার পরমাত্মায় মিশে যায়। ইতিপূর্বে জন্ম-জন্মান্তরবাদের খেলা চলতে থাকে।

বললাম, অনেক কঠিন তত্ত্ব। সহজে বোঝা যাবে না।

জ্যোতিষী বললেন, আপনার কাছে এ তত্ত্ব একদিন খুব সহজ হবে। আপনিই তখন বহু লোককে এ তত্ত্ব বোঝাবেন।

বেশ আশ্চর্য বোধ করলাম। উৎসাহও বোধ করলাম হয়তো, কিন্তু বিশ্বাস করতে পারলাম না। আমার মধ্যেই রয়েছে এক আশ্চর্য শক্তি, আর আমিই তার খবর রাখি না!

---

১. অধি (beyond) আত্ম (জীবাত্মা)=অধ্যাত্ম অর্থাৎ স্থূল জগতের বাইরে শান্ত একটি অবস্থা, যাকে বলে পরমাত্মা। উপনিষদের ভাষায় 'শান্তো ইয়ম আত্মা'।

২. সংস্কার অর্থ বেগ। আশা-আকাঙ্ক্ষার vibration.

জ্যোতিষী বললেন, কি ভাবছেন?

বললাম, আমার মধ্যে একটি বিরাট শক্তি ঘুমিয়ে আছে, অথচ আমিই তার খবর রাখি না!

জ্যোতিষী বললেন, হিরে যদি কাদায় জড়িয়ে থাকে তবে কি দীপ্তি দেবে?

—তার মানে? আমি কাদায় জড়িয়ে আছি?

—হ্যাঁ।

—কীসের কাদা?

—সংস্কারের কাদা।

—সংস্কার কী?

—মানুষের অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষাই তার আত্মার আবরণ হয়ে সংস্কার রূপে ঘুরে বেড়ায়।

—সংস্কার কি কোনো রকম বস্তু, যে আত্মার উপর আবরণ সৃষ্টি করবে?

—হ্যাঁ, বস্তু।

—সে কি!

জ্যোতিষী বললেন, মানুষের মন ও অহঙ্কার পর্যন্ত সূক্ষ্ম বস্তুকণা কাজ করে। তারা অতি সূক্ষ্ম বস্তুকণা দিয়ে তৈরি। এই বস্তুকে ধরে রেখেছে মানুষের অতৃপ্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, যা মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মত কাজ করে। আশা-আকাঙ্ক্ষা বিলুপ্ত হলে সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে যায়।

—মানুষ তার আশা-আকাঙ্ক্ষার স্বরূপ কিছুই বুঝতে পারে না?

—যতক্ষণ আশা-আকাঙ্ক্ষার আবরণে আত্মা জড়িয়ে থাকে, ততক্ষণ বুঝতে পারে না। আশা-আকাঙ্ক্ষা মুক্ত হলে স্বচ্ছ আত্মার মানুষ সবই দেখতে পায়। আত্মা হল পুকুরের নির্মল জলের মত। আশা-আকাঙ্ক্ষা সংস্কার হল কচুরিপানার মত। পুকুর যদি কচুরিপানাতে ঢেকে থাকে তা হলে আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে না। পরিষ্কার থাকলে দূর আকাশের নক্ষত্রমণ্ডলীরও ছায়া পড়ে। মানুষের আত্মাও তাই। সংস্কাররূপ আবর্জনা সরে গেলে সে সর্বদ্রষ্টা হয়, সর্বজ্ঞ হয়। তাকে তখন কিছু বলতে হয় না। সে সব দেখতে পায়। সব বুঝতে পারে।

—আত্মার স্বরূপ জানার উপায় কি?

—আমাদের ঋষিরা, মনীষীরা যে পথের কথা বলেছেন, সেই পথ অনুসরণ করা, সংযমের জীবন যাপন করা, নৈতিক জীবন যাপন করা, জীবে প্রেম করা, ইত্যাদি। গীতাতে এজন্য জ্ঞানযোগ, কর্মযোগ, ভক্তিযোগ ও রাজযোগের কথা বলা হয়েছে। অধ্যয়ন দ্বারা, অনুশীলন দ্বারা বিচার করে জানাকে বলে জ্ঞান। সেই জ্ঞান যখন সত্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে, তখন তার নাম হয় জ্ঞানযোগ। নৈতিকতার ভিত্তিতে, জীবন গঠন না করলে শুধুমাত্র অধ্যয়ন ও পঠন-পাঠনে জ্ঞান হলেও 'জ্ঞানযোগ'

বলতে যা বোঝায় তা হয় না। নিষ্কাম কর্মকেই বলে কর্মযোগ। এই ধরনের কর্মই ঈশ্বরের সঙ্গে ব্যক্তিকে যুক্ত করাতে পারে। ঈশ্বরে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করে যে ঈশ্বরানুভব লাভ, তাকেই বলে ভক্তিযোগ। তবে এই তিনটি যোগই অত্যন্ত কঠিন। এর সাহায্যে ঈশ্বরানুভূতি লাভ করা কঠিন।

—তবে সহজতম পথ কোন্‌টি?

—রাজযোগ।

—রাজযোগ কী?

—মনকে একাগ্রচিত্ত করে অন্যান্য জিনিস থেকে সরিয়ে অভীষ্ট লক্ষ্যে নিয়ে যাওয়াকে বলে রাজযোগ। আসলে মনকে চিন্তাহীন করতে পারলেই যথার্থ রাজযোগ হয় অর্থাৎ 'রাজ' মানে সর্বাধিরাজ পরমাত্মনের সঙ্গে এক হওয়া যায়। রাজযোগ করতে পারলে হঠযোগ হয়। এই যোগ দেহের অভ্যন্তরস্থ কুলকুণ্ডলিনীকে জাগরিত করে ঊর্ধ্বে তুলে পরব্রহ্মজ্ঞান দেয়।[1] সংযম সহকারে দেহের কিছু কলাকৌশল রপ্ত করে দেহের অভ্যন্তরস্থ বায়ুকে খেলাতে পারলে কুণ্ডলিনী জাগরিত হয়। তখন অনুভবের মধ্যে সহজে সত্যস্বরূপ জ্ঞান হয়।

কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, আপনি এ-সব জানলেন কী করে? আপনি নিজে কি এ-সব করেছেন?

জ্যোতিষী হেসে বললেন, কিছু কিছু করেছি।

—নিশ্চয়ই গুরুর কাছে শিখেছেন?

—তা তো বটেই। আমার গুরু তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধ ছিলেন।

—আপনি তো আমাকে তন্ত্রের কথা বললেন, কিন্তু তান্ত্রিক দেখলেই আমার কেমন—

—ঘৃণা জন্মায়, এই তো। রক্তাম্বর পরে দীর্ঘ দাড়িগোঁফ রেখে যারা লোকের ভীতি উৎপাদন করে তারা তান্ত্রিক নয়, কাপালিক। কিছু দ্রব্যগুণ জানে। অভিচার, মারণ, উচ্চাটন এইসব নিচু কাজে সিদ্ধ হয়। তারা কেউ তান্ত্রিক নয়। যে জ্ঞান পরিবর্ধিত হয়ে তারণ করে অর্থাৎ মুক্তি দেয় তাই তন্ত্র। তন্ত্রই একমাত্র যথার্থ মুক্তির পথ। পরমপুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তান্ত্রিক ছিলেন। তিনি রক্তাম্বর পরতেন না। তন্ত্র সাধনার জন্য রক্তাম্বর পরার প্রয়োজন নেই। যে-কোনো ভদ্রলোকও তন্ত্র সাধনায় সিদ্ধ হতে পারেন।

—আপনি কি...?

হেসে জ্যোতিষী বললেন, গুরুর কৃপায় কিছু কিছু পেয়েছি। আপনাকে শুধু একটা

১. ব্রহ্মণ চূড়ান্ত বা Absolute নয়। বৃ=to grow থেকে ব্রহ্মণ বা বৃ=স্ফীত হওয়া থেকে বৃহমণ=ব্রহ্মণ। ব্রহ্মণ পর্যায়ে গতি আছে। নিস্তরঙ্গ এক বা Absolute তাই পরব্রহ্মণ।

কথা বলি।

—বলুন।

—আপনার জীবনে অশান্তির কারণ হবে শুধু মহিলারা।

—কেন?

—মহামায়ার এ এক অপূর্ব লীলা, পরে বুঝবেন।

আমি বললাম, থাক, ওসব এখন থাক, আসল কথা বলুন। রমেনকে চাকুরির কথা বলে দিলেন। এবার আমার কী গতি হবে বলুন।

জ্যোতিষী হাসলেন। বললেন, গতির কথা জিজ্ঞাসা করছেন? অগতির গতি তো সবসময় আপনাকে ঘিরে রয়েছেন। শুনুন, জীবনে কোনো কিছুর জন্যই কোনোদিন যেন চিন্তা করবেন না। মনে রাখবেন, জীবন একটা রেকর্ডপ্লেয়ার। সংস্কার ও প্রাক্তন-কর্ম দিয়ে তৈরি। এ-জীবনের পিন্ তার উপর পড়ে রেকর্ড করা গান বেজে চলেছে। রেকর্ডের প্রথম কলি বাজলেই শেষ কলিটুকু জানা যায় না বটে, তবে শেষ কলিটুকুও আছেই। যথাসময়ে বাজবে। আপনার জীবন-গানের শেষ কলিটুকুও যথাসময়েই বাজবে। আপনি সে কলিটুকু শুনতে পান না বটে, আমি পাই। জীবনে যা-ই ঘটুক না কেন ঘাবড়ে যাবেন না কখনও। যে নাটকে উত্থান পতন বেশি, হাসি-কান্না বেশি, সেই নাটকই জমজমাট। যে নাটক লোকের চিত্ত জয় করতে পারে না, তা সাদামাটা। সাধারণ মানুষের জীবন হল সেই ধরনের নাটক। চিত্তজয়ী নাটকে ঘাতসংঘাত বেশি। সেই নাটকের জীবনই হল ব্যতিক্রমী জীবন। কোনো মহাপুরুষেরই পথ কুসুমাস্তীর্ণ নয়, বরং কন্টকময়। জীবনে কোনো দুঃখে যেন মুষড়ে পড়বেন না। কোনো ব্যথায় ভেঙে পড়বেন না। মনে রাখবেন, আপনাদের মত ব্যক্তির পক্ষে তা ভবিষ্যতের আলোকবর্তিকা স্বরূপ। চাকুরির জন্য চিন্তা করবেন না। যিনি আপনাকে দিয়ে মহৎ কাজ করাবেন, তিনি উপযুক্ত সময়ে আপনার জন্য উপযুক্ত কাজ বেছে রেখেছেন। কাজের জন্য চিন্তা করবেন না। জীবনে সবই পাবেন, অর্থ, যশ, কীর্তি, সব; শুধু পাবেন না পারিবারিক শান্তি। গৃহবলিভুক পায়রার ঘর ছোট, গৃহমুক্ত পায়রার জন্য অসীম আকাশ। কবির কথা মনে রাখবেন, 'বিশ্ব নিখিল আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর।'

এরপর উঠে দাঁড়ালাম, নমস্কার।

—নমস্কার। আসুন।

গেটের দিকে এগিয়ে গেলাম।

জ্যোতিষী বললেন, আবার আসবেন?

—নিশ্চয়ই।

তিন

রমেনের ক্ষেত্রে জ্যোতিষীর কথা খুব আশ্চর্য ভাবে ফলল। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রমেন State Bank of India-তে প্রবেশনারী অফিসার হয়ে ঢুকে গেল। অঙ্কে তেমন রপ্ত না হবার জন্য আমার chance হল না। আমাকে আরও কিছুদিন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে হল। অবশেষে জুটল মফস্বলে একটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ। মাইনে তুলনামূলকভাবে খুবই কম তখন। কিন্তু সেজন্য খুব যে একটা অখুশি হলাম তা নয়। কলেজে ও ইউনিভার্সিটিতে পড়বার সময় যে-সব অধ্যাপকের খুব নাম ডাক ছিল, তাঁরা আমার মন কেড়ে নিয়েছিলেন। তাঁদের বাচনভঙ্গি আমার আদর্শ হয়ে উঠেছিল। আমিও মনে মনে স্বপ্ন দেখতুম অধ্যাপক হবার। অবচেতন মনে আমার হয়তো অধ্যাপক হবারই সাধ ছিল। সেই কামনাই পূর্ণ হল। খুশি হলাম আরও একটি কারণে। অধ্যাপক জীবনে ছুটি অনেক। পড়াশুনার সুযোগ বিস্তর। লেখাটা আমার জীবনের নেশা। সেই লেখা অনুশীলন করবারও বিরাট সুযোগ পেয়ে গেলাম। অধ্যাপক যদি লেখক হয়, তাঁর একটা বিশেষ ভাবমূর্তি আছে ছেলেমেয়েদের কাছে। প্রথম দিনই তাই ছেলেমেয়েদের কাছে খুব প্রিয় হয়ে উঠলাম। অধ্যক্ষ মশাই প্রথম ক্লাসে আমাকে লেখক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিতে বেশ একটা সাড়া পড়ে গেল। ক্লাস শেষে বেশ কয়েকজন ছাত্র ঘিরে ধরল, স্যার আপনার একটি বইয়ের নাম করুন না? আত্মতৃপ্তি মুহূর্তের মধ্যে আত্মগ্লানিতে পরিণত হল। লিখি বটে, কাগজে দু'একটা লেখা বেরিয়েছে, তাও সত্যি, কিন্তু পুস্তক আকারে একটিও বেরোয়নি। চামচিকে যেমন পাখি নয়, বাজারে যার বই নেই, সেও যতই লিখুক না কেন, লেখক নয়। কাগজে দু'একটা লেখা বেরিয়েছে শুনলে হয়তো হাসির খোরাক হব। ছাত্রদের কাছে না হলেও অধ্যাপক বন্ধুদের কাছে তো নিশ্চয়ই। সুতরাং প্রায় ঘেমে উঠবার উপক্রম হল। কপালের ঘাম মুছে বললাম, এখনও বই বেরোয়নি, বেরুচ্ছে। লেখাগুলো কাগজেই বেরিয়েছে।

—কবে নাগাদ বই বেরোবে স্যার?

—দু'তিন মাসের মধ্যেই বেরোবে।

—স্যার, আপনি কী লেখেন?

—কী বলতে চাইছ?

—গল্প, কবিতা, নাটক, উপন্যাস, প্রবন্ধ, এর মধ্যে কোনটা?

বললাম, যিনি যথার্থ লেখক, তিনি সব কিছুই লেখেন। যিনি শিল্পী সমস্ত বিষয়েই তাঁর অধিকার থাকে। সৃষ্টিক্ষেত্রে সব কিছুরই অধিকারী না হলে যথার্থ লেখক হওয়া যায় না।

ছাত্রটি বলল, ঠিক বলেছেন স্যার। রবীন্দ্রনাথ গল্প, কবিতা, উপন্যাস, প্রবন্ধ

সব লিখেছেন। শুধু তাই নয়, গান লিখেছেন, ছবি এঁকেছেন। নিজে গাইতেও পারতেন।

—ঠিক বলেছ। তবে নানা বিষয়ে ক্ষমতা থাকলেও সবারই সব ক্ষেত্রে ক্ষমতা সমান হয় না। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষত্ব থাকে।

—স্যার, আপনার কোন্‌টা ভাল লাগে?

—উপন্যাস।

—উপন্যাস বেরোচ্ছে বুঝি?

বলে দিলাম, হ্যাঁ। যদিও উপন্যাস বেরোবার তখনও কোনো সম্ভাবনাই ছিল না। ভেবে নিলাম, যা মাইনে পাব, মুখ রাখতে সেই টাকা খরচা করে দু'তিন মাসের মধ্যে একটা কিছু করতে হবে। গোপন মনের সেই পরিকল্পনা থেকেই বললাম, হ্যাঁ।

—উপন্যাস লিখে ভালই করছেন স্যার। আজকাল কবিতার কোনো ভবিষ্যৎ নেই। কবিতা কেউ পড়েও না।

বললাম, আজকাল কেউ কবিতা পড়ে না বলে, কবিতার কোনো ভবিষ্যৎ নেই, তা নয়। আসলে আমাদের কবিরা কবিতাকে জনসাধারণে আনতে পারছেন না। নইলে আধুনিক কবিতার পটভূমি অত্যন্ত বিজ্ঞানভিত্তিক। আধুনিক কালে কবিতা আরও সুন্দর ও সম্পদশালী হয়েছে। আধুনিক সমাজ, রাজনীতি, বিজ্ঞান, মনস্তত্ত্ব সব কিছুর সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই আধুনিক কবিতা, আধুনিক শিল্প। বিশেষ করে মনোজগতের অবদান এখানে বিরাট। মনের অভিনব চরিত্রের কথা আমাদের কাছে তুলে ধরেছেন ফ্রয়েড ও য়ুঙ। সেই তত্ত্ব থেকেই শিল্পের নতুন জয়যাত্রা। এ সম্পর্কে প্রথম একটা ইঙ্গিত দিয়েছিলেন বৈজ্ঞানিক Pascal. তিনি বলেছিলেন, 'The heart has its reason of which reason knows nothing.' অর্থাৎ হৃদয়ের নিজস্ব একটা চলার পদ্ধতি আছে সে সম্পর্কে তর্কনির্ভর তর্কপদ্ধতি কিছু জানে না। মন বা হৃদয়ের এই খবর পশ্চিমী জগতে শিল্পক্ষেত্রে নবজাগরণ এনে দেয়। শিল্প সাহিত্য হয়ে উঠে মননির্ভর। মানুষ বহিঃকেন্দ্র বাদ দিয়ে আত্মকেন্দ্রিক হয়ে ওঠে, আমাদের উপনিষদের নির্দেশের মত, আত্মানং বিদ্ধি। নিজেকে জানো। Know thyself.

কি বললাম জানি না, ছেলেটিকে দেখলাম ভয়ানক খুশি। বলল, স্যার, একদিন আমাদের আধুনিক কবিতা সম্পর্কে ভাল করে বুঝিয়ে বলবেন?

জবাব দিলাম, নিশ্চয়ই বলব।

ব্যস। আর যায় কোথা। সামান্য একটু আলোচনাই ফুলে-ফেঁপে বিরাট হয়ে ছড়িয়ে পড়ল কলেজ প্রাঙ্গণে, স্যারের পাণ্ডিত্য বিরাট। লেখক স্যার। উপন্যাস বেরোচ্ছে বাজারে।

কলেজে অধ্যাপক অনেক আছেন। কিন্তু লেখক অধ্যাপক পাওয়া খুব কম ছাত্রদের ভাগ্যেই জোটে। আমরা যখন কলেজে পড়তাম, তখন আমাদের এক লেখক অধ্যাপক

ছিলেন। মূলত কবি হিসেবে তাঁর পরিচয়, কবি অমিয়রতন মুখোপাধ্যায়। লেখক হিসেবে তিনি কখনই তেমন প্রতিষ্ঠিত হতে পারেননি। কিন্তু তাঁকে নিয়ে আমাদের অহংকারের অন্ত ছিল না। আমি সেরকমই হয়ে উঠলাম নতুন কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে।

আমরা জানি না বটে, কিন্তু আমাদের অন্তরালে এক মহাশক্তি, মহা ইচ্ছা নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করেন। তিনি কী ভাবে কাকে এগিয়ে দেন, কী ভাবে পিছিয়ে দেন বলা শক্ত। একটা অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্য দিয়ে আমাকে তিনি সৃষ্টিযজ্ঞের দিকে পূর্ণোদ্যমে ঠেলে দিলেন। বই না বেরোলে ইজ্জত থাকবে না ভেবে বই বের করার জন্য আদাজল খেয়ে লেগে গেলাম। এর ফলে সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম একটা পদক্ষেপও তৈরি হল।

কিশোর জীবনের ভাবপ্রবণতা, প্রকৃতি প্রীতি, সব বিষয়ে অনুসন্ধিৎসা ও প্রথম প্রণয়ের স্বাদকে কেন্দ্র করে একটি উপন্যাস বেরলো। ভাল লাগল অনেকেরই। প্রথম বই নিয়ে কলেজে আসতেই ছাত্র-ছাত্রীরা হুমড়ি খেয়ে পড়ল। অনেকেই বই নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। লেখকের দিকে আরো ভিন্ন দৃষ্টিতে তাকাল সকলে। কেবল ফুটে ওঠা যৌবনে সেই বিশেষত্বের আলোড়ন অদ্ভুতভাবে উপভোগ্য। রোমান্টিক ভাব বিলাস আরো বেশি মাত্রায় বেড়ে গেল। বিশেষ করে কিশোরী তন্বী মেয়েদের দৃষ্টি জীবনে যেন বসন্তের হিল্লোল বইয়ে দিতে লাগল। ভুলে গেলাম কোথায় কবে কোনো জ্যোতিষী আমাকে কি বলেছিলেন। একটি মেয়ে, নাম ইলোরা। একদিন এসে বইটি চেয়ে নিয়ে গেল আমার কাছ থেকে। পরের দিন বইটি ফেরত দিয়ে বলল, অদ্ভুত ভাল লেগেছে স্যার।

তার আশ্চর্য দুই কালো চোখের তারায় কী এক অনবদ্য সুন্দর জগতের সন্ধান পেলাম যেন আমি। আমার হৃৎপিণ্ডের রক্ত ঢেউ তুলে নাচতে লাগল যেন। লেখকের সব চেয়ে আনন্দ পাঠকের সশ্রদ্ধ প্রশংসা লাভ করার মধ্যে। সে প্রশংসা যদি আবার পাঠিকার কাছ থেকে আসে, তাহলে সে পাওয়ার তুলনা নেই।

ইলোরা এদিক-ওদিক তাকিয়ে ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, একটা কথা জিজ্ঞেস করব স্যার?

আমি হেসে তার দিকে তাকালাম, বল।

—কাহিনিটা সত্যি?

—তোমার কি মনে হয়?

—সত্যি।

—সত্যি নয়, কল্পনা করে লেখা।

—হতেই পারে না স্যার। উপন্যাসের নায়িকার প্রতি আপনার দরদ রয়েছে। বললাম, লেখকের তো তাঁর চরিত্রের প্রতি দরদ থাকবেই।

—শুধু লেখক আর উপন্যাসের চরিত্রের ব্যাপার এটা নয় স্যার। চোখের দুই তারায় অদ্ভুত এক মোহ ফুটিয়ে ইলোরা আমার দিকে তাকাল। সেই চোখের দিকে তাকিয়ে ক্রমশ যেন আবেগে ভাসমান হচ্ছিলাম আমি। হঠাৎ এমন সময় কাছেই অন্যান্য ছাত্রছাত্রীর কলকণ্ঠ ভেসে উঠল। আমি নিজেকে গুটিয়ে নিলাম। ইলোরাও নিজেকে সামলে নিল।

মানুষের ভেতরের চিন্তার একটা গন্ধ বোধহয় বাইরে ফুটে বেরোয়। সেই গন্ধ যারা ভালবাসে, তারা গন্ধের লক্ষ্যস্থলে এসে ঠিক পৌঁছায়। আমার মনের মধ্যে চিরকালের একটা রোমান্টিক ভাববিলাস ছিলই। সেটা বোধহয় ক্রমশ ফুটে বেরোচ্ছিল। উপন্যাসটা বেরোতে সেটা বোধহয় বাইরে ছড়িয়ে পড়ল। সেই গন্ধে অলিরা যেমন বনফুলের চারদিকে গুন্ গুন্ করে তেমনই আমার চারদিকেও অনেক অলিগুঞ্জরন শুনতে পেলাম আমি। সে অলিগুঞ্জরন নিশ্চয়ই ভালও লাগল। দুটি মেয়ে পড়ত থার্ড-ইয়ারে। মহুয়া সাহা ও অঞ্জনা চৌধুরী। মহুয়া সাহার মধ্যে উগ্র একটা রূপ আছে। মেজাজও তেমনি। পেছনে রহস্যময় ইতিহাস আছে বলে অনেকের ধারণা। একটা চাপা অনুমান আছে যে, মেয়েটি বালবিধবা। অনেকে মেয়েটির কাছে ঘেঁষতে চেয়ে কল্কে পায়নি। আবার ওর বান্ধবী অঞ্জনা ছিল রোমান্টিক গড়নের মেয়ে। স্বপ্নের আমেজ গায়ে মেখে গতি ও ছন্দে মেয়েটি মিষ্টি। কিন্তু সব মিষ্টি সবার ভাল লাগে না। ছাত্রী হিসেবে তাকে পছন্দ করতাম যথেষ্টই কিন্তু অন্যরকম তখনও ভাবতে পারিনি। তবে ভাল লাগত ও যখন আমার লেখার প্রতি আগ্রহ দেখাত। শিল্পীর এই দুর্বলতার সুযোগ ওরা একদিন এমন করে নিল যে, আমি কিছুমাত্র ঠাহর করতে পারলাম না।

তখন দামোদর নদীতে ভরা বান। কর্দমাক্ত ঘোলা জল। নিষ্প্রাণ দামোদর হঠাৎ প্রাণের আবেগে ফুলে উঠে প্রায় দু'কূল ছাপিয়ে ছুটে চলেছে সাগরের দিকে। দামোদরের দুইধারের বাঁধ ভয়ে কাঁপছে, কখন তার হূনসদৃশ আক্রমণ শুরু হয়ে যায় নির্মম ভাবে। নদীর প্রতি দুর্বলতা আমার চিরকাল। ছোটবেলায় মানুষ হয়েছি নদীর ধারে। কোন্ অজ্ঞাত উৎস থেকে ছুটে এসে তাকে তীব্রগতিতে এগিয়ে যেতে দেখেছি দিগন্ত লক্ষ্য করে। সেই নদীর বুকে দেখেছি কত নির্মম ইতিহাস, কত মধুর চিত্র। কখনও পাড় ভেঙে মানুষের শেষ সম্বলটুকুকে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে দেখেছি প্লাবনের তোড়ে। কখনও গয়নার নৌকো দেখেছি জলে সরীসৃপের মত ছিপ ফেলে এগিয়ে যেতে। কখনও দেখেছি পানসী নৌকোকে জলের বুকে রঙিন প্রজাপতির মত ভাসতে। কখনও দেখেছি ভাটিয়ালী সুর তুলে ঘাসি নৌকো এগিয়ে যেতে। কখনও নদীকে দেখেছি পাড়ে বসে, কখনও নৌকোয় নদীর বুকের উপর থেকে। নদীর সঙ্গে রক্তের একটা নিবিড় সম্পর্ক আমার। সেই নদীর নামে আমাকে বোকা বানিয়ে দিল মহুয়া আর অঞ্জনা। একদিন ক্লাস শেষে হোস্টেলে ফেরার পথে মহুয়া

বলল, যাবেন নাকি এক-জায়গায় বেড়াতে?

অত বড় ডাঁটিয়াল মেয়ে আমার সঙ্গে কথা বলবে এমন ভাবে, ভাবতে পারিনি। কিছুটা অবাক হলাম।

—যাবেন? সে আগ্রহে আমার দিকে তাকাল।

—কোথায়?

—দামোদরে। বান এসেছে, ভারি সুন্দর দেখতে।

—আর কে কে যাবে?

—যাবে অনেকে, যাবেন?

প্রলুব্ধ বোধ করলাম। বিচার করলাম না কিছুই। বললাম, যাব। মহুয়া বলল, তাহলে হোস্টেলে বইপত্র রেখে, দামোদরের ঘাটে চলে আসুন।

বেরিয়ে পড়লাম দেরি না করেই। তখন রোদের বুকে একটা স্নিগ্ধ গৈরিক আমেজ ফুটে উঠেছে। রোদের এই গৈরিক আভাস আমার কেন যে ভাল লাগে বলে বোঝাতে পারব না। এই রোদ আমার অন্তরাত্মা মথিত করে কেমন একটা উদাসীন ভাব ফুটিয়ে তোলে। সমগ্র পরিবেশের মধ্যে কী এক সকরুণ কান্নার রাগিণী বেজে উঠতে চায় যেন।

দামোদরের বাঁধ থেকে একটু নামলেই হিজল, জিকা, যজ্ঞডুমুর এইসব কিছু গাছের ছায়া দিয়ে ঢাকা একটি দোআঁশলা মাটির পথ দিয়ে কিছু দূর এগিয়ে গেলেই নদী। যখন জল থাকে না, নদীর বুকের খাদে ধূসর মাটি অসংখ্য স্মৃতি নিয়ে কানাকানি করে। কোথাও কোথাও মানুষের প্রচেষ্টায় তার ভেজা বুকে বোরোধান শ্রেণির শস্যের সবুজ ইঙ্গিত দেখা যায়। নয়তো অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরানো দিনের ইতিহাসের মত মহান গাম্ভীর্যে দামোদর হাহাকার করে। বর্ষায় তার ভিন্নরূপ। তখন দামোদরের কোল ঘেঁষে ধঞ্চে পাট ইত্যাদি শস্যের সবুজ নৃত্য চলতে থাকে। ঘোলাজলের স্রোত বুকে টেনে দামোদর উদ্দাম হয়ে ওঠে।

দামোদর তখন কানায় কানায় পূর্ণ। জলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করে তীরে তীরে দাঁড়িয়ে আছে ধঞ্চে ও পাটগাছ। কয়েকটি হিজল ও তালের ছায়া কাটিয়ে দামোদরের ধূসর বাঁধে পা-দিতেই ধঞ্চে বনের গা-ঘেঁষে ঘেঁষে দাঁড়ানো একটা ডিঙি নৌকো থেকে মহুয়া আমাকে ডাকল—এদিকে স্যার।

একটা শালিক বোধহয় হিজল গাছের মগডাল থেকে আমাকে লক্ষ্য করে দেখছিল। মহুয়ার কণ্ঠ শুনে তিড়িং করে পাখা মেলে উড়ে গেল। কয়েকটা তিতির পাখি পুচ্ছ নাচাচ্ছিল ঘাটের পাশে, তারাও উড়ে গিয়ে দূরে সরে বসল। আমি ডিঙি লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম। একটি বৃদ্ধ মাঝি দেখি ডিঙির পেছনের গলুইয়ে বসে আছে বৈঠা হাতে। মাঝখানে পাটাতনের উপর অঞ্জনা বসে। মাত্র ওরা দু'জন। বললাম, আর কই? মহুয়া বলল, আর কাউকে বলিনি। আমরাই। হয়তো কিছু মনে

করতাম। হয়তো কিছু সন্দেহ করতাম। কিন্তু মনে সে সন্দেহ উঁকি দেবার আগেই দামোদরের চেহারা দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলাম। ধূসর মাটির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দামোদরের ঘোলা জল কোথায় কোন্ কিনারে নির্মম স্রোতের তরবারি চালিয়ে কোন্ মৃত্তিকার এক খণ্ডকে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে সে, কে জানে! দু'একটা মৃত ছাগল, কুকুর, ভাঙা ঘরের চালা, ছেঁড়া কাঁথা, কচুরি পানা দুলে দুলে ভেসে ভেসে চলেছে ঢেউয়ের তালে তালে। বহুদূরে দিগন্তরেখায় দামোদর পশ্চিমদিকে কোথায় হারিয়ে গেছে, কে বলবে! যেন কোথায় একটা রহস্যময় জগৎ আছে দিগন্তের কোণে, দামোদরের অভিসার সেখানে। যেন সে টেনিসনের ইউলিসিসের মত বলতে চায়

'for my purpose hold
To sail beyond the Sunset and the baths
Of all the western stars, until I die.'

মহুয়া বলল, উঠুন স্যার।

নৌকোয় উঠলাম।

নিস্তব্ধ এক ত্রিকালজ্ঞ বৃদ্ধপুরুষের মত জরাজীর্ণদেহ মাঝি। সে বৈঠা চালিয়ে দামোদরের বুকের দিকে ডিঙিটাকে ঠেলেদিল। তারপর মাঝদরিয়ায় গিয়ে ডিঙিটা দিগন্তরেখার দিকে মুখ করে চলতে লাগল। মহুয়া বলল, কেমন লাগছে স্যার?

বললাম, অপূর্ব! বহুদিন এ দৃশ্যের সঙ্গে দেখা হয়নি। এ দৃশ্যের সঙ্গে ছোটবেলায় আমার নিবিড় পরিচয় ছিল। জলের সোঁদাগন্ধে ভাদ্রের ভরানদীর কথা মনে পড়ে। দামোদর দেখে একজন কবির একটা লাইন আমার মনে পড়ে যাচ্ছে 'নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার বার তীরটিরে মাখে।'

সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জনা বলে উঠল, জীবনানন্দ দাশের।

আশ্চর্য হয়ে তার দিকে তাকালাম। ওর সমস্ত দেহটাই যেন দ্বিতীয়ার এক ফালি চাঁদের মত। শিল্পের ছন্দে ভরা। ওর রুচি দেখে মুগ্ধ হলাম। জীবনানন্দ দাশের খবর রাখা নিতান্তই শিল্পরুচি না থাকলে হয় না। অস্ফুটভাবে উচ্চারণ করলাম, বাঃ!

মহুয়া বোধহয় আমাকে লক্ষ্য করেছিল, বলল, এ-সব ব্যাপারে ও খুব পড়াশুনা করে।

হ্যাঁ

হ্যাঁ স্যার। ও ভাল গাইতেও পারে।

কার সঙ্গে কথা বলছি, তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক কি, সে কথা মনে থাকল না। বললাম, মেয়েদের বলা হয় fair sox, জীবনের সুন্দর দিকগুলির প্রতি অনুরাগ থাকা স্বাভাবিক।

অঞ্জনা যেন লজ্জায় আরো ক্ষীণ চন্দ্রের মত হল।

অঞ্জনাকে জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, এই প্রকৃতি, এই নদনদী, এই মাঠঘাট, এর

প্রতি যে আমার আকর্ষণ আছে, তুমি বুঝলে কি করে?

মহুয়া বলল, আপনি যে লেখক স্যার।

—গল্পলেখকের এতসব বোধ থাকে?

অঞ্জনা চোখ তুলে তাকাল, কেন থাকবে না স্যার?

—আমি তো জানি এ-সব থাকে কবিদের।

—কবিতা আর গদ্যের মধ্যে পার্থক্য আছে নাকি কোনো?

—নেই?

—না স্যার। অনেক কবিতা গদ্যের চাইতেও নিরস। প্রাণের রস থাকে না। অনেক গদ্য কবিতার চাইতেও মধুর।

জিজ্ঞাসা করলাম, এমন গদ্য.আছে নাকি?

—নেই!

—কার?

—রবীন্দ্রনাথের। রবীন্দ্রনাথের শেষের কবিতার বর্ণনা মনে করুন? আবার আশ্চর্য হয়ে অঞ্জনার দিকে তাকালাম। সত্যিই ওকে তারিফ করতে হয়। বললাম, রবীন্দ্রনাথ কবি, তাই। কিন্তু—

অঞ্জনা বলল, বিভূতিভূষণের কথা চিন্তা করুন না!

অঞ্জনার দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ও বলল, আরণ্যকের কথা ভাবুন।

আরও মুগ্ধ হলাম।

মহুয়া বলল, ও খুব লেখাপড়া করে স্যার!

—বুঝতে পারছি। আমার বই কেমন লেগেছে?

অঞ্জনার সারা দেহে কচি ঘাসের ছায়া ফুটে উঠল, বলল, খুব ভাল।

মহুয়া বলল, দামোদরে আপনাকে বেড়াতে নিয়ে আসার পরিকল্পনা ওরই।

হেসে অঞ্জনার দিকে তাকালাম, কি করে বুঝলে?

লজ্জায় আরক্তিম হয়ে অঞ্জনা বলল, আপনাকে দেখলেই বোঝা যায়।

বললাম, All that glitters is not gold.

অঞ্জনা বলল, সোনা চিনি আমি।

আমার বুকের ভেতরটা যে একটু না দুলে উঠল, তা নয়।

মহুয়া বলল, ওর intuiton অত্যন্ত প্রবল স্যার।

কিছু একটা ভাবলাম আমি নিজের মনেই। ভাবতে ভাবতে দিক্‌চক্রবালের দিকে তাকালাম। আকাশ দিগন্তে যেখানে নুয়ে পড়েছে, সেখানটায় দামোদরের বিস্তৃতিকে সমুদ্র সদৃশ্য মনে হচ্ছে। সেই দিকটাতে তাকিয়ে থাকলাম। রঙের ঢেউয়ের মত আমাদের ডিঙিটা দুল্‌ছে দামোদরের দোলানিতে। আমার চিন্তাকে দোলাতে দোলাতে

একাগ্রচিত্ত করে দিল যেন সেই দোলানি। আমি নিজেকে বিস্মৃত হয়ে দিগন্তের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

দিগন্তের অসীমতার দিকে আমি যখন তাকাই, তখনই কেন যেন মনটা উদাস হয়ে যায়। আমার মনে হয়, কিছু একটা ছিল, কিছু একটা হারিয়ে ফেলেছি আমি। জন্মের প্রথম লগ্ন থেকে বোধহয় সেই হারানো জিনিসটাকেই খুঁজছি আমি। সব মানুষই তার খোঁজে। কেউ সজ্ঞানে, কেউ অজ্ঞানে। তন্ময় হয়ে তাকিয়েছিলাম আকাশের দিকে। হঠাৎ গুনগুন একটা মিষ্টি গান ভেসে এল—'হাত ধরে মোরে নিয়ে চল সখা।' অঞ্জনা গুনগুন করে গান গাইছিল। সেই গানের কলিগুলি আমাকে যেন কোথায় ডুবিয়ে দিচ্ছিল। বস্তুত সমগ্র জগৎ-সংসারই একটা অকূল পাথার। এখানে কেউ হাত ধরে পথপ্রদর্শক না হলে কূলকিনারা খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। মিষ্টি হাওয়া দিচ্ছে চোখে-মুখে নাকে ও কানে। নদীর বুকের এই নিঃসঙ্গ হাওয়া যেন আমাদের মত কয়েকজন সঙ্গীকে পেয়ে খেলা করতে চাইছে। আদুরে মেয়ে যেমন বাবার হাত ধরে বেড়াতে গেলে বলে, চল, চল, আরও এগিয়ে চল, তেমনই যেন বলছে, চরৈবেতি। চরৈবেতি।

—কিন্তু Browning-এর Last Ride Together-এর নায়কের মত অনন্ত যাত্রার অভিলাষ মনে পোষণ করার দুঃসাহস আমাদের নেই।

মহুয়া বোধহয় হাতঘড়ি দেখছিল। একসময় ডাকল, স্যার!

ফিরে তাকালাম।

—শুনেছি আপনি ভাল আবৃত্তি করতে পারেন?

—কে বললে?

—বলার লোকের অভাব নেই। আবৃত্তি করুন না!

আবৃত্তি করলাম রবীন্দ্রনাথের সোনার তরী থেকে 'আর কতদূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরী, বল কোন্ পার ভিড়িবে তোমার সোনার তরী।' দিগন্ত লক্ষ্য করে অগ্রসরমান আমার পক্ষে তখন ঐ কবিতাটির কথা ছাড়া আর কোনো কথাই মনে পড়ছিল না। মানব-জীবনের প্রবাহটাই যেন দামোদরের মত। অসীম এক দিগন্ত লক্ষ্য করে এগিয়ে চলেছি। কবে এ অভিযাত্রার শেষ হবে কে জানে! দিক্‌চক্রবাল কি মরীচিকার মত মহাশূন্যতার একটা প্রহেলিকা মাত্র কিনা তাই বা কে বলবে! অনন্তকাল চলেও কি ঐ দিক্‌চক্রবালকে ছোঁয়া যাবে? নদী আর এক নদীতে গিয়ে হয়তো পড়বে। তার ব্যাপ্তি বিস্তৃততর হবে। তারপর সাগরের মুখে সৃষ্টি করবে মোহানা। মোহানা গিয়ে পড়বে সাগরে। সেই সাগর পাড়ি দিয়ে পরপারে যথার্থই কোনো নোঙর করার মত জায়গা আছে কিনা, কে বলবে! মহাসাধক মহামনীষীরা অনেকেই বলেছেন, আছে, আছে, নোঙর করার মত জায়গা আছে। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, সে দেশ কি রকম, তার কোনো বর্ণনা দিতে পারেন না। মাঝ-সমুদ্র

থেকে ফিরে এসে তাঁরা যে মিথ্যে বলছেন না তারই বা প্রমাণ কি? জীবন-জিজ্ঞাসা সোনার তরীর সুন্দরীর মত হাতছানি দিয়ে ডাকছে বটে, কিন্তু সে হয়তো কখনই ধরা দেবে না। সে অধরা।

কবিতা আবৃত্তি করা শেষ হলে খানিকক্ষণ মহুয়ার মত মেয়েও চুপ করে থাকল। তার জীবনে যে একটা গোপন রহস্য আছে সে খবর অন্য কেউ না জানলেও সে নিজে তো জানে! যেন সেখানে মরীচিকার বিভ্রান্তিতে সে বিভ্রান্ত। সমস্যার কোনো সমাধান তার জানা নেই। সোনার তরীর আরোহীর মত সেও হয়তো বিভ্রান্ত এক জীবন-নৌকোর যাত্রী।

কিছুকাল সবাই চুপচাপ থাকলাম। অঞ্জনা সামান্য ঘাড় বাঁকিয়ে দামোদরের জলে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে আছে। যন্ত্রের মত মাঝির হাত পেছনের গলুইতে বৈঠাটাকে হালের মত করে ধরে রয়েছে। আমরা কয়েকটা প্রাণী যে মানুষ, পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক আছে, একথাই যেন মনে হচ্ছে না। ব্রাউনিং-এর কবিতার মতন যেন জীবন। In the sea of life, we people live enisled. জীবন সমুদ্রে আমরা বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মত বাস করি। আগেকার মানুষের মধ্যে কি ছিল, জানি না। কিন্তু বর্তমান মানুষের জীবনটা যথার্থই সে-রকম। Existentialism মানুষকে অসহায়ত্ব বোধ দিয়েছে। মানুষের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাবোধ এসেছে, যাকে বলে Alienation.

কিছুক্ষণ নীরবে কাটার পর, মহুয়ার কণ্ঠ শোনা গেল, এবার ফেরা যাক স্যার?

দিগন্তে তখন সূর্যের উপর কয়েক টুক্‌রো ছেঁড়া মেঘ জমেছে। সেই মেঘ রাঙিয়ে উঠেছে পড়ন্ত বেলার সূর্যের আলোয়। ক্ষতবিক্ষত হৃদ্‌পিণ্ডের মত দেখাচ্ছে সেই মেঘগুলোকে। কিছু কিছু পাখির ঝাঁক উড়ে আসছে দিক্‌চক্রবালের দিক থেকে। জীবন-জিজ্ঞাসায় তারা কোথায় গিয়েছিল, কে জানে! নীড়ের আহ্বানে আবার হয়তো ফিরে আসছে। আমাদের সন্ত-মনীষীরা বলেছেন, যতক্ষণ দিক্‌চক্রবালের অনন্ত বিস্তৃতিতে স্থির হয়ে অবসর নেবার মত কোনো স্থান না জোটে, ততক্ষণ এমনি করে সবাইকে বারবার ফিরে আসতে হয়।

—ফিরি, কি বলেন স্যার?

—হ্যাঁ।

মহুয়া মাঝিকে নৌকোর মুখ ফেরাতে বলল। নৌকো চলেছিল ভাঁটার টানে, এবার উজানমুখী হল। মাঝিকে এবার কসরত করে দাঁড় টানতে হল।

বেশ কিছুদূর এগিয়ে গিয়েছিলাম। উজিয়ে আসতে তাই কিছুক্ষণ সময় লাগল। যখন আবার দামোদরের ঘাটে এসে নৌকো ভিড়ল—তখন ধঞ্চে আর পাটগাছগুলিকে পর্যন্ত আলোর অভাবে ধূসর দেখাচ্ছে। মাটি আর পরিবেশ একাকার হয়ে গেছে। সন্ধ্যার গায়েও যেন একটা ধূসর চাদর জড়ানো।

ঠিক ঘাটে না ফিরে ধঞ্চে গাছের আড়ালে ডিঙি নৌকোটা ভিড়ল। মহুয়া বলল,

স্যার, আমরা এগিয়ে যাচ্ছি, আপনি একটু পরে আসুন।

চমকে গেলাম। এতক্ষণ সাতপাঁচ কোনো কিছুই বিচার করিনি। এবার ভাবলাম। মফঃস্বল শহর। ছেলেমেয়েদের অবাধ মেলামেশা এখানে তেমন অনুমোদিত নয়। সেইজন্যই বোধহয় মহুয়া...। কিন্তু এত যদি ওরা জানে, তাহলে...! সাত পাঁচ ভাবতে ভাবতে আমি একটু ঘুরে মূল ঘাটে এসে দাঁড়ালাম। দোআঁশলা নরম মাটি ঘাটের বুকে ভেঙেভেঙে গেছে। সেই ভাঙা পথ ধরে উপরে উঠে হিজল, বাব্‌লা আর জিকার ছায়া দিয়ে ঢাকা পথ ধরে দামোদরের বাঁধে উঠতে হয়। আধভাঙা মাটির খাঁজে পা-দিয়ে উপরের দিকে উঠতে যাব, এমন সময় ডান পাশে কি একটা নড়তে দেখে চমকে উঠলাম। যেন কী একটা ছায়া ছায়া নড়ে উঠল। ভাবলাম, শেয়াল টেয়াল। কিন্তু ভাল করে লক্ষ্য করতেই বুঝলাম, শেয়াল নয়, মানুষ। স্পষ্ট তার সর্বাঙ্গীণ রূপ ঠাহর করা যায় না, তবে আভাসে ইঙ্গিতে অনুমান করা যায়। যথেষ্ট বয়স হয়েছে! দেখতে পাগলের মত। শরীরটায় ডাস্টবিনে খুঁটে খাওয়া পাগলদের মত ময়লার স্তর পড়েনি বটে, কিন্তু মাথার চুল অবিন্যাসের ফলে বিশৃঙ্খল। চোখ দুটো অদ্ভুত, শ্বাপদের মত যেন জ্বলছে। দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। পাশেই শ্মশান। কাছে লোকজন নেই, তায় ভর সন্ধ্যা। আমার গা ছম্‌ছম্ করতে লাগল, কোনো প্রেতাত্মা কি না, তাই বা কে বলবে! বোধহয় অতিকষ্টে চিৎকার করে উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু সে দুর্বলতা থেকে রক্ষা পেলাম লোকটির কণ্ঠস্বর শুনে। জ্যান্ত একটি মানুষের কণ্ঠ। প্রেতাত্মা নয়। নাকী কোনো সুর নেই। চন্দ্রবিন্দুর প্রাধান্য বোধ করলাম না। লোকটি স্পষ্ট মানবিক কণ্ঠে বলল, সিগারেট আছে?

নতুন সিগারেট খাওয়া শিখেছি। সাধারণত পকেটে সিগারেট রাখি না। কিন্তু সেদিন সৌভাগ্যক্রমে ছিল। পকেটে হাত দিয়ে সিগারেটের অস্তিত্ব টের পেয়ে বললাম, হ্যাঁ, আছে।

জ্বলজ্বলে উদগ্র আকাঙ্ক্ষাভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে সে বলল, দে না একটা।

মনে হল লোকটা পাগল। তা হোক, তবুও এই নিঃসঙ্গ সন্ধ্যায় একটা লোক যে কাছে পাওয়া গেছে, সেটাই যথেষ্ট আশীর্বাদ। পাগল না হয়ে যদি একটা প্রেতাত্মাই হত!

পকেট থেকে সিগারেটের বাক্সটা বের করে তা থেকে একটি ওকে দিলাম। হাত বাড়িয়ে সিগারেটটি নিয়ে সে বলল, শেলাই আছে?

ছিল। তাও দিলাম।

ফস্ করে দেশলাইয়ের কাঠি ঠুকে আগুন ধরালো লোকটি। সেই সংক্ষিপ্ত সময়ে আলোর সাহায্যে তাকে ভাল করে দেখে নেবার চেষ্টা করলাম। কিন্তু বেশি কিছু ঠাহর করতে পারলাম না। লোকটা মৌজ করে সিগারেটে টান দিয়ে খক্‌খক্ করে

একটু কাশল, তারপর আমার দিকে তাকাল, চেহারাটা তো তোর ভালই রে।

আমি কথা বললাম না।

তীক্ষ্ণ চোখ ফেলে আবার আমাকে দেখল সে। বলল, আরে বাবা! দেখিরে! তাকা তো, তাকা তো আমার দিকে?

কিছুটা বিভ্রান্ত বোধ করলেও তার দিকে তাকালাম।

তাকিয়ে সে কী দেখল আমার মধ্যে কে জানে! বলল, আরে। এ যে ছাইচাপা মণি!

তার হেঁয়ালির অর্থ বুঝতে পারলাম না।

'দেখি! দেখি! হাতটা দে তো।' লোকটা আমার হাত ধরতে চাইল। যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত হাতটা বাড়িয়ে দিলাম। সে বাঁ-হাত দিয়ে মুঠো করে আমার ডান হাতটা ধরল। সে হাত হিমশীতল না প্রচণ্ড উত্তপ্ত কিছুই অনুমান করতে পারলাম না। তবে অকস্মাৎ দেহ তড়িৎস্পৃষ্ঠ হলে যে চমক লাগে সেইরকম যেন চম্‌কে গেলাম। লোকটি আমার হাত ছেড়ে দিল হ্যাঁ, যা অনুমান করেছি তাই! ছাইচাপা রত্ন।

সে আমার দিকে তাকাল, যে ছাই রত্নকে চাপা দিয়ে রাখে তাকে কী বলে জানিস?

মাথামুণ্ডু আমি কিছুই বুঝছিলাম না। তাই চুপ করে থাকলাম। সে বিড়বিড় করতে লাগল, এই ছাইকেই বলে পাশ। সংস্কারের বন্ধন। মণি হল শুদ্ধ জীবাত্মা, পরমাত্মার আলোয় যা আলোকিত। আরে শালা, তুই নিজে একটা হিরের টুক্‌রো হয়ে কাচের টুক্‌রোর পেছনে ঘুরে বেড়াচ্ছিস! না বেড়িয়ে বা যাবিই কোথা বল! পূর্ব-জন্মের কর্মফল তো ভোগ করতে হবে, কাটাতে হবে। তবে না নিজের ভেতর হিরের খনির সাক্ষাৎ পাবি। ঝড় রে! অনেক ঝড় তোর কপালে। ঝড়ে পুরনো ঘর না ভাঙলে নতুন ঘর গড়বি কী করে, বল? তুই কি করবি! স্বয়ং ঈশ্বরও অবতার হয়ে মায়ার বন্ধনে বাঁধা পড়লেন। ভগবান বরাহ অবতার হয়ে হিরণ্যকশিপুকে হত্যা করে সামান্য একটা শূকরীর প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খেয়ে একপাল বাচ্চা তৈরি করে ঘর করতে লাগলেন। শ্রীরামচন্দ্র স্বয়ং ভগবান হয়েও সীতার বিরহে কাঁদলেন! মায়া এমনই চিজ! তুই তো কোনো ছার্‌! যা যা ফিরে যা। যত ঝড়ই আসুক না কেন, যত তুফানই উঠুক, ভয় পাসনি। জানবি, সব তোর ভালর জন্যেই। তোর মধ্যেকার যে আসল 'তুই' তুইতো তাকে চিনিস না। সে-ই তোকে চালাবে জানিস। সবই হবে তাঁর ইচ্ছেতে। নকল 'ইচ্ছে' তা বুঝতে না পেরে কখনও হাসবে, কখনও কাঁদবে। এটাই হল খেলা। এটাই হল লীলা। যা যা ফিরে যা! আমাকে সে প্রায় ঠেলে দিল। তারপর পাটবনের মধ্যে সুড়্‌সুড়্‌ করে কোথায় ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ আমি যেন ভাবতে পারলাম না। বোধহয় আমার ঘাম দিতে লাগল। যখন সম্বিত ফিরে এল দেখি একটা প্যাঁচা খানিক দূরে একটা অশ্বত্থগাছের কোটর

থেকে ক্যাচর ক্যাচর করে উঠেছে।

আমাদের সাধারণ অভিজ্ঞতার জানার বাইরে, বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্থাৎ বিজ্ঞানেরও জানার বাইরে—এই বিশ্বপ্রকৃতিতে আরও কিছু আছে। চূড়ান্ত জানা Analytical Science নেই। তর্কবিদ্যাতেও নেই। চূড়ান্ত জানা আছে ব্রহ্মবিদ্যাতে। সেই বিদ্যা অধিগত আছে ভারতবর্ষের একশ্রেণির মানুষের। যাদের আমাদের দেশে বলা হয় সাধুসন্ত, সন্ন্যাসী। তবে যথার্থ সাধুসন্ত, সন্ন্যাসী বা ব্রহ্মবিদ্যার অধিকারীকে বোঝা দায়। শ্মশানে-মশানে ঘুরে বেড়াচ্ছে অঘোরী হয়ে, তাঁরাই যে পরব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী তা নাও হতে পারে। কাগজে বহু বিজ্ঞাপিত গুরুমহারাজেরাই যে সেই অধিকারী তাও না হতে পারে। যারা কিছু কিছু ভেল্কি দেখাচ্ছেন গায়ে ভস্ম মেখে, মাথায় জটাজুট ধরে, তাঁরাও পরব্রহ্মজ্ঞানী না হতে পারেন। হয়তো পরম ব্রহ্মজ্ঞানী আছেন সমাজের বুকেই সুটবুট পরা মানুষের মধ্যে বা ধুতি পাঞ্জাবি পরা ফুলবাবুর মধ্যেই। কিংবা ডাস্টবিনে খুঁটে খাওয়া ভবঘুরের মধ্যে। যাঁর কাছে তিনকাল একত্রে বিধৃত এমন মহাসন্ত ও যোগীপুরুষ একালে হয়তো বিরল, হয়তো ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ছাড়া আর কোনো যোগীপুরুষ কখনো এতটা ক্ষমতার অধিকারী হননি, তবু তার এক কণাই বর্তমান পৃথিবীর কাছে যথেষ্ট। এই এক কণা শক্তি, বা তার চাইতে সামান্য বেশি ক্ষমতার অধিকারী হয়তো ছিলেন বাবাজি মহারাজ। যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী অনেক অলৌকিক ক্ষমতা দেখালেও ত্রিকালজ্ঞর বেশি হননি। এমনকি কাশীর চলন্ত বিশ্বনাথ নামে খ্যাত তৈলঙ্গ স্বামীও নন। একালে ভগবান নামে আখ্যাত হয়েছেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। তিনিও নির্বিকল্প সমাধিতে লিপ্ত থাকতে চেয়েছেন বলে কখনও বলেননি। ভাবমুখী থাকতে চেয়েছেন। যোগমার্গে পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী হয়েছিলেন তিনি, পূর্ণ শক্তির অধিকারী হয়তো হননি। ভগবানের পূর্ণ বা আংশিক বিশেষ ক্ষমতা নিয়ে যাঁরা ধরাধামে আসেন, তাঁরাই পূর্ণাবতার বা খণ্ডাবতার নামে চিহ্নিত। পূর্ণাবতার রাম, কৃষ্ণ, বুদ্ধ, এঁরা। হয়তো শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণও।[১] তবু মায়াচালিত জগতে মায়ার অধীন হয়ে জন্মালে স্বয়ং ভগবানেরও বোধহয় কিছুটা সীমাবদ্ধতা থাকে। শ্রীরামচন্দ্রকে সরযূর জলে আত্মবিসর্জন দিতে হয়েছিল। শ্রীকৃষ্ণ ব্যাধ নিক্ষিপ্ত শরে প্রাণ হারিয়েছিলেন। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব ক্যানসারে দেহত্যাগ করেন। তবু এঁদের মধ্যে যে শক্তির প্রকাশ ঘটেছিল, সবই ধর্মের গ্লানি থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্যে। এর বাইরে অসংখ্য যোগীপুরুষ ও সন্ন্যাসীপুরুষ যাঁরা পৃথিবীতে এসেছেন

---

১. রামকৃষ্ণ নামের মধ্যেও অদ্ভুত এক অবতারত্বের গন্ধ আছে। রাম হলেন অবতার। কৃষ্ণ অবতারী। অর্থাৎ তিনি একই দেহে অবতার ও অবতারী ছিলেন। তাঁর সহধর্মিণী সারদামণি ছিলেন মহাপ্রকৃতি। সারদা (জ্ঞান, প্রকৃতি) মণি (পুরুষ) অর্থাৎ তিনি পুরুষের জ্ঞানরূপা প্রকৃতি। তাঁর দীঘল স্কন্ধায়িত বন্ধনমুক্ত কেশ শক্তির প্রতীক।

বা আছেন, তাঁরা খণ্ডাবতার। অবতার আমরা সবাই। যিনি অবতরণ করেন তিনিই অবতার। পরমাত্মা বা পরম ব্রহ্মাণ রহস্যময় ভাবে বা স্বভাবে অব্যক্ত থেকে ব্যক্ত হন, সৃষ্টির বুকে অবতরণ করেন। বস্তুজগতের সবই তাঁর অবতরণের ফলে। ফলে সবই অবতার। জড়বস্তু থেকে পশু, মানুষ, সবই। তবে সাধারণের কাছে অবতার হিসেবে তাঁরাই চিহ্নিত, যাঁদের মধ্যে পরমাত্মবোধের গুণাবলী বেশি। তিনগুণ (সত্ত্ব, রজঃ, তম) ব্রহ্মাণের অঙ্গীভূত। সত্ত্বগুণে পূর্ণ পরব্রহ্মাণানুভূতি সম্ভব, রজগুণে তার চেয়ে কম। তমোগুণে ব্রহ্মাণানুভূতি অসম্ভব। পূর্ণাবতারে সত্ত্বগুণের ক্রিয়া পূর্ণ মাত্রায়, খণ্ডাবতারে সত্ত্বগুণের সঙ্গে রজঃগুণের ভেজাল থাকে। সাধারণ মানুষে তমোগুণের প্রাধান্য, তাই আত্মজ্ঞান থেকে তারা অনেক দূরে। এই সাধারণ মানুষের মধ্যে যাঁদের সত্ত্বগুণের আধিক্য আছে তাঁরাই সাধুসন্ত। সত্ত্বগুণ মসৃণ আয়নার মত, তাতে জগতের সমস্ত কিছুরই প্রতিবিম্ব পড়ে। সেইজন্যে অনেক আশ্চর্য কথা সাধু-সন্ন্যাসীরা বলতে পারেন।[১]

দামোদরের তীরে সন্ধ্যাবেলায় দেখা সেই আশ্চর্য লোকটির মধ্যে কোন্ গুণের আধিক্য কতখানি আমি বলতে পারব না। কিন্তু তাঁর মধ্যে যে স্বাভাবিকতার ঊর্ধ্বে একটা ক্ষমতা আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। পরদিন কলেজে গিয়েই কেমন অস্বস্তি বোধ করলাম। অধ্যাপকদের প্রত্যেকের মুখেই কেমন অদ্ভুত চাপা হাসি। একজনের মুখে একটু ক্রোধেরও আভাস। পরে শুনেছি মহুয়ার প্রতি তাঁর দারুণ দুর্বলতা ছিল। এক কোণে আমাকে উদ্দেশ্য করে তাঁর পরোক্ষ মন্তব্য শুনলাম 'এই জন্যই মানুষের চরিত্র সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া দরকার।' ব্যাপারটা কি, খুব একটা আন্দাজ করতে পারলাম না। সবাই দেখছি আমাকে এড়িয়ে চলেছেন, আর কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে আমাকে একবার দেখে যাচ্ছেন।

অধ্যাপকদের ঘরের পাশেই মেয়েদের কমনরুম। মহুয়া আর অঞ্জনা মাথা নিচু করে ঘরের মধ্যে চলে গেল। পিরিয়ডটা আমার 'অফ্' ছিল। একা বসে বসে কেমন বিব্রত বোধ করলাম। অন্যদিন হলে হয়তো কোনো ছেলে আসত, নয়তো দু-একজন ছাত্রী নিশ্চয়ই। কেউ জিজ্ঞাসা করত, শিল্প সাহিত্য সম্পর্কে, কেউ বা কথা বলতে আসত পড়া জিজ্ঞাসা করার নামে। আজ মনে হল, ওরাও আমাকে এড়িয়ে চলেছে। এক ফাঁকে একবার ইলোরা মেয়েটি এল, একটা কাক যেমন সন্তর্পণে চুরি করে ঘরে ঢোকে তেমনি ভাবে। সে নিঃশব্দে এসে কাছে দাঁড়াতে তার দিকে তাকালাম। ইলোরা প্রায় ফিস্‌ফিস্ করে বলল, কাল দামোদরে বেড়াতে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ।

---

১. এই ত্রিকালদৃষ্টির বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা পাবেন লেখকের 'দিব্য জগৎ ও দৈবী-ভাষা' গ্রন্থে।

—মহুয়াদি আর অঞ্জনাদির সঙ্গে?

—হ্যাঁ।

—ভাল করেননি স্যার।

—কেন?

—এটা মফঃস্বল স্যার। বুঝবেন না।

—কি হয়েছে?

—পরে বলব স্যার। সাবধান হয়ে চলবেন। আর এভাবে কখনও যাবেন না। এখানে যারা যত নীচ, তারাই তত বড় বড় কথা বলে। যে অধ্যাপকেরা মেয়েদের সঙ্গে ভাব করতে গিয়ে পারে না তারা অন্য অধ্যাপকের নামে নিন্দে করে। মেয়েদের একটা বিশেষ ক্ষমতা আছে স্যার, তারা লোক চেনে। আসি স্যার। ইলোরা চলে গেল।

আমি বিমর্ষ হয়ে ভাবতে লাগলাম। গত সন্ধ্যায় অদ্ভুতদর্শন যে লোকটির সঙ্গে দামোদরের ঘাটে আমার দেখা হয়েছিল তাঁর কথা বিন্দুমাত্রও আমার মনে থাকল না। আমি আমার সীমিত বুদ্ধি ও বিচার-বিশ্লেষণী ক্ষমতা নিয়ে ভাবতে লাগলাম।

কমনরুমে বোধহয় মহুয়া আর অঞ্জনা বসেছিল। কিছুক্ষণ পরে দেখলাম Principal-এর দপ্তরি এসে তাদের ডেকে নিয়ে গেল। মাথা নিচু করেই ওরা তার পেছনে পেছনে চলে গেল। মুহূর্তের মধ্যে যে এমন করে সব ওলটপালট হয়ে যায় কি করে, ভাবতে লাগলাম। বোধহয় মিনিট কয়েক ওরা প্রিন্সিপ্যালের ঘরে ছিল। ফিরে এল আরও মাথা নিচু করে। আমার ঘরের পাশ দিয়ে গেলেও আমার দিকে একবার ফিরেও তাকাল না। নতুন সিগারেট ধরিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকাতে লাগলাম। সেই কুণ্ডলায়িত ধোঁয়ার সঙ্গে প্যাঁচিয়ে প্যাঁচিয়ে আমার জটিল চিন্তাও যেন নিঃশব্দ হাওয়ায় দিশেহারা হয়ে ঘুরপাক খেতে লাগল।

থার্ড পিরিয়ডের বেল পড়ার কিছুটা বাকি। দপ্তরি এসে আমাকে ডাকল, স্যার, প্রিন্সিপ্যাল একবার আপনাকে ডেকেছেন।

উঠে দাঁড়ালাম, হ্যাঁ, চল।

প্রিন্সিপ্যালের ঘরে গিয়ে দাঁড়াতেই তিনি বললেন, আসুন প্রফেসর ভট্টাচার্য, বসুন।

চেয়ারে বসলাম।

প্রিন্সিপ্যাল দপ্তরিকে দরজাটা বন্ধ করে দিতে বললেন।

দরজা বন্ধ হল। প্রিন্সিপ্যালকে জিজ্ঞাসা করলাম, আমায় ডেকেছেন স্যার?

—হ্যাঁ।

—বলুন।

একটু যেন অস্বস্তি প্রিন্সিপ্যালের মধ্যে। কি একটা বলতে গিয়ে ইতস্তত করতে লাগলেন, দেখুন প্রফেসর ভট্টাচার্য, কিছু যেন মনে করবেন না—

—বলুন স্যার।

—এটা মফঃস্বল শহর তো?

—জানি স্যার।

—আমার অবশ্য উচিত ছিল আগে থাকতে সব বলে দেওয়া। আপনি লেখক মানুষ, আমাদের মতন চারিদিক বিচার করে চলবেন না, স্বাভাবিক। তবে, ছোট জায়গার মনটাও তো ছোট। আপনারা যাকে সহজ ভাবে নেন, সবাই তা নিতে পারে না।

—ব্যাপারটা কী বলুন তো স্যার?

প্রিন্সিপ্যাল বললেন, আপনার এগেনস্টে একটা কমপ্লেন এসেছে কয়েকজন অধ্যাপকের কাছ থেকেই।

—যেমন?

—আপনি কাল দু'টি ছাত্রীকে নিয়ে দামোদরে নৌকো করে বেড়াতে গিয়েছিলেন?

—হ্যাঁ, স্যার।

—অনেকেই সেটাকে ভাল চোখে দেখেননি।

—হয়তো।

—আমাদের দেশটাকে তো চেনেন?

বললাম, বিলক্ষণ চিনি স্যার। দেশের আয়তনটা বড় হলেও লোকের মন বড় ছোট। মহৎ আদর্শ থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা পরনিন্দা পরচর্চা নিয়েই থাকে।

বোধহয় একটু অপ্রস্তুত হলেন প্রিন্সিপ্যাল। একটু থতমত খেয়ে গিয়ে বললেন, তা যা বলেছেন। সব জানেনই তো স্যার—

বললাম, জানিনে আবার। যে জীবনানন্দ দাশ রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যসাহিত্যের জগতে নতুন যুগের সূচনা করেছিলেন—সাহিত্যে অশ্লীলতার দায়ে তাঁরও একদিন চাকুরি গিয়েছিল। মহারথী ব্যক্তিরাই তো তাঁকে অশ্লীলতার দায়ে অভিযুক্ত করেছিলেন। ক্ষুদ্ররথী ব্যক্তিরা সেক্ষেত্রে কি করবেন সহজেই অনুমান করা যায়।

—সবই তো বোঝেন।

বললাম, হ্যাঁ, স্যার। অক্ষমের আক্রোশ এমন ভাবেই প্রকাশ পায়। রবীন্দ্রনাথকেও চেপে দেবার চেষ্টা করেছিলেন সুরেশ সমাজপতি, ডি. এল. রায় আর অক্ষয়কুমার বড়াল। সময় তার বিচার করেছে। জীবনানন্দের তৎকালীন নৈতিক সমালোচকরা ডাস্টবিনেও স্থান পাননি। জীবনানন্দ বাঙালির হৃদয় জুড়ে আছেন। মহাকালই একমাত্র সঠিক বিচারক। তার বিচার ছাড়া আর কারো বিচারকে আমি বড় বলে মানি না।
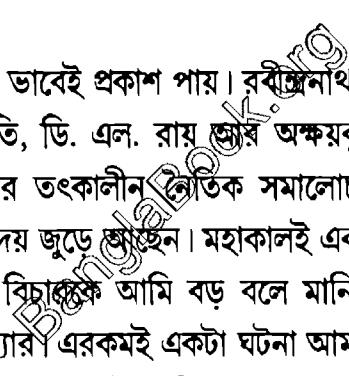
প্রিন্সিপ্যাল বললেন, কিছু মনে করবেন না, স্যার। এরকমই একটা ঘটনা আমাদের কলেজে বেশ একটা বেদনাদায়ক রূপ নিয়েছিল বলেই,...ইকনমিক্‌সের অধ্যাপকের

ঠিক এমনি একটি অভিযোগে চাকরি যায়। অথচ কোয়ালিফিকেশন খুবই ভাল ছিল। ভাল পড়াতেনও। যাক, wish you a happy end. আমি চেষ্টা করব যাতে এ নিয়ে...।

জিজ্ঞাসা করলাম, আরও কিছু বলবেন, স্যার?

—না।

—আমি আসতে পারি এখন?

—ওহ্! নিশ্চয়ই!

নমস্কার করে চলে এলাম।

কলেজের পাশেই একটা হোস্টেলে থাকতাম। কয়েকজন অধ্যাপক যাঁরা কলকাতা থেকে আসতেন, তাঁরাই করেছিলেন। চার্জে ছিলেন কেমিস্ট্রির চ্যাটার্জিবাবু। বয়স্ক লোক। রসিক। আমাকে খুব ভালবাসতেন। কলেজ ছুটি হবার কিছু আগে আমাকে এসে বলে গেলেন, ভট্টাচার্য, একটু দাঁড়িয়ে যেও। লেবরেটারিতে সামান্য কাজ আছে, একত্রে যাব।

বললাম, আচ্ছা।

কলেজ থেকে চ্যাটার্জিদার সঙ্গে দামোদরের বাঁধে উঠে হাঁটতে লাগলাম। হোস্টেলের দিকে। চ্যাটার্জিদা জিজ্ঞাসা করলেন, কি হয়েছে, বল তো দেখি ভট্টাচার্য?

কাহিনিটা ভেঙে বললাম।

চ্যাটার্জিদা প্রায় খিঁচিয়ে উঠলেন। এখানকার মেয়েগুলোও হয়েছে যেমন, কলকাতার ছেলে দেখলে গায়ের উপর লাফিয়ে পড়তে চায়। বলি অধ্যাপকগুলোকে! ঐযে জয়ন্ত, ইংরেজির ডেভিল, আমরা ওকে ডেভিল বলেই জানি। কোন্ মেয়েটার প্রতি ওর দুর্বলতা নেই বল তো! ইলোরার পেছনে লাগতে গিয়েছিল, ধমক খেয়ে ফিরে এসেছে। মহুয়াকে বাগানোর জন্য খুব একটা চেষ্টা করে যাচ্ছে এখনও পারেনি। তুমি আবার সেই মেয়েটাকেই নিয়ে ছুটে গেছ দামোদরে বেড়াতে, আর রক্ষে আছে!

বললাম, বিশ্বাস করুন চ্যাটার্জিদা, আমি বিন্দুবিসর্গ কিছুই জানতাম না। মহুয়াকে আমি বেড়াতে যাবার কথা কিছুই বলিনি। ও-ই আমাকে বলল। আমার আবার নদীর নেশা। না ভেবেই মত দিয়ে ফেললাম—

চ্যাটার্জিদা বললেন, খুব ভুল করেছ। আর যেন এমন কোরো না। যা দুটো চোখ তোমার বাবা, মেয়ে ভুলানো চোখ। আগুনদেখা পতঙ্গের মত ওরা এদিকে ঝাঁপাবেই। সত্যি বল তো তোমার কোনো—

বললাম, সত্যি, ওরকম কথা আমার মনেও আসেনি কখনও।

চ্যাটার্জিদা বললেন, এখানে কারো প্রতি কোনো দুর্বলতা জন্মেনি তোমার?

বললাম, একটু ভাল লেগেছে শুধু একজনকে।

—কাকে?

—ইলোরাকে।

চ্যাটার্জিদা বললেন, চয়েস আছে তোমার। সারা কলেজে তো ঐ একটি মেয়ে—তবু—

বললাম, ভাল লাগলেই ভালবাসতে হবে, এমন নীতি আমার নয়। বিশেষ করে ছাত্রীদের প্রতি ভালবাসার মধ্যে স্নেহ-মিশ্রিত থাকতে পারে, প্রণয় কখনও নয়।

চ্যাটার্জিদা বললেন, জয়ন্ত ব্যাটা কোনো ঘাটেই নোঙর ফেলতে না পেরে জ্বলে মরছে। অনেক জল ঘোলা করবে দেখা যাচ্ছে—

কথা বলতে বলতে চ্যাটার্জিদা ও আমি হোস্টেলে এসে উঠলাম। আমি শুধু ভাবতে লাগলাম—মহুয়া আর অঞ্জনা এমন করল কেন? নারীচরিত্র সম্পর্কে আমাদের শাস্ত্রে বলেছে, 'দেবা ন জানন্তি।' হয়তো একথাটাই সত্য।

সপ্তাহ শেষে কলকাতায় ফিরি। এবারও ফিরলাম। কিন্তু মনের মধ্যে কেমন একটা কাঁটা নিয়ে ফিরলাম যেন। কলকাতায় এসেই দেখা করতে গেলাম সেই জ্যোতিষীর সঙ্গে—জীবন আরম্ভ করার ঠিক আগে, আমার বন্ধু রমেনের সঙ্গে যাঁর কাছে হাত দেখাতে গিয়েছিলাম। তিনি বলেছিলেন, আমার একমাত্র অসুবিধের কারণ হবে মেয়েরা। জীবন আরম্ভ করতে গিয়ে মেয়েদের কাছ থেকেই প্রথম একটা হোঁচট খেলাম। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই যে, মেয়েদের প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে। যে-কোনো সুন্দর জিনিসের প্রতিই আমার একটা দুর্বলতা আছে। দামোদরের দৃশ্য যেমন আমাকে টানে, সমুদ্রের কলকল্লোল যেমন আমাকে মুগ্ধ করে, তেমনই পাহাড়ের সজল আকর্ষণ বা গৈরিক উদাসীনতা দুই-ই আমাকে মুগ্ধ করে। পুরুষ আমার কাছে কর্মের প্রতীক, শৌর্যের প্রতীক। মেয়েরা চিরন্তন সৌন্দর্যের প্রতীক। এক টুকরো মিষ্টি কবিতার ঝঙ্কার এবং একটি সুন্দরী রমণীয় ফুল, আমার কাছে সমান মোহময়। পরম ব্রহ্মাণের যেমন তিনগুণ—সৎ (নির্গুণ অস্তিত্ব), চিৎ (আত্মবোধ) এবং আনন্দ (প্রকাশের ইচ্ছা), তেমনি তিনি সত্যম (নির্গুণ অস্তিত্ব) শিবম (আত্মবোধযুক্ত) এবং সুন্দরম (আনন্দ থেকে প্রকাশিত)। ব্রহ্মাণের এই তিনগুণের মধ্যে আনন্দময় অংশের প্রতি আমার জন্মলগ্ন থেকেই লোভ। একজন দার্শনিক ঐতিহাসিকের—মায়া, শক্তি ও রাধা সম্পর্কিত একটি ব্যাখ্যা পড়েছিলাম একটি গ্রন্থে। তাঁর মতে ব্রহ্মাণ নিজেকে যখন নিজেই নিজের বিচারবোধ দ্বারা জানেন, জ্ঞান দ্বারা জানেন, তখন তাঁর বিরাট ব্যাপ্তিকে, অর্থাৎ বিশ্বজগৎকে তাঁর নিজেরই কাছে মায়া বলে প্রতিভাত হয়। যখন তিনি নিজেকে নিজের ইচ্ছার দ্বারা পরিমাপ করতে চান, তখন নিজের ব্যাপ্তিকে আপন শক্তির বিকাশ হিসেবে দেখেন। যখন সপ্রেমে এই বিশ্বজগৎকে বিচার করে দেখেন, তখন সব কিছুই প্রেমময় হিসেবে দেখেন। এই মহাবিশ্বজগৎসমুদ্রে অমৃত ও গরল দুই-ই আছে। গরলের মধ্যে বাস করলেও অমৃতের দিকেই আমার তৃষ্ণার্ত দৃষ্টি আবদ্ধ হয়ে থাকে। সেই জন্যই বোধহয় সুন্দরের প্রতি

আমার এত মোহ। ব্রহ্মাণের তিন দৃষ্টির মধ্যে আমার মধ্যে তাঁর প্রেমের দৃষ্টিই বড়। কিন্তু গোলাপ ফুলের বৃন্তে যেমন কাঁটা আছে, তেমনই সুন্দরের বোঁটাও কাঁটা দিয়ে ঘেরা। সেই কাঁটার খোঁচা খেলাম। সেই কাঁটার খোঁচা খেলাম যাদের প্রতি কোনো দুর্বলতা ছিল না তাদের কাছ থেকেই। যার দুই চোখে অপার রহস্যের ঘনীভূত রূপ দেখেছিলাম, সে আমার দুঃখের কারণ হয়নি, বরং আমার অদ্ভুত অবস্থার মধ্যে আমাকে সহানুভূতিই জানিয়ে গেছে।

সাতপাঁচ ভাবতে ভাবতে জ্যোতিষীর আশ্রমে গিয়ে উপস্থিত হলাম। সৌভাগ্য ছিল, তখনও তেমন ভিড় জমে ওঠেনি। তাড়াতাড়িই দেখা করার সুযোগ পেয়ে গেলাম।

জ্যোতিষী বললেন, আসুন, অনেকদিন পরে?

এগিয়ে গিয়ে বসলাম।

—কেমন আছেন?

হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, আপনিই সেটা বলবেন।

হাসতে হাসতে হাতটা তুলে নিলেন জ্যোতিষী! কি একটু দেখলেন, আবার হাসলেন। জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছেন কেন?

—মহামায়ার খেলা দেখে।

—সে আবার কী?

—আপনাকে আমি আগেও বলেছি, আপনার হাত সাধারণ হাত নয়। একটা মহৎ কাজ করার জন্যই আপনার জন্ম হয়েছে। কিন্তু তার আগে আপনাকে ভেঙেচুরে ঢেলে সাজানো দরকার। সেই ভাঙাচোরার খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে।

বললাম, আপনার কথা আমি বুঝতে পারছি না।

জ্যোতিষী আর একবার মনোযোগ দিয়ে আমার হাত দেখলেন। বললেন, মহিলারা আপনার অস্বস্তির কারণ হয়েছে তো?

—হ্যাঁ।

—দুটি মহিলা?

—হ্যাঁ।

—একজন একটু বয়স্কা। কালো রঙ। মোটা-সোটা গড়ন। চোখ দুটি বড় বড়?

বুঝলাম মহুয়ার কথা বলছেন। আশ্চর্য! হাত দেখে যে এ-সব কি করে বলা যায় কে বলবে!

এবার জ্যোতিষী দ্বিতীয় মেয়েটির বর্ণনা দিলেন ছিপছিপে গড়ন? মাথায় কোঁকড়ানো চুল? আয়ত চোখ। লজ্জাশীলা। রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা?

বুঝলাম, অঞ্জনার কথা বলছেন। বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু ওরা আমাকে এমন করে বিপদে ফেলল কেন?

করত। শিক্ষকতা মানে স্বেচ্ছায় দারিদ্র্য ডেকে আনা, এ-কথা জেনে সে চাকুরির চেষ্টা করেছিল। একটা প্রাইভেট ফার্মে খুব উঁচু পদ পেয়ে যায়। তারপর ওর সঙ্গে খুব একটা দেখা হত না। ফিরে তাকিয়ে দেখি সেই প্রহ্লাদ। প্রহ্লাদ এগিয়ে এসে আমার কাঁধে হাত রাখল, আরে! কতদিন পরে দেখা! কেমন আছিস? তোর একটা বই বেরিয়েছে। পড়েছি।

দুর্বল জায়গায় ঘা। সুতরাং আকর্ষণ বোধ করলাম প্রহ্লাদের প্রতি। জিজ্ঞাসা করলাম, কেমন লাগল?

প্রহ্লাদ বলল, রাস্তায় দাঁড়িয়ে কি সে-সব বলা যায়! চল্, কোথাও একটু বসি। সে আমাকে প্রায় টেনে নিয়ে একটি রেস্টুরেন্টে বসাল। ভাল খাবার অর্ডার করল। তারপর জিজ্ঞেস করল, বল্, তোর খবর কী?

বললাম, এক রকম। তুই কেমন?

—খুব ভাল আছি। তুই কী করছিস?

—একটা কলেজে...

—শেষপর্যন্ত কলেজে গেলি! অবশ্য তোর মানসিকতা ঐ ধরনেরই ছিল। কি রকম লাগছে কলেজে?

বিষণ্ণভাবে জবাব দিলাম, খুব ভাল নেই।

—কেন?

যে অস্বস্তিকর পরিবেশের মধ্যে পড়েছি, তাকে বললাম।

প্রহ্লাদ বলল, ছাড় তো! অধ্যাপনার মুখে গুলি মার্।

বললাম, ছাড়া তো সহজ। কিন্তু...

—কিন্তু, আবার কী?

—চাকুরি কোথায় পাব?

—করবি চাকুরি?

—কি চাকুরি?

—আমাদের কোম্পানিতে? ব্রিটিশ ফার্ম।

—কি কাজ?

—তোর মনের মতই হবে।

—কি, শুনি?

—Publicity Department. শিক্ষিত সাহিত্যিক লোকের প্রয়োজন। যদি কোনো বই published হয়ে বেরোয় তবে তো কথাই নেই।

বললাম, এরকম চাকুরি হলে নিতে পারি। তবে—

—আবার 'তবে'-র কি হল?

—পাব যে, এমন কোনো তো সিওরিটি নেই।

প্রহ্লাদ বলল, ম্যানেজম্যান্টের সঙ্গে আমার ক্লোজ কানেকশন আছে মনে করি। আমি বললে, কথা ফেলবেন না! আয় না, কাল চলে আয়।

—যাব?

—আয়!

—কলেজ কামাই করতে হবে কিন্তু?

—হোক না।

—তুই বলছিস?

—হ্যাঁ।

—ঠিক আছে যাব।

—তোর বইটা নিয়ে আসিস।

প্রহ্লাদ একটা কাগজে ঠিকানা লিখে দিল। বলল, একটার সময় আসিস। এ সময় ওঁরা relaxing mood-এ থাকেন।

অদৃশ্যে একটি শক্তি কী পরিকল্পনা করছিলেন কে জানে। প্রহ্লাদের কথায় আমার কেমন বিশ্বাস হল। কথা দিলাম, যাব। পরের দিন কলেজে গেলাম না। গেলাম প্রহ্লাদের অফিসে। ভয় পাচ্ছিলাম। সাহেবি মেজাজের লোকের সঙ্গে জীবনে কখনও মেলামেশা করিনি। চিবিয়ে চিবিয়ে যাঁরা ইংরেজি কথা বলে, কোটপ্যান্ট-টাই-হ্যাট পরে, তাঁদের সম্পর্কে আমার যেন কেমন একটা ভয় হয়। এখন জেনেছি, এদের অধিকাংশই ফাঁপা মানুষ। কিন্তু আগে তা বুঝতাম না।

প্রহ্লাদের দেখলাম সত্যিই বেশ প্রভাব আছে অফিসে। ম্যানেজমেন্ট তাকে যথেষ্টই ভালবাসে, মূল্য দেয়। আমি দুরুদুরু বক্ষে কর্তাব্যক্তিদের ঘরে ঢুকলেও বেরিয়ে এলাম হাল্কা মন নিয়ে। ওঁরা খুব ভদ্রভাবে কথা বললেন। আধুনিক সাহিত্য ও তার গতিপ্রকৃতি নিয়ে আমার সঙ্গে আলোচনা করলেন। আধুনিক কাব্য-সাহিত্যের পরিধি ও প্রকরণ, অধিবস্তুবাদ থেকে শাব্দিক বিপ্লব, অস্তিবাদ বা existentialism, সব বিষয়েই আলোচনা হল। বোদলেয়ার থেকে অডেন, কাফ্‌কা থেকে কামু, পিকাসো থেকে পোল্লক, কেউ বাদ গেলেন না। ফ্রয়েড থেকে নিওফ্রয়েডিয়ান, সবাই আলোচনার বৃত্তের মধ্যে এসে গেলেন। কিন্তু আমি সমস্ত আধুনিকতাকে সুন্দর গুছিয়ে এনে ভারতীয় অধ্যাত্মতত্ত্বে ফেলে দিলাম। দেখালাম যে, আধুনিকতা ভারতকে নতুন কোনো পথের সন্ধান দিতে পারেনি। ইউরোপে আধুনিকতার সূত্রপাত Pascal-এর এই উক্তি দিয়ে : The heart has its reason of which reason knows nothing.' এর বিস্তার ফ্রয়েডীয় তত্ত্বের ভিত্তিতে। আইনস্টাইনের ফোর ডাইমেনশনাল ধারণা, James Joyce ও পিকাসো আদি কিছু কিছু ঔপন্যাসিক ও শিল্পীর পরিকল্পনা ভারতীয় ধাঁচে হলেও ভারতীয় ঋষিদের অধ্যাত্ম অনুভবের অভাবে তা পরিমিত। ফ্রয়েডের ভিত্তি abnormal, ভারতের ভিত্তি সুপার-নরম্যাল। শিল্প সাহিত্য ধাঁধায় ঘুরবে, যদি

জ্যোতিষী হেসে তাকালেন আমার দিকে, ইচ্ছে করে ফেলে নি। ওরা কেউ অসৎ মেয়ে নয়। দ্বিতীয় মেয়েটি আপনাকে যথার্থই ভালবাসে—

—কিন্তু আমি তো—

—জানি, ওদের প্রতি আপনার কোনো দুর্বলতা নেই। কিন্তু কেউ কাউকে ভালবেসে ফেললে বোধশক্তি হারিয়ে ফেলে তো।

—হয়তো আমার চাকুরিই—

—থাকবে না, এই তো?

—প্রিন্সিপ্যালের কথাতে সেরকমই বোধ হচ্ছে।

—না থাকলো—

—বলেন কি! আজকালকার বাজার। চাকুরি পাওয়া যায় না।

জ্যোতিষী বললেন, আপনাকে তো আগেই বলেছি, জীবনটাকে একটা রেকর্ড বলে জানবেন। যে গান সে রেকর্ডে উঠে আছে, সে গান বাজবেই। চাকুরির জন্য আপনি ভাববেন না। জীবনে বহু বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আপনাকে যেতে হবে। তবে যাকে দিয়ে মহামায়ার উদ্দেশ্য সাধিত হবে, তাকে তো তিনি আর পথে ছুঁড়ে ফেলে দেবেন না। তবে শক্ত কাজের জন্য মজবুত করেই তো গড়ে তুলতে হবে। সেই গড়ার কাজ আরম্ভ হয়েছে। মায়ের ইচ্ছায় অনেক কিছু জানার ক্ষমতা আমার হয়েছে। কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে আমাকেও তিনি একটু ধাঁধার মধ্যে ফেলে দিয়েছেন। বুঝতে পারছি, অনেক বড় হবেন, বিরাট হবেন। কিন্তু কবে হবেন, কি ভাবে হবেন বলতে পারছি না। মানুষের জীবন একটি ত্রিকোণ রেখার মত। তার মধ্যে একটি চতুষ্কোণ আঁকুন, এই চতুষ্কোণ দিয়ে পরিবৃত হল সাধারণ মানুষের জীবন। এদের স্পষ্ট জানা যায়, বোঝা যায়। এদের ব্যক্তিত্ব এত কম যে, এদের মধ্যে ঢুকে যাওয়া মোটেই কঠিন কাজ নয়। কিন্তু ত্রিকোণের উর্ধ্বের চূড়াটি super-normal লোকের। নিচের দুই উদ্‌বৃত্ত কৌণিক অংশ abnormal-দের। এই super-normal আর abnormal-দের কথা তেমন বলা যায় না।

বললাম, আমি তাহলে হয়তো abnormal?

—আপনি super-normal শ্রেণিভুক্ত।

—তার প্রমাণ কী?

—super-normal-দের চতুর্দিকে একটা আলোর বৃত্ত দেয়াল রচনা করে থাকে। তাকে ভেদ করা যায় না। Abnormal-দের চতুর্দিকে অন্ধকার। Super-normal-দের হাত complex, abnormal-দের flat. Super-normal-দের হাতে অনেক সূক্ষ্ম রেখা থাকে, abnormal-দের হাতে কোনো রেখা নেই।

বললাম, জানেন, 'সেদিন দামোদরের ঘাটে অদ্ভুত একটা লোকের দেখা পেয়েছিলাম।' জ্যোতিষীকে লোকটির কথা বিস্তৃতভাবে বললাম। জ্যোতিষী শুনে

বললেন, এঁরা খুব উঁচুস্তরের সাধক। স্বেচ্ছাবিহারী। আকাশপথে চলতে পারেন। আপনার পরম সৌভাগ্য। আপনার জন্যই তিনি এসেছিলেন। এরকম বহু ক্ষমতাসম্পন্ন সাধকের সঙ্গে আপনার দেখা হবে।

—তাহলে?

—কোনো চিন্তা নেই। মায়ের এক স্তনের বোঁটা মুখ থেকে সরে গেলেও আর এক স্তনের বোঁটা তৈরি আছে জানবেন। সামান্য চাকুরির জন্য ভাববেন না। অর্থের অভাব জীবনে আপনার হবে না বলে দিচ্ছি। আপনি একটু তন্ত্র সম্পর্কে চিন্তা করুন তো, সেটাই আপনার পথ।

—তাহলে ভয় নেই?

—বলছি তো, না।

জ্যোতিষীর হাতে ফি দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। মনটা একটু ভারমুক্ত হল বটে, তবু যে একেবারেই চিন্তামুক্ত হল, তা নয়। কোথায় যেন খচখচ করে একটু বিঁধতেই লাগল।

চার

সত্যি, জীবন এক আশ্চর্য রেকর্ড। এ রেকর্ড বাজার আগেই যদি জানতে পারতুম! দ্বিধা-দ্বন্দ্বে আতঙ্কিত হচ্ছিলাম, হয়তো কলেজে ফিরে গিয়ে...। কিন্তু কে জানত, কলেজে আর ফিরতেই হবে না!

কলকাতায় আসি শনিবার। রোববার সোমবার থাকি। মঙ্গলবার ভোরে উঠেই আবার পাড়ি জমাই। সোমবার বিকেল অবধি কাটালাম একটা অস্বস্তিকর মানসিক অবস্থায়। সন্ধ্যাবেলা এক আশ্চর্য ঘটনা। আপন মনে রাস্তায় হাঁটছিলাম, অকস্মাৎ পেছনে আমার নাম ধরে কাউকে ডাকতে শুনে চমকে উঠলাম। ফিরে তাকিয়ে দেখি আমার এক বন্ধু। প্রহ্লাদ সামন্ত। ইউনিভার্সিটিতে আমার সঙ্গে পড়ত। আমাকে যথেষ্টই ভালবাসত। ও নিজে লিখত না বটে, তবে শিল্প-সাহিত্যের সমঝদার ছিল। আমি লিখতে পারি শুনে আমাকে বিশেষ খাতির করত। মেলামেশা করতে করতে দু'য়ের মধ্যে একটা নিবিড় বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছিল। ইউনিভার্সিটিতে শেষদিন পর্যন্তও দু'য়ের মধ্যে একটা নিবিড় সখ্য ছিল। আমাকে নিয়ে বিদায় সেমিনারে সে একটি স্বরচিত কবিতা পাঠ করিয়েছিল। এর ফল হয়েছিল এই যে, যে অধ্যাপকটি সেই সভায় পৌরোহিত্য করেছিলেন তিনি তাঁর ভাষণের ধারাই পাল্টে ফেলেন। অধ্যাপকটি ছিলেন ভাষার দিক থেকে খাঁটি ইংরেজ। বিলেতে লেখাপড়া করেছেন। বাঙালি হলেও কোনোদিনও তাঁর মুখে বাংলা শব্দ শোনা যায়নি। আমার কবিতা শুনে এই প্রথম তিনি তাঁর সিদ্ধান্ত পাল্টালেন। প্রথম বাংলায় বক্তব্য রাখলেন।

প্রহ্লাদ খুবই ভাল ছাত্র ছিল। ফার্স্ট ক্লাস পেয়েছিল। আমাকে নোট দিয়ে সাহায্য

না ঐ সুপারনরম্যাল দিকের সন্ধান পায়। ইউরোপীয় মনীষীদের মধ্যে অনেকেই এর সন্ধান পেয়েছিলেন। তাই জার্মান দার্শনিক সোফেনহাওয়ার উপনিষদকে যেমন বলেছেন, 'Solace of my life, it will be solace after the my death' তেমনি অধুনাতম ফরাসী কবি আদ্রে ব্রেতোঁ অধিবস্তুবাদী আন্দোলনের ইতিহাস লিখতে গিয়ে বলেছেন, তন্ত্রই মুক্তি দিতে পারে। তিব্বত ও ভারতেই রয়েছে মুক্তির চাবিকাঠি। বিস্তৃতভাবে আধুনিক শিল্প সাহিত্যের ইতিহাস থেকে আমার ব্যক্তিগত যে ধারণা, সবকিছুই বললাম। রাজনীতির কথা জিজ্ঞাসা করাতে জানালাম যে, অধ্যাত্মতার স্পর্শ ছাড়া কোনো বস্তুবাদই মানুষকে শান্তির সন্ধান দিতে পারবে না। এই প্রসঙ্গে Civilization and Ethics' গ্রন্থে সোয়াইৎসারের ধারণার কথাও বললাম, যে, spiritualism-এর চর্চা ছাড়া আধুনিক সভ্যতা নিয়ে বাঁচার আর কোনো পথ নেই।

ম্যানেজমেন্ট খুব খুশি হলেন। বললেন, লিখতে পারেন, এসব বিষয়ে পড়াশুনা আছে, এমন লোকই খুঁজছিলেন। লেখক অনেক পাওয়া গিয়েছিল, তাদের পড়াশুনা নেই। আমার মধ্যে দু'য়ের একটি সমন্বয় দেখে তাঁরা খুশি হয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলেন, immediately জয়েন করতে কোনো অসুবিধা আছে নাকি? জানালাম, না। ওঁরা বললেন, join day after tomorrow.

যে পে-স্কেলের কথা ওঁরা বললেন, অধ্যাপনার জীবন আরম্ভ করার পর সে পে-স্কেলের কথা আমি কখনও কল্পনাই করতে পারিনি।

বাইরে আসতে প্রহ্লাদ কাঁধে হাত রাখল, কি রে?

বললাম, তোকে কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা নেই।

—জয়েন করছিস তো?

—হ্যাঁ।

—কলেজের কী করবি?

—রেজিগনেশন লেটার পাঠিয়ে দিচ্ছি। না দিলেও ক্ষতি নেই, ওখানে আর আমি যাচ্ছি না।

একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। আমাকে যে জ্যোতিষীটি বলেছিলেন, জীবনটা একটা রেকর্ড মাত্র, প্রাণশক্তি হল তার পিন, যখন যে ঘরে ঘুরবে, সেই ঘরের গান বাজবে, আমার জীবনেও যেন তেমনি অজানা একটি রেকর্ড বেজে গেল। কিন্তু, তবু, তবু বিশ্বাস থাকে কই? শ্মশান-বৈরাগ্য তো মুহূর্তের মাত্র। আবার যেমন মানুষ অনিত্য সংসারটাকেই নিত্য বলে ধরে নিয়ে জ্বালাযন্ত্রণায় জড়িয়ে পড়ে, তেমনি তো আমিও। কতক্ষণ আর এ কথাটা মনে রাখতে পারলাম। তাহলে তো গীতাতত্ত্বই অধিগত হয়ে যেত! সুখ-দুঃখে কোনো ভাবেই উদ্বিগ্ন হতে হত না।

অফিসিয়াল কিছু কাজকর্ম, যা নাকি করণিক শ্রেণির কাজকর্মের মধ্যে পড়ে,

আমার কাছে প্রথম দিকে সেটা মনঃপূত হয়নি। তবে কিছুটা সৃজনী শক্তি খাটাবার সুযোগ একাজে আছে। সেই সুযোগ হল সুগঠিত বাক্য রচনাতে, যে রচনা কোম্পানির সম্প্রসারণে সহায়ক হবে। নানা সময়েই নানা ধরনের বিজ্ঞাপন যায় কোম্পানির। সেই বিজ্ঞাপনে চমকপ্রদ কিছু বাক্য রচনা করতে হয়, যে বাক্য গ্রাহক-পাঠকদের মধ্যে কৌতূহলের উদ্রেক করে। আমার সে রকম দু'একটি লেখা কোম্পানি খুব এপ্রিসিয়েট করল। একদিকে একটা সুযোগও এল। বহু সাময়িক পত্র-পত্রিকা কোম্পানির কাছে বিজ্ঞাপনের জন্য আসে। সে বিজ্ঞাপন অনুমোদন করার দায়িত্ব আমার ওপর। দেখা গেল সংবাদপত্রের সম্পাদকেরা রীতিমতো তোয়াজ করছেন আমাকে। আমার রোমান্টিক যে উপন্যাসখানি আত্মপ্রকাশ করেছিল কলেজে পড়াবার সময়, অনেকে দেখলাম সেই উপন্যাসটির ভূয়সী প্রশংসা করছেন। অনেকে যেচে নিয়ে গিয়ে সমালোচনা করলেন। উচ্ছ্বসিত প্রশংসা প্রতিটি লাইনে। ছোট থেকে মাঝারি এবং 'বড় হবহব' এমন অনেক কাগজও তোয়াজ করে আমার লেখা নিতে লাগল। অথচ একদিন এদের কাছে লেখা পাঠিয়ে, নিজে গিয়েও কোনো ফল পাইনি। যাঁরা দয়া করে লেখা পড়েছেন, তাঁরা বলেছেন, অত্যন্ত কাঁচা। আধুনিক রচনাকৌশল ও চিন্তাধারার সঙ্গে আমি নাকি পরিচিত নই। বাংলা অধুনাতম কাব্যের সমস্ত প্রকরণ আমি অত্যন্ত যত্নসহকারে অধিগত করেছিলাম। ইংরেজি কাব্যে এলিয়ট থেকে বার্কার অবধি যত্নসহকারে পড়েছিলাম। ফরাসি অধুনাতম কবি বোন্নেফয় পর্যন্ত বাদ দিইনি। বাংলা উপন্যাসে তেমন পরীক্ষা-নিরীক্ষা নেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষার নামে দু'একটা বই, যা সমালোচকদের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা লাভ করেছে, সেগুলোকে আমার 'রকের ভাষা' প্রয়োগ ছাড়া চিন্তার ক্ষেত্রে কোনো অভিনবত্বপূর্ণ বলে মনে হয়নি। অভিনবত্ব ছিল যৌনতার ভিয়ানটা আর একটু বেশি মাত্রায় হওয়ার মধ্যে। এইজন্য বাংলা উপন্যাস আমি তেমন পড়িনি। ইংরেজি উপন্যাস এবং অনুবাদের মাধ্যমে জার্মান ও ফরাসি উপন্যাস কিছু কিছু পড়েছি। জেমস জয়েসের দুরূহ বই 'ইউলেসিস', কাফকার 'ট্রায়াল', সার্ত্র-ত্রর 'লে চেমিন' ইত্যাদিও বাদ দিইনি। আধুনিক সাহিত্যের সমালোচনার উপর কোনো বই পড়তে আমি বাকি রাখিনি। চিত্রশিল্পে মাতিস থেকে পিকাসো, পোল্লক, এঁদের ধারা পড়েছি তবু কেন যে আধুনিক বঙ্গীয় সাহিত্যিক সমাজের মতে আধুনিক সাহিত্যের সমান্তরাল পর্যায়ে আসতে পারলাম না কে জানে! একদা নিন্দিত বঙ্গীয় সাহিত্য-মহারথীদের কাছে নিতান্ত অপাংক্তেয় বলে গণ্য, সেই আমিই হঠাৎ একটা বড় রকমের স্রষ্টা সাহিত্যিক হয়ে গেলাম নতুন চাকুরি নেবার পর। আধুনিক শিল্পচেতনা নাকি আমার মধ্যে রেসের দ্রুততম ঘোড়ার চাইতেও এগিয়ে চলেছে।

সাফল্যের চাবিকাঠি কোথায় থাকে, নতুন চাকুরিতে যোগ দিয়ে তবেই তা বুঝলাম। জুলিয়ান হাক্সলের একটি লেখায় পড়েছিলাম যে, শিল্পবিপ্লবের ফলে শ্রমিক

মহুয়া বলল, মেয়েদের একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে, জানেন তো স্যার?

—সেটি আবার কী?

—মেয়েরা পুরুষ মানুষকে দেখলেই বুঝতে পারে, কে কি রকম।

হেসে বললাম, মোটেই নয়।

—কেন?

—তাহলে আমার মতো একটা খারাপ লোকের সঙ্গে তোমরা অবাধে দামোদরে বেড়াতে গেলে? দেখলে তো কি দুর্নাম হল?

—আপনার মতো খারাপ লোকের সঙ্গে আমরা হাজারবার মিশতে পারি। কিন্তু জয়ন্তবাবুর মত লোকের সঙ্গে কথা বলতেও রাজি নই।

হাসলাম। কি বলব আর।

মহুয়া বলল, জয়ন্তবাবু কি করেছেন জানেন স্যার?

—কি?

—অঞ্জনাকে হাত করতে না পেরে ওর নামে যাচ্ছেতাই দুর্নাম করছিলেন। শেষপর্যন্ত ওকে কলেজে থেকে তাড়াবার জন্য প্রিন্সিপ্যালের কাছে কমপ্লেন করেছিলেন। কিন্তু বড় একটা ভুল করে ফেলেছিলেন।

তাকিয়ে থাকলাম মহুয়ার দিকে।

সে বলল, একটা চিরকুট দিয়েছিলেন অঞ্জনাকে ভুল করে। প্রিন্সিপ্যাল ওকে ডেকে পাঠাতেই আমি চিরকুটটা দেখাতে বলি।

বেশ কৌতূহলী দৃষ্টি মেলে ওদের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

মহুয়া বলল, প্রিন্সিপ্যাল জয়ন্তবাবুকে সেই চিরকুটটি দেখাবার পর তিনি চুপ করে যান। চিরকুটটা বোধহয় প্রিন্সিপ্যাল জয়ন্তবাবুর হাতেই দিয়েছিলেন। এখন তাই জয়ন্তবাবু উল্টো গাইতে শুরু করেছেন। অঞ্জনা ওকে ট্র্যাপে ফেলবার চেষ্টা করেছিল, এই কথা বলে বেড়াচ্ছেন।

বললাম, অঞ্জনারই তো অন্যায়।

—কেন? মহুয়া অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালো।

বললাম, একজন যদি ভালবাসে, তার দিকে সে ফিরে তাকাবে না?

অঞ্জনা চোখে আঁচলচাপা দিয়ে হুঁ হুঁ করে কেঁদে উঠল।

বললাম, কী হল?

ও বলল, আপনি এমন কথা বললেন!

আমার ঠাট্টাচ্ছলে বলা কথাটা যে অঞ্জনার এমন করে লাগবে ভাবতে পারিনি। চুপ করে গেলাম।

মহুয়া বলল, আমাদের প্রিন্সিপ্যালের মেয়েকে দেখেছেন? ঐ যে শাকচুন্নী!

কথা বললাম না।

মহুয়া বলল, প্রিন্সিপ্যাল কি সহজে জয়ন্তবাবুকে ছাড়ছেন! সুযোগ বুঝে প্যাঁচ কষে ওকে কাবু করে দিয়েছেন। নিজের মেয়ের সঙ্গে জয়ন্তবাবুর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছেন। এই শ্রাবণে বিয়ে।

বললাম ভালই তো, বিয়ের নেমন্তন্ন পাবে।

—'ওয়াক, থু।' মহুয়া মুখ বিকৃত করল।

এরপরই দেখলাম প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে ফেলল মহুয়া। যেন এ সম্পর্কে আলোচনা করতেও তার ঘৃণা। এবার আমার সাহিত্যচর্চা সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ হল। বিভিন্ন ম্যাগাজিনে আমার যেসব লেখা বেরিয়েছিল ওরা সেগুলো দেখল। অঞ্জনা বলল, স্যার তো এখন বিরাট বড় হয়ে যাচ্ছেন। আমাদের কথা আর মনেই থাকবে না আর।

আমি স্পষ্ট এর কোনো জবাব দিলাম না।

কথা বলতে বলতে বেশ বেলা হয়ে গিয়েছিল। ওদের দুপুরবেলা খেতে বললাম। ওরা খুব একটা আপত্তি করল না।

প্রায় সারাদিন থেকে বিকেলবেলার দিকে ওরা চলে গেল। যাবার সময় বলে গেল, চিঠি দিলে জবাব দেবেন তো!

হেসে বললাম, আমাকে এতটা অভদ্র বলে মনে করেছ?

ওরা কি ভাবে আমার কথাটা নিলে, কে জানে! চলে গেল।

মানুষের অন্তরতম মানসিকতার খবর পাওয়া খুবই দুষ্কর। অপরের তো দূরস্থান নিজের মনের হদিশই বা কজন করতে পারে! হৃদয়ের নিজস্ব একটা চলার গতিবিধি আছে, যে সম্পর্কে হৃদয়ের অধিকারী মানুষ নিজেই কিছু জানে না। এই জন্যই তো বৈজ্ঞানিক Pascal একসময় বলেছিলেন—'The heart has its reason of which reason knows nothing. এই থেকেই আধুনিক শিল্পে শিল্পীর অন্তস্তল অভিযান, যা থেকে অধিবস্তুবাদের সৃষ্টি। জানি না অঞ্জনা ও মহুয়া নিজেরা নিজেদের হৃদয়কে জানত কিনা। আমি তো বিন্দুমাত্র আঁচ করতে পারিনি। আমার ধারণা ছিল, শিল্পীর প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে আমার সান্নিধ্য পাবার জন্য ওরা দামোদরে নৌকো করে ঘুরে বেড়াবার আয়োজন করেছিল। কিন্তু সপ্তাহখানেক পরে অবাক হয়ে গেলাম মহুয়ার চিঠি পেয়ে। ও লিখেছে অঞ্জনার হয়ে। সে নাকি আমাকে ভালবাসে। এই জন্যই দামোদরে নৌকো-বিহারের আয়োজন করেছিল। মেয়েটি ভাল। তার প্রেমকে আমি যেন উপেক্ষা না করি।

ভালবাসা সত্যিই এক অদ্ভুত জিনিস। সবাইকে সবার ভাল লাগে না। কাউকে কাউকে ভাল লাগে। আমার ধারণা ছিল উভয়ের মধ্যে চরিত্রের একটা সামঞ্জস্য থাকলে তবেই পরস্পর পরস্পরকে ভালবাসতে পারে। অঞ্জনার প্রতি, আমার মনের সামান্য একটি কোণেও প্রণয়-সম্পর্কিত কোনো ধারণা স্থান পায়নি। তাহলে ওর

কি করে আমার প্রতি এধরনের দুর্বলতা এল? বরং মহুয়া যদি আমাকে এরকম কোনো চিঠি নিজে লিখত তাহলে হয়তো এক ধরনের রোমাঞ্চ অনুভব করতে পারতাম। যদিও ঐ পর্যন্তই, তার বেশি নয়। কারণ, ভালবাসার জন্য যে ধরনের সুদূরপ্রয়াসী কালো চোখের তারা আমি খুঁজি, ওদের কারো চোখে তা ছিল না। বরং ইলোরার চোখে এধরনের সুদূরবগাহ একটা দৃষ্টি ছিল। ফলে অত্যন্ত নিষ্ঠুর না হয়েও মহুয়ার পত্রের জবাব দিয়ে তাকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করলাম, যে এ ধরনের চিন্তার কোনো ভিত্তি নেই।

কিন্তু তাতেও অঞ্জনার তরফ থেকে উচ্ছ্বাসের কোনো অভাব দেখা দিল না। বাঁধ ভেঙে আবেগের বান ছুটলে তাকে সহজে বোধহয় রোধ করা যায় না। কয়েকদিন বাদেই অঞ্জনার চিঠি পেলাম, যে চিঠিতে আবেগের ছড়াছড়ি। মনে মনে হাসলাম। চিঠির জবাব দিলাম না। কিন্তু নদীর বানে কচুরিপানার মত অঞ্জনার পত্র একের পর এক ভেসে আসতেই লাগল। খেতে ইচ্ছে না করলে সন্দেশও বিস্বাদ লাগে, সুতরাং...

মানুষ যা চায়, বোধহয় তা পায় না। এইটেই বোধহয় তার জীবনের চরম ট্র্যাজেডি। অঞ্জনা চাচ্ছিল আমাকে, পাবার সম্ভাবনা নেই। আমি চাচ্ছিলাম কোনো ব্যক্তির হৃদয়ে ভালবেসে নিজেকে সম্প্রসারিত করতে নয়, সাহিত্যের মাধ্যমে নিজেকে সম্প্রসারিত করতে। আশ্চর্য! সেই যে প্রথম একটি বই বেরিয়েছিল তারপর একটি প্রকাশকও আর পাইনি। শুধু বিজ্ঞাপনে উৎসাহী কিছু কাগজের সম্পাদক বিজ্ঞাপনের বিনিময়ে আমার লেখা ছেপে যাচ্ছেন। এ লেখার যে মূল্য কতটুকু, তা বোঝা যাচ্ছিল প্রকাশকের দরজায় গিয়ে। এ-সব মিনি কাগজের চাপে প্রকাশকের দরজা খোলার নয়। তবে সেজন্য মিনি কাগজের লেখার যে কোনো মূল্য নেই, তা নয়। বরং সৃজনীপ্রতিভার প্রকাশ মিনি কাগজগুলোতেই বেশি। প্রকাশকরা সাহিত্যে তেমন আকৃষ্ট নয়, যতটা আকৃষ্ট ব্যবসাতে। আর একথা পৃথিবীর সর্বত্রই স্বীকৃত যে মহৎ সাহিত্য স্বকালে খুব কমই স্বীকৃতি পায়। মধ্যম শ্রেণির সাহিত্যের ব্যবসায়িক মূল্যই সর্বোত্তম।

একজন প্রকাশকের কাছে যেতে তিনি বললেন, সমুদ্র নিয়ে একটি উপন্যাস ছাপার ভারি শখ। লিখতে পারেন তেমন কিছু?

তখন অবধি সমুদ্র আমি চোখেই দেখিনি...তবু সুযোগটা হাতছাড়া করতে চাইলাম না। বললাম, সমুদ্রের উপর লেখা বেরোলেই ছাপবেন? প্রকাশক বললেন, অবশ্য লেখার মানটাও নিশ্চয়ই বিচার করব। তবে আপনার লেখা প্রথম উপন্যাসটি আমি পড়েছি। রোমান্টিক লেখায় আপনার বেশ হাত আছে। দেখুন না একবার ট্রাই করে। প্রস্তাবটি পাওয়া অবধি কেমন একটা ঝোঁক চেপে গেল। দেখাই যাক না একবার চেষ্টা করে, দরজা যখন খুলছেই না! সুতরাং অকস্মাৎ একদিন ছুটি নিলাম অফিস

থেকে দিন কয়েকের জন্য। ভাবলাম ছুটি নিয়ে একটি প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নিয়ে আসা যাক সমুদ্র সম্পর্কে। তখন কে জানতো যে, অদৃশ্য নিয়তি এমন করে হাসছে! গাড়িতে চাপলে আমার একটা নেশা আছে, জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকা। গতির মধ্যে থেকে পারিপার্শ্বিকের দিকে তাকালে পারিপার্শ্বিকের মধ্যে একটা অতিরিক্ত আকর্ষণীয় জিনিস দেখতে পাওয়া যায়। সে জিনিসটা যে কী, বলে প্রকাশ করা যায় না। সে যেন একটা অব্যক্ত অনুভব।

পুরী এক্সপ্রেস রাত নটা নাগাদ ছাড়ে হাওড়া থেকে। পারিপার্শ্বিক দেখায় তখন অনেকটা অসুবিধা। পথের স্টেশনগুলো নৈশ প্রহরীর মত আলো জ্বেলে দাঁড়িয়ে থাকে এইটুকুই দেখা যায় মাত্র। একটা রহস্যময়তা তাতে অনুভব করা যায়। এর বাইরে মাঠঘাট অন্ধকারে ডুবে থাকে। চাঁদনি রাত হলেও ম্লান জ্যোৎস্নায় সঠিক ঠাহর করা যায় না। স্টিফেন স্পেন্ডারের Express'-এর মত পুরী এক্সপ্রেসও হাওড়া স্টেশন-চত্বর ছাড়াল গর্বিত ভঙ্গিতে। তারপর ছুটতে লাগল অক্লান্ত একটা ঘোড়ার মত। মাঝে মাঝে ছোট ছোট স্টেশন যা পাশে পড়তে লাগল, তাদের অধিকাংশকেই সে উপেক্ষায় এড়িয়ে যেতে লাগল। দুই স্টেশনের অন্তর্বর্তী স্থানগুলি প্রথম থেকেই অন্ধকার-অন্ধকার হয়েছিল। তাই উপভোগ করবার সুযোগ ছিল কম। অনেকেই অন্ধকারের মধ্যে একটা বিচিত্র স্বাদ পায়। আমিও যে না পাই তা নয়, তবে তেমন ভাবে নয়, যেমন ভাবে সেই স্বাদ পেলে জানালার ধারে চুপ করে বসে থাকা যায়। সুতরাং রাত্রি এগারোটা অবধি চলবার পরই, গাড়ির ঝাঁকুনিতে ঘুমের আমেজ অনুভব করলাম। স্লিপিং বার্থে চলেছিলাম। উপরের বাঙ্কে নিজের বিছানা বিছিয়ে নিয়ে শুয়ে পড়লাম।

ঘুম ভাঙল সেই ভোর চারটেতে। তিথিটা কি ছিল কে জানে! ভোরের দিকে সামান্য একটু জ্যোৎস্নার খেলা দেখা গেল। সে যে খুব প্রবল আলোয় উদ্ভাসিত তা নয়। যেন খুব কম পাওয়ারের একটা লাইট। তারই নিচে ওড়িশার প্রান্তর ছড়িয়ে আছে। ধানকাটা মাঠ। দূরে দুধারে এবং সামনে মাঠ। নিচে নেমে জানালার ধারে একটু বসতেই এইসব চোখে পড়ে গেল। নিচের বাঙ্কের ভদ্রলোকও খুব প্রকৃতিপ্রেমিক বলে মনে হল। তিনিও সাত-সকালে উঠে বাইরের দিকে তাকিয়ে আছেন।

ভোরের আভাস দেখা দিয়েছিল ভদ্রক স্টেশন ছাড়াতেই। বৈতরণী নদী পার হতেই—সকালের আলোয় ওড়িশার মৃত্তিকা, লতাগুল্ম আর শস্যক্ষেত্র স্পষ্ট হয়ে উঠল। এ অঞ্চলে সমুদ্রের দিকে ধাবমান নদীর ব্যাপ্তি যেন নির্বাক করে দেবার মত বিশাল। মৃত্তিকা ধূসর, শস্য সমারোহী, লতাগুল্ম অসংখ্য। ওড়িশা যেন সজল স্নিগ্ধ।

এ অঞ্চলের দিকে পশ্চিমবঙ্গ ছেড়ে যারা সামান্যও এগিয়েছেন তাঁরা জানেন যে, হাওড়া জেলা পার হলেই মেদিনীপুরের সীমানার মধ্যে মৃত্তিকার বুকে স্পষ্ট

একটি রূপান্তরের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। সেই প্রয়াসই প্রবহমানতার মধ্য দিয়ে ওড়িশার উপকূলে গিয়ে নির্দিষ্ট আকৃতি নিয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব রেলপথের দুই পাশে লতাগুল্মের গায় কেমন এক ধরনের ম্রিয়মান সবুজ রঙ যেন। মেদিনীপুর পার হলেই বাঁকুড়ার মাটির উপর এই ধরনের ম্রিয়মান সবুজ দেখা যায়। একবার বাঁকুড়া গিয়ে এই ধরনের সবুজ রঙ দেখবার আমার সৌভাগ্য হয়েছিল। স্টেশনের দেহে মাখানো কৃত্রিম রঙের মধ্যেও এই ধরনের ম্রিয়মান ভাব। এই ম্রিয়মান ভাব উত্তর ভারতের মাটিতে নেই। সেই ম্রিয়মান সবুজ প্রভাতের স্নিগ্ধ আলোর নিচে কেমন একটা ভাব বিস্তার করে দাঁড়িয়েছিল যেন। দু'পাশে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতেই ব্রাহ্মণী নদীর বিশাল নদীমুখ সেতুর উপর দিয়ে পার হবার পরই কটকের ধারে কাছে ওড়িশার দৃশ্যপট আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। মাটি ধূসর হলেও, কৃষ্ণাভ ভাবটাই বেশি। সূর্যের আলোয়, হাওয়ায়, জলে, উদ্ভিদ বিকশিত হয়ে সবুজের সমারোহে মাঠ-ঘাট ছেয়ে দিয়েছে। এই 'সবুজ' উদ্ভিদপত্রের স্বাভাবিক ক্রিয়াকলাপের ফলে সৃষ্ট এক ধরনের খাদ্য। এই খাদ্য সৃষ্টি করার প্রক্রিয়ার নাম ফটোসিনথেসিস। সে ফটোসিনথেসিসের ফলে উত্তর ভারতের বাবলাবন সবুজ, তারই খেলায় ওড়িশার পথিপার্শ্বে অজস্র কেয়াঝাড়ের পত্র সবুজতর। কটক ছাড়বার পর পথের দু-ধারে কেয়াঝাড়ের খেলা সত্যিই অবাক করে দেবার মত।

কিছুক্ষণ কেয়াঝাড়ের দীর্ঘবিস্তার দেখবার পরই দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের উপর দিয়ে দিকচক্রবালে তাকাতে লাগলাম। ভাবতে লাগলাম, পুরী আর কতদূর! পুরীর সমুদ্রতটে সুনীল বঙ্গোপসাগরের ফেনপুঞ্জবাহী ঢেউ অনন্তবিস্তার জলধি থেকে ছুটে আসছে। তা দেখবার জন্য মন আকুলি-বিকুলি করতে লাগল।

পথের দুই পাশ দিয়ে অপরিচিত দেশের নতুন নতুন দৃশ্য ভেসে উঠতে লাগল। দেখলাম ভূমি উর্বর। শস্যভারে আনত মাঠ। যেতে যেতে বাঁয়ে দিগন্তে তাকালে, কেন যেন সমুদ্রের একটা অসীমতার স্বাদ পাওয়া যায়। সমুদ্র দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আকাশ কোন্ অজ্ঞাত অস্তিত্বের ঘাড়ে নুয়ে পড়ে অসীমের ইঙ্গিত দিচ্ছে যেন। বহু দূরে দিগন্তের কোল ছুঁয়ে কয়েক সারি দীর্ঘশীর্ষ তালগাছ দেখা গেল। কিছু বালিয়াড়িও নজরে পড়ল। একবার চকিতে দিগন্ত ছোঁয়া সুনীল বঙ্গোপসাগরের একটা চমক দেখতে পেলাম মাত্র। আবার হারিয়ে গেল। মন পাগল হয়ে উঠল সমুদ্র দেখার জন্য।

পুরী গিয়ে ট্রেন পৌঁছাল বেলা দশটা নাগাদ। পুরী রেলস্টেশন নামডাকের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নয়। খুবই ছোট স্টেশন। ট্যাক্সি, বাস, প্রাইভেটকারের ছড়াছড়ি নেই। অগুন্তি রিকশা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। পাণ্ডার দল ওঁৎ পেতে আছে যাত্রী ধরবার জন্য। কিছুতেই তাদের এড়ানো গেল না। অবশেষে একজন ভদ্রলোকের পাণ্ডাকে ধরা গেল। সে বলল, কোথায় উঠবেন?

বললাম, সমুদ্রের ধারে কোনো হোটেলে।

—কোন্ হোটেল?

—যেটা ভাল, যেখানে পাওয়া যায় সেখানেই উঠব।

সে বলল, পুরী হোটেল ভাল হবে। সেখানেই চলুন।

রিক্‌শা চলল পুরী হোটেলের দিকে। ডানদিকে জগন্নাথদেবের মন্দির ছাড়িয়ে রিকশা চলল স্বর্গদ্বারের দিকে। অদূর-সমুদ্রের কল-কল্লোল কানে আসতে দেরি হল না। স্বর্গদ্বারের মুখে এসে রিক্‌শা বাঁ-দিকে একটু মোড় নিয়ে সামান্য এগোতেই দক্ষিণ দিকে সুনীল জলরাশির অপার নৃত্যচঞ্চল বিস্তার দেখে বিস্ময়ের অবধি রইল না। দূরে বহু দূরে নীল আকাশ নুয়ে পড়েছে। নিষ্কলঙ্ক নীলিমায় দিগন্ত উজ্জ্বল। দিগন্ত ও আকাশ যেখানে এক সেই সুদূর সীমান্ত থেকে অক্লান্ত নৃত্যে অসংখ্য ঢেউ উঠতে উঠতে নামতে নামতে এগিয়ে আসছে। অসংখ্য অগণিত ঢেউ। উঠছে আর নামছে। একটানা গম্ভীর গর্জন। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় হাহাকার করে হাওয়ারা এসে ঝাঁপিয়ে পড়ছে তটে। নীল, নীল, সবই যেন নীলিমায় নীল। অসীম এক নীলিমায় জগৎ তরঙ্গায়িত।

মনে হল রিক্‌শাওয়ালাকে রিক্‌শা থামাতে বলি। সঙ্গে সঙ্গে বালুকাবেলায় বসে পড়ে সমুদ্রের বুকের দিকে তাকিয়ে থাকি। কিন্তু সেটা সম্ভব নয়। আগে আশ্রয়ের ব্যবস্থা করতে হবে। পুরীর হোটেল তখন গিজগিজ করছে। থাকবার কোনো জায়গা পাওয়া যাবে কিনা, সেই চিন্তা ঢুকল। তবে আমার পাণ্ডাটিকে দেখলাম তৎপর ব্যক্তি। আমাকে হোটেলের উঠানে সামান্য একটু দাঁড়াতে বলে ভেতরে চলে গেল। তারপর কয়েক মিনিটের মধ্যেই ঘরের একটা ব্যবস্থা করে ফিরে এল। ঘর পাওয়া গেছে তিনতলায়। সিঙ্গল রুমই পাওয়া গেছে। দক্ষিণ দিকে। জানালা খুললেই সমুদ্র দেখতে বাধা নেই। পাণ্ডার উপর খুশি হলাম। প্রথম ওদের নিতে চাইনি। না নিলে হয়তো অসুবিধাতেই পড়তে হত। ওর সঙ্গে গিয়েই হোটেলে উঠলাম। ঘরটি ছোট হলেও ভাল। একা-একা সমুদ্র উপভোগ করার পক্ষে যথেষ্ট উপযুক্ত।

পাণ্ডা আমাকে বলল, বিকেলে পুজো দেবেন কি?

বললাম, আপনাকে যখন নিয়েছি, পুজো দেবই। আপনাকে বঞ্চিত করব না। তবে আজ নয়। আজ একটু বিশ্রাম নিয়ে শুধু সমুদ্র দেখব, আর কিছু নয়।

পাণ্ডা একটু হাসল। তারপর চলে গেল।

দেরি করলাম না। সামান্য একটু বিশ্রাম নিয়ে স্নান সেরে ফেললাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই হোটেলের বয় ব্রেকফাস্ট দিয়ে গেল। ব্রেকফাস্ট শেষে একটু সুস্থ বোধ করে নরম বিছানার উপর শুয়ে বুকের নিচে বালিশ রেখে জানালা দিয়ে দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের দিকে তাকালাম। এমন গম্ভীর লীলায়িত সুন্দরের আহ্বান জীবনে আগে কোথাও দেখিনি। এমন গুরুগম্ভীর অনন্ত স্বাদের কথা আগে কখনও কল্পনাও

করতে পারিনি। মুগ্ধ হয়ে দেখতে লাগলাম।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়া করে সামান্য বিশ্রাম নিয়েছিলাম। বিকেলে হোটেলের নির্দিষ্ট টিফিন খেয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সমুদ্রের দীর্ঘ বেলাভূমি লোকে-লোকারণ্য হয়ে উঠেছে। কিনারে ভ্রমণবিলাসীদের জন্য অসংখ্য হোটেল। তারা সবাই হোটেল থেকে বেরিয়ে সমুদ্রবালুতটে আশ্রয় নিচ্ছে। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ফেনপুঞ্জ তুলে সমুদ্র এসে কূলে আছড়ে পড়ছে। অসংখ্য ঝিনুকের মালা মৃত্তিকাকে উপহার দিয়ে আবার নেমে যাচ্ছে। বড় থেকে ছোট অনেকেই ছোটাছুটি করছে। হাততালি দিচ্ছে, ঝিনুক কুড়াচ্ছে। তীরে এসে সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ার আগেই সমুদ্রমুগ্ধ মানুষেরা আবার পিছিয়ে আসছে। সমুদ্র পিছিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আবার এগিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রধৌত বালুতটে ঝিনুক-কুড়াবার জন্য। চিড়িয়াখানার হাতি যেমন একবার এগিয়ে, একবার পিছিয়ে ছেলেদের হাত থেকে খাবার নিয়ে খেলা করে সমুদ্র যেন তেমনি তার সৌন্দর্য-মুগ্ধ মানুষের সঙ্গে লুকোচুরি খেলে চলেছে।

ঝিনুক-কুড়োবার আগ্রহ যে আমারও হয়নি, তা নয়। কিন্তু সে সুযোগ আমি করে উঠতে পারিনি। এই চঞ্চল গম্ভীর বিশাল সমুদ্রের সামগ্রিক সত্তার মধ্যে যে অত্যন্ত এক মহা অনুভব আছে আমি মুগ্ধ হচ্ছিলাম তাই লক্ষ্য করে। সমুদ্র আমি আগে দেখিনি। সমুদ্রের মধ্যে আশ্চর্য মহাসম্পদ রয়েছে। সমুদ্রকে বলে রত্নাকর। তার গর্ভে রয়েছে মূল্যবান রত্নরাজি। কিন্তু তার ভাবগাম্ভীর্যে যে রত্ন রয়েছে তার মূল্য অপরিসীম। প্রকাশক যথার্থই বলেছিলাম। উপন্যাসের এতবড় পটভূমি বোধহয় অন্য কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কোন্ সুদূরের একটা বিচিত্র আহ্বান আছে যেন সমুদ্রের বুকে, তার ঢেউয়ে। ক্ষুদ্রতার ঊর্ধ্বে তা মনকে টেনে নিয়ে যায়। দ্বন্দ্বক্রান্ত হৃদয়কে ক্ষুদ্র পাওয়া-না-পাওয়ার যন্ত্রণা থেকে ভুলিয়ে রাখে যেন। হয়তো আমার প্রকাশকটির হৃদয়ে কোনো তুচ্ছতার গ্লানি আছে। পুরীর সমুদ্রসৈকতে এসে হয়তো কখনও তিনি এ যন্ত্রণায় ভুগেছিলেন। সেই স্মৃতি মন থেকে মুছে দিতে পারছেন না বলেই সমুদ্র নিয়ে একটি উপন্যাস ছাপবার ভারি শখ।

আছে, আছে, সত্যিই রত্ন আছে এই সাগরে। দ্বন্দ্বক্রান্ত হৃদয়কে সমুদ্রের টানে টেনে নিয়ে এ সমুদ্র যেন সত্যিই অব্যক্ত প্রশান্তি দিতে পারবে। কোথায় আমার মনের কোন্ গহনে হয়তো একটি অব্যক্ত যন্ত্রণা ছিল। সমুদ্রের ঘোর গর্জনে বুঝি তা নিরাময় হতে লাগল। মনে হল সমুদ্রের বালুতটে নিজেকে বিছিয়ে দিয়ে, শুধু নির্নিমেষ নয়নে দেখি। দেখি আর তাকিয়ে দেখি। অগণিত ঢেউয়ের মাথায় মাথায় দিগন্তের নিষ্কলঙ্ক নীলিমায় হৃদয়কে প্রসারিত করে দিই। কিন্তু বালুকাতটে সমগ্র পুরী শহর ভেঙে পড়েছে যেন। উপকূলবর্তী সমুদ্রের তটরেখা ধরে সমগ্র সৈকতে কোথাও একটু তিলধারণের স্থান নেই। আপন মনে চিন্তা করতে গেলেও সামান্য একটু নির্জন স্থান দরকার। সমুদ্র সৈকতে কোথায় সেই নির্জন স্থান আছে,

তাই খোঁজ করতে লাগলাম। কিন্তু কোথাও যেন ফাঁক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছিল না। ভ্রমণবিলাসীদের মধ্যে কেউবা অদৃষ্টপূর্ব, কেউবা দৃষ্টপূর্ব সমুদ্রের প্রেমে মাতোয়ারা হয়ে কূলে নেমে পড়েছে। ভিড় হোটেলের দিকটাতেই বেশি। সেখানে বালুতটের চাতালে অনেকটা স্থান পরিষ্কার। সুতরাং অমসৃণ বালুতট খুঁজতে লাগলাম। দেখলাম বালুতট কিছুটা অমসৃণ স্বর্গদ্বারের নিচের দিকটাতে। সেইজন্য তুলনামূলক ভাবে জনবিরল। ধীরে ধীরে সেই দিকটা লক্ষ্য করে এগিয়ে গেলাম।

চমৎকার দৃশ্য! ঢেউয়ের মুখে মুখে শুভ্র ফেনপুঞ্জের মাথায় মাথায় কয়েকটা সমুদ্রপাখি দীর্ঘ ডানা বিস্তার করে হাওয়া কেটে কেটে চলেছে। উড্ডীয়মান পাখির ডানা ভরে অদ্ভুত একটা ছন্দ। যেন উত্তাল সমুদ্রের ঢেউয়ের স্পন্দন সেখানেও।

একটা নির্জন স্থান দেখে বসলাম। সমুদ্রদর্শনের প্রথম অনুভবের সত্যিই বোধহয় কোনো তুলনা নেই। নিজের মনের মধ্যেই আমার আনন্দের কোনো ব্যাখ্যা যেন আমি খুঁজে পেলাম না। শুধু বসে বসে ভাবতে লাগলাম।

ভাবছি। দুর্দান্ত কিশোরীর উদ্দাম কুঞ্চিত স্নিগ্ধ কেশের মত হাওয়া এসে মুহুর্মুহু আছড়ে পড়ছে নাকে-চোখে-মুখে। দূরে বাঁদিকে সমুদ্রের বালিয়াড়িতে একগুচ্ছ ঝাউবন সমুদ্রের ঢেউয়েরই মত হেলে-দুলে নাচছে। বসে বসে আমি ভাবছি—এই ঢেউ, এই অক্লান্ত অফুরন্ত ঢেউ, কেন এবং কোথা থেকে। এই মহাসমুদ্র, অনন্ত জলরাশি সেটাই বা কোথা থেকে এবং কেন? আমাদের এই বাসযোগ্য পৃথিবীতে তিনটি স্তর আছে। বৈজ্ঞানিকেরা যার নাম দিয়েছেন লিথোস্ফিয়ার (শিলামণ্ডল), হাইড্রোস্ফিয়ার (জলমণ্ডল) ও অ্যাটমোস্ফিয়ার (হাওয়ামণ্ডল)। কিন্তু কোনোটাই পরস্পর থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন নয়। শিলামণ্ডলে জল আছে, হাওয়া আছে। জলমণ্ডলে শিলা এবং হাওয়া আছে। হাওয়ামণ্ডলেও শিলা আর জল আছে। যেখানে যার প্রাধান্য সেখানেই সে তার নিজস্ব মণ্ডল সৃষ্টি করেছে। এই মণ্ডলের মধ্যে কার সৃষ্টি আগে, বৈজ্ঞানিকরা আজো নিশ্চয় করে তা বলতে পারেননি।

সৃষ্টিরহস্যকল্পনায় হিন্দুরা অবশ্য আগে কল্পনা করেছেন জলের। কারণসলিলে অনন্ত নাগশয্যায় শায়িত বিষ্ণু। তাঁর কর্ণমূল নিঃসৃত ময়লা থেকে মধু ও কৈটভের সৃষ্টি। তারপর মৃত্তিকা ইত্যাদি। এ কাহিনির কোনো যুক্তিগ্রাহ্যতা হয়তো নেই। আসল কথা, এই বিশ্বপ্রকৃতির উৎপত্তির কারণ জানা অদ্যাবধি বিজ্ঞান বা পুরাণের সাধ্যের অতীত। অধ্যাত্মজ্ঞানে কি জবাব আছে জানিনা। অধ্যাত্ম জ্ঞান আমাদের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। বিজ্ঞান প্রমাণগ্রাহ্য। বিজ্ঞানে এই মহাম্বুরাশির মৌল উপাদান সম্পর্কে ব্যাখ্যা থাকলেও, কেন তা এমন হল, সে জবাব নেই। জলের উপাদান কী? এই পৃথিবীতে তার বিস্তৃতি কতটুকু, বিজ্ঞান তা বলতে পেরেছে, কিন্তু কেন এবং কবে এই মহাম্বুধির সৃষ্টি তা বলতে পারেনি।

মৃত্তিকার তুলনায় সলিলরাশির ব্যাপ্তি সত্য সত্যই বিভ্রান্ত করে দেবার মত।

পৃথিবীর সত্তর ভাগ অংশ এই মহাসমুদ্রের জলরাশি ভরে রেখেছে। এই বিপুল জলরাশি কোথাও বা বিস্ময়কর সুনির্মলতায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিমালা বুকে তুলে, শ্বেতশুভ্র বরফগুলি বুকের উপর মরালের মত ভাসিয়ে নিয়ে অবর্ণনীয় সৌন্দর্য সৃষ্টি করেছে। কোথাও বা সৃষ্টি করেছে ভয়াবহ জোয়ার ভাটা বা ভূমিকম্পজনিত জলোচ্ছ্বাস। কোথাও বা এমনি বিক্ষুব্ধ তুফান।

এই ঢেউ মূলত কেন এবং কেমন করে? সর্বত্র সকল সমুদ্রের উপকূলে একই ধরনের ঢেউই বা নেই কেন? এই সমুদ্রতটের কয়েকশো মাইল তফাতের মধ্যে কোথাও হয়তো বিশাল ঢেউ, কোথাও নাতিক্ষুদ্র, কোথাও ক্ষুদ্র। শ্রীক্ষেত্রের উপকূলে এই যে তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্র সে তো বঙ্গোপসাগরই। অথচ এরই একটি বাহু যেখানে শতভঙ্গ বঙ্গদেশের তটস্পর্শ করেছে সেখানে তরঙ্গের এমন ঊর্ধ্ব-বিস্তার উল্লম্ফন নেই।

সমুদ্র আমি দেখছি এই প্রথম। ঘরের কাছে সুন্দরবনের ফ্রেজারগঞ্জে গিয়েও বঙ্গোপসাগর দেখিনি। সরকার বিজ্ঞাপতি ঝাউবন-বিস্তারিত দীঘার উপকূলেও সাগর দর্শন করিনি। কিন্তু যাঁরা গিয়েছেন এবং পুরীর সমুদ্রতীরেও যাঁরা এসেছেন, সেইসব প্রত্যক্ষদর্শীর মুখে শুনেছি, পুরীর সমুদ্রের এই বিপুল জলোচ্ছ্বাস অন্যত্র নেই।

কেন, কেন এই শ্রীক্ষেত্রের নীলাচলে এমন বিপুল বিশাল দীর্ঘবাহু ঢেউয়ের খেলা? ঢেউয়ের উৎস কী? বৈজ্ঞানিকেরা বলেছেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঢেউয়ের উৎস বিক্ষুব্ধ হাওয়া, ঝড়। সমুদ্রের কোনো অঞ্চলে যদি ঝড় উঠে, সেই ঝড়ের উৎস থেকে হাওয়ার গতি যে দিকে, সেই দিকেই উত্তাল সমুদ্রের উল্লম্ফন ক্রমশ বেশি। ঝড়ের গতিবেগের উপর ঢেউয়ের আকৃতি এবং প্রকৃতি নির্ভরশীল। জোয়ার ভাটাজনিত জলোচ্ছ্বাস কম। ভূমিকম্পজনিত জলস্ফীতি অনবরত ঘটনা নয়। পৃথিবীর সত্তর ভাগ জলের উপর অসংখ্য ঢেউয়ের এই যে নিত্যচঞ্চল লীলা, তার অধিকাংশের উৎসই হল হাওয়া।

সমুদ্রে কোথাও শুনেছি ঢেউ উঠে তিনশো ফিট। কোথাও দুশো, দেড়শো, একশো, ষাট বা পঞ্চাশ ফিট। সাধারণত এই ঢেউ দশ, বারো, পনেরো বা বিশ ফিট। পুরীর সমুদ্রে এই যে দীর্ঘবাহু ঢেউ—এর দৈর্ঘ্য কতটুকু জানিনে। দশ-বারো ফিট তো নিশ্চয়ই। তবু ভারতের অন্যান্য উপকূলের সমুদ্রতরঙ্গ থেকে এর দৈর্ঘ্য নাকি অনেক বড়। একটা ঢেউ থেকে আর একটা ঢেউয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান দীর্ঘ না হলেও খুব একটা কম নয়। ভূগোল-বিজ্ঞানীরা বলেছেন, High waves of long period are produced by very strong winds far away অর্থাৎ দীর্ঘ ব্যবধানের যে বিরাট ঢেউ, দূরে কোথাও প্রবল বায়ুর তাড়নায় তার সৃষ্টি। তাহলে কোথায় দূরে অনন্ত প্রবল ঝড়ের এক উৎস আছে বঙ্গোপসাগরে যা অনবরত এই বিশাল ঢেউয়ের আঘাতে ধুয়ে দিচ্ছে পুরীর সমুদ্র উপকূল? সেই বায়ুর গতিপথ কি শুধু একটি

মাত্র নির্দিষ্ট বৃত্তে ঘুরে বেড়াচ্ছে পুরীর সমুদ্রতট দিয়ে? জগতে কোনো কিছুরই বোধহয় চূড়ান্ত উত্তর নেই। উত্তর পেতে হলে এক মুহূর্ত অনুভবকে...

—কী ভাবছিস?

আপন মনের চিন্তার প্রবাহে যেন ভেসে চলেছিলাম। অকস্মাৎ শব্দটা শুনে চমকে উঠলাম। কে? কে ডাকল? না, কেউ ডাকেনি? একি মনের ভ্রান্তি? এখানে আমাকে কে চেনে যে, এমন করে ডাকবে?

আবার স্পষ্ট শুনলাম, কী ভাবছিস রে?

ফিরে তাকিয়ে দেখি, অত্যন্ত সাধারণ একটি লোক! পরনে নেংটির মত। নগ্ন গাত্র। মাথায় এলোথেলো চুল। অবিন্যস্ত দাড়ি গোঁফ। তবুও, কোথায় যেন একটা বিশেষত্ব লোকটির। না হলে কলকাতার রাস্তায় ডাস্টবিনে খুঁটে খাওয়া ভবঘুরেদের মত মনে হত। গা ঘিন্-ঘিন্ করে উঠত। কিন্তু তা হল না। চোখের দৃষ্টিতে অতলান্ত একটা স্থির সমুদ্রের ব্যাপ্তি আছে যেন। অবাক হয়ে লোকটির দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

চমকে উঠলাম, আমার মনের চিন্তার কথা লোকটি টের পেল কী করে? অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

লোকটি বলল, এই যে তরঙ্গক্ষুব্ধ সমুদ্র, এ হল জগৎ। জগৎ অর্থ জানিস?

কথা বলতে পারলাম না।

লোকটি বলল, জগৎ অর্থ যা চলে। এ হল নকল সমুদ্র, জানিস? আসল একটা সমুদ্র আছে। তাতে কোনো ঢেউ নেই। মহা প্রশান্ত। সমুদ্র দেখা তোর বড় শখ তো, একদিন সেই সমুদ্র দেখতে পাবি।

আমার বিস্ময়ের কোনো সীমা থাকল না। কে এই লোকটি!

লোকটি তার স্নিগ্ধ দৃষ্টি বুলিয়ে আমার মুখের উপর কি দেখতে লাগল যেন। কী দেখল কে জানে! একটু হাসল।

জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছেন যে?

লোকটি বলল, তোকে দেখে।

—কেন?

—নিজের ভিতর কি এক বিরাট সমুদ্র তোর! তুই এসেছিস বাইরে সমুদ্র দেখতে! পরমাত্মার কী আশ্চর্য লীলা!

অবাক হয়ে বললাম, কি বলছেন, ঠিক...।

লোকটি আবার হাসল, স্বয়ং ভগবানও তো মর্ত্যে এসে আত্মবিস্মৃত হন, তোর দোষ কী।

আশ্চর্য! দামোদরের ঘাটে ঠিক এমনি একটি লোক, পাগল ধরনের, বরাহ অবতারের গল্প বলে আমাকে ঠিক এমনিতর ইঙ্গিত দিয়েছিল। আমি নির্বাক হয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম শুধু। সে বলল, 'মহৎ কাজ করবার জন্য

জন্মেছিস তুই। তোর কপালে লেখা আছে। কিন্তু সবই কর্মফল। কর্মফলে কাদায় লেপ্টে আছিস।' কি কর্মফল কে জানে। কাদায় কি করে লেপ্টে আছি, তাও বুঝতে পারলাম না।

লোকটি বলল, আচ্ছা তুই বুঝতে পারছিস না একটা লোক সব সময় ছায়ার মত তোর পেছনে ঘুরে বেড়ায়?

—না।

—পেচ্ছাব করতে বসলে, পেচ্ছাব শেষ হবার মুখে গা কেঁপে উঠে?

—হ্যাঁ!

লোকটি আপন মনেই বলল, আমি ঠিক ধরেছি, তুই-ই সেই।

অবাক হয়ে তার দিকে তাকালাম, আমি কে?

—আগের জন্মে ছিলি গৌর দেশে। তন্ত্রসাধনা করে অনেক উপরে উঠেছিলি। কিন্তু সব তত্ত্ব পার হতে পারিসনি। অহংকার ছিল। সেই অহংকারের বশে গুরুর সঙ্গে তর্ক করেছিলি। সেই গুরুর অভিশাপে নরকে পড়েছিস। নরকের কাদা অনেক দিন ঘাঁটতে হবে।

কী যে বলছে লোকটা ঠাহর করতে পারলাম না। অবাক হয়ে শুধু তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

আপন মনেই হাসল লোকটি। তারপর বিড়বিড় করে বলতে লাগল, সবই তাঁর ইচ্ছা। ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছাতেই এমন হয়েছে। মুক্তি পেয়ে পরমাত্মনে মিশে গেলে জগৎ উদ্ধার করত কে? জগতের জন্য যে তোদের মত লোকের প্রয়োজন। তাই আবার এসেছিস। একা আসিসনি। এসেছে আরো ১৩৪ জন। যখন ধর্মের গ্লানি হয়, তখন তো আসতেই হয়। তোরা না এলে জগৎ বাঁচবে কী করে!

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী বলছেন আপনি?

সে বলল, ঠিকই বলছি। এখনও সময় হয়নি, তাই আত্মবিস্মৃত হয়ে আছিস। সময় হলেই ঠিক জানবি। ভেতরে যে সাপ ঘুমিয়ে আছে সেটা ফোঁস ফোঁস করে উঠবে। শীতকালে সাপ ঘুমায়। কোনো কাজ করে না। গরম পড়লে আপন তাগিদেই বাইরে আসে। গরম পড়লে ঠিক সে বেটি জেগে উঠবে। তখন দেহের মধ্যে ভারি মজার ব্যাপার দেখবি। তখন তোর এই দেহের মধ্যে দেখবি রয়েছে অনন্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। কত অলৌকিক জিনিস দেখবি। লোকে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। তাইতো হয়। অন্ধ কি আর দিনের আলোর মর্ম বোঝে!

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, কী বলছেন আপনি?

আমার কথা যেন শুনতেই পেল না এমনই ভাব করল লোকটি। তারপর আপন মনেই খানিকটা হাসল। বলল, তোর মা নেই তো?

—হ্যাঁ।

—ছোটবেলাতেই গেছে?

—হ্যাঁ।

—যেতেই হবে। মায়ায় আবদ্ধ হলে চলবে কেন। তবু, কিছু মায়া তো থাকা চাই-ই, নইলে সংসারে আটকাবি কী করে? সংসারের কাজ করবি কী করে? তবে নাকানি-চুবানি খেতে হবে অনেক। ভেঙে-চুরে দুমড়ে গেলে তবে তো আসল জিনিসের সন্ধান পাবি। কী একটা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। তার আগেই লোকটি জিজ্ঞাসা করল, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, সারদা মা, এঁদের দেখিস?

—না।

—স্বপ্নেও দেখিস না?

—না।

—দেখবি, দেখবি, অনেক দেখবি। চোখ বুজলেই এঁদের দেখবি। আরো কত কিছু দেখবি। একদিন নিজেকেও জানবি। সে অনেক দেরি। জানলে তো আর কাজ করতে চাইবি না। কাজের জন্যই আটকে থাকবি। একটুখানি মায়ার ঘোর চোখে লেগেই থাকবে। মহামায়া কাজ না করিয়ে তো ছাড়বেন না। মহামায়াই নাকে-দড়ি দিয়ে ঘোরাবেন। ও বেটির ভালবাসার ধারাই এমনি। যাকে ভালবাসে তাকেই কাঁদায়। শেষে ভালবাসার পাত্রের হাতে নিজেই মারা যায়। রামপ্রসাদের গান শুনিসনি—'এবার কালী তোমায় খাব।' ছেলেই শেষপর্যন্ত মাকে খেয়ে ফেলে![1]

—'সে কি!' অবাক হয়ে লোকটির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

—সত্যি রে। অত্যন্ত সত্যি। একদিন নিজেই সেটা বুঝতে পারবি। আবার খানিকক্ষণ আমার মুখের উপর খুঁটিয়ে-খুঁটিয়ে কি দেখল লোকটি। বলল, তুই বইটই লিখিস না?

আশ্চর্য! সব জিনিস যেন লোকটির নখদর্পণে। সব যেন পরিষ্কার দেখতে পায়। বললাম, হ্যাঁ।

—বইয়ে যে সব লিখিস, সব আগে থেকেই চিন্তা করে লিখিস?

—না।

—আসে কোথা থেকে কথাগুলো তবে, বল্?

জবাব দিতে পারলাম না।

লোকটি বলল, মনের মধ্যে মন আছে অন্তরের মধ্যে অন্তর, সেই-ই সব করায়। বেরোবে, অনেক জিনিস বেরোবে তোর। বিয়ে করবি তো?

বললাম, বিয়ে করব কি? আমাকে দেখে জ্যোতিষীরা বলেছেন, সংসার-জীবনে

১. এই অদ্ভুত গানটির অর্থ বুঝতে হলে লেখকের 'দিব্যজগৎ' ও 'দৈবীভাষা' গ্রন্থ দুটি পড়ুন।

আমার স্থান নেই। স্ত্রী-জাতিই আমার দুঃখের কারণ হবে। সুতরাং বিয়ে করব না বলেই ঠিক করেছি।

লোকটি হো-হো করে হেসে উঠল। বলল, মনের মধ্যে একটুখানি যে 'কিন্তু' আছে, সেটা তবে খণ্ডাবি কী করে? বিয়ে তোকে করতেই হবে।

—জেনেশুনে?

—জেনেশুনেই বিষ খেতে হবে। যন্ত্রণা পেতে হবে না? নীলকণ্ঠ হতে হবে না? সংসারের যন্ত্রণা কি বুঝতে হবে না? নইলে সংসারকে তারণ করবি কী করে? তারপর তো আরও মজা!

—কি মজা?

—সে কথা বলব না। বললে ভয় পাবি। চোখে-ঠুলি পরে বসে আছিস। এভাবে থাক না কিছুদিন। জানাবার যিনি তিনি তো সময় মতো জানাবেনই। যাক তবু আশ্বস্ত হলাম।

—আমি কিন্তু কিছুই বুঝতে পারছি না?

—আমি তো তোর গুরু নই যে বোঝাব।

—আমার গুরু কে? কোথায় পাব?

—গুরু যিনি আছেন, তিনিই তোর গুরু। ঘরে বসেই পাবি?

—গুরুর সন্ধান না করলেও?

—হ্যাঁ রে, জমিতে যদি শস্য ফলাতে হয়, তবে জমি কৃষকের কাছে যায় না, কৃষকই জমির কাছে আসে? গুরুর জন্য আবার বাইরে যেতে হয় নাকি। সৎ গুরু হলেন সৎ কৃষক। জমি খুঁজে বেড়ান। ভাল জমি দেখলেই চাষ করে বীজ দেন। তিনিই দেখবি খুঁজে খুঁজে কাছে আসবেন। আসলে কি, তিনি যে তোর কাছেই আছেন। সময় হলে আপন মনে বসে বসে তাঁর নির্দেশ পাবি। সব হবে তোর নিজের মন থেকে, বাইরে থেকে নয়।

লোকটি উঠে দাঁড়াল। আমি অবাক হয়ে তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। দু'পা এগিয়ে গিয়ে লোকটি আবার আমার দিকে ফিরে তাকাল, হ্যাঁ রে, মনে থাকে যেন, ঘরে ফিরেই একটা বিয়ে করে ফেলিস। যা কিছু জ্বালা-যন্ত্রণা তাড়াতাড়ি ভোগ করে নে। নইলে অমৃত-সাগরের সন্ধান পাবি কী করে? নকল সাগর দেখে কি গল্প হয় রে? সে গল্প হয় নকল গল্প। আসল সাগর দেখলে আসল গল্প লিখতে পারবি। সেই কারণ-সাগরের পাশে যেতে হবে না?

কথা কয়টি বলতে বলতে লোকটি এত দ্রুত পা ফেলে চলে গেল যে, মুহূর্তের মধ্যে তাকে আর দেখা গেল না। আমি সাগরকে কেন্দ্র করে উপন্যাস লেখবার যে পরিকল্পনা করছিলাম তা যেন মুহূর্তের মধ্যে তছনছ হয়ে গেল।

পরদিন।

সমুদ্রের গর্জন শুনতে শুনতেই ঘুম ভেঙে গেল। উঠে কেবলমাত্র বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে সকালবেলার সমুদ্রকে দেখেছি, দরজার কড়া নড়ে উঠল। ভাবলাম, বয় বোধহয় ব্রেকফাস্ট নিয়ে এসেছে। হাত-মুখটা পর্যন্ত ধোয়া হয়নি যে! কিংবা বেড-টির ব্যবস্থা আছে বলে বেড-টি দিতে এসেছে? উঠে দাঁড়িয়ে দরজা খুলতেই আশ্চর্য হয়েগেলাম। হোটেলের কেউ নয়। আমার সেই পাণ্ডাটি এসে হাজির। দাঁত বের করে অমায়িক হাসি হেসে সে বলল, রাত ভালভাবে কাটল তো?

মনে মনে ভাবলাম, রাত তো ভালভাবেই কেটেছে। তবে সকালে উঠেই যার মুখ দেখলাম, দিনটা এখন কী রকম যায়। মুখে সে কথা আর প্রকাশ না করে বললাম, এত সাত-সকালে আপনি?

সে বলল, আজ জগন্নাথদেবের পুজো দেবেন বললেন না?

সত্যি! অদ্ভুত ধৈর্য আর অনুশীলন এই পাণ্ডাদের। দু'টো পয়সার জন্য এরা কি না করতে পারে! এই ধৈর্য আর অনুশীলন যদি সমগ্র জাতির থাকত, তাহলে ভারতবর্ষের চেহারা বোধহয় পাল্টে যেত। এত সকালে পাণ্ডার হানা দেবার অর্থও বুঝতে পারলাম। সারা রাত বোধহয় তার আশঙ্কায় কেটেছে, পাছে আমি হাতছাড়া হয়ে যাই। সুতরাং তার মনে একটা স্বস্তির ভাব ফিরিয়ে আনবার জন্য বললাম, নিশ্চয়ই পুজো দেব। তবে এখনও তো হাত-মুখই ধুইনি। চা খাইনি। স্নান সারিনি।

পাণ্ডা বলল, ওতে কিছু নেই। আমি আবার পরে আসব। কখন আসব বলুন?

বললাম, দশটা নাগাদ আসুন। তৈরি হয়ে থাকব।

পাণ্ডা বিনা দ্বিধায় চলে গেল।

পুরীর পাণ্ডার একটা সহজাত সময়বোধ আছে বোধহয়। স্নান সেরে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখছি, দশটা বাজে-বাজে। এমন সময় দরজায় কড়া-নাড়ার শব্দ হল। খুলেই দেখি সেই পাণ্ডা। হাসি-হাসি মুখ। বলল, হয়েছে তো?

হেসে বললাম, হ্যাঁ।

—পুজো দেবেন তো!

—পুজো! হ্যাঁ তা একটা দিতেই হবে।

পাণ্ডাটি সঙ্গে সঙ্গে হিসেব নিয়ে বসে গেল, দেখুন আমি রেজিস্টার্ড পাণ্ডা। আমার মাধ্যমে যা করবেন তাতে ঠকবার সম্ভাবনা নেই। কি পুজো দেবেন? যদি—

হেসে বললাম, পাণ্ডামশাই, ধীরে। আসল পুজো পরে হবে। এখন মন্দির দর্শন করতে চাই। ঘাবড়াবেন না। সে জন্য আপনার যা প্রাপ্য সেটা—

পাণ্ডাটি বলল, সে কথা বলতে হবে না। আমরা লোক চিনি।

কি জানি! জগন্নাথের পাণ্ডা বলে ওরা হয়তো অন্তর্যামী। নইলে লোকচেনা কি অত সহজ কাজ? ভাল লোককেও আমরা মুখ দেখে খারাপ লোক বলে ভেবে ফেলি। আবার খারাপ লোককে ভাল ভাবি। 'Face is the index of mind' অন্তত

একালে এ তত্ত্ব ঘটে না। সুতরাং সেই মুখ দেখে লোককে বিচার করা—সে তো চাট্টিখানি কথা নয়! অপরকে চেনা তো দূর স্থান নিজেকেই বা কজন চিনতে পারে? অন্তত আমার আমিকে আমি তো আজ পর্যন্ত চিনতে পারিনি। যাই হোক, এ নিয়ে তার সঙ্গে কোনো কথা না বলে, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়লাম।

সমুদ্র সৈকত থেকে পুরীর জগন্নাথ মন্দির খুব দূরে নয়। অল্পক্ষণের মধ্যেই এসে পৌঁছে গেলাম। পুরীর মন্দিরের বিশালত্ব আছে। কিন্তু কারুকার্য খুব একটা নেই। নেই বলে যে কিছুই নেই তা নয়। ওড়িশার মন্দির-শিল্প যে-রীতিতে বেড়ে উঠে স্বমহিমায় ভারতবর্ষে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে, পুরীর জগন্নাথ মন্দিরও সে রীতি থেকে বিচ্যুত নয়। রাজপথ থেকে মন্দিরে প্রবেশের মুখেই রয়েছে সিংহদ্বার। তার পাশেই প্রাচীর। এ অঞ্চলের হিন্দু মন্দিরের কলাকৌশল অনুযায়ী এ মন্দিরে রয়েছে—ভোগমণ্ডপ, জগমোহন, নাটমন্দির আর বিমান। উত্তর ভারতীয় মন্দির-শিল্পের কলাকৌশল অনুযায়ীই এ-সব করা। উত্তর ভারতের মন্দির নির্মাণ-কৌশলের মধ্যে রয়েছে পাঁচটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। যেমন, (১) গর্ভগৃহ, অর্থাৎ মূলগৃহ, যেখানে আরাধ্য দেবতার স্থান। (২) অন্তরাল, অর্থাৎ গর্ভগৃহের পরই যে শূন্য স্থান। (৩) মণ্ডপ অর্থাৎ পূজা করবার স্থান। (৪) প্রদক্ষিণা অর্থাৎ উপরোক্ত তিন ক্ষেত্রকে ঘিরে যে প্রদক্ষিণের স্থান। (৫) প্রাচীর অর্থাৎ সব কিছুকে ঘিরে সীমানা নির্দেশক দেওয়াল।

এই মূল পাঁচটি বৈশিষ্ট্যের উপর আছে আরও একটি, যেমন অলংকার। ইংরেজিতে যার অর্থ আরো ভাল বোঝায়—ডেকরেশন। এই ডেকরেশন ইসলামিক আর্টের মত কতকগুলি প্রাণহীন শাস্ত্রবাক্যের উদ্ধৃতি দিয়ে নয়। এ ডেকরেশন জীবন-স্পন্দনে স্পন্দিত।

ভারতীয়দের কাছে সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডই জীবন-স্পন্দনে স্পন্দিত। এক মহাজীবনপ্রবাহ নিজেকে রূপান্তরিত করেছে সূক্ষ্মতম অস্তিত্ব থেকে বস্তুগ্রাহ্য জীবনে। তাই ভারতীয় স্থাপত্যকলায় সর্বত্র বিচিত্র জীবনের অপরূপ নৃত্য। বহু ঊর্ধ্বলোক থেকে অরূপ রূপ ধরে ক্রমশ নিচে নেমে এসে পার্থিব হয়েছেন, স্থূল হয়েছেন। সেকথা প্রমাণ করার জন্যই ঊর্ধ্বশিখর মন্দির কল্পনা করা হয়েছে। মন্দিরের সর্বাগ্র চূড়ায় আছে সূচ্যগ্র ত্রিশূল। যে ত্রিশূলের মস্তিষ্ক বিন্দুর মত একটি অস্তিত্ব মাত্র। ত্রিশূলের গোড়ায় অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আছে নক্ষত্র অর্থাৎ মহাশূন্যে বস্তুর প্রথম আবির্ভাব। নক্ষত্র থেকে ধীরে ধীরে বস্তু। সে বস্তু ক্রমশ স্থূল হয়ে নিচে নেমে এসেছে। তার এই অবতরণের প্রতিটি স্তরে জীবননৃত্যের চিত্র। প্রথম দৈবী, তারপর মানবীয়, তারপর পাশবিক, সর্বশেষে মৃত্তিকা। কোথাও প্রাণহীন কিছু নেই। সর্বত্রই জীবন। তাই ভারতীয় মন্দিরগাত্রে প্রাণহীন বস্তুর অস্তিত্ব প্রায় চোখেই পড়ে না। ভারতবর্ষের সেই আশ্চর্য শিল্পকলার সঙ্গে পুরীর মন্দিরকে মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করলাম। পুরীর মন্দিরে ব্যাপ্তি আছে।

ভারতীয় শিল্পকলার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে ক্রমপর্যায়ে উর্ধ্বগতি আছে। দেবতাকে রাজসিক কল্পনায় স্থাপন করে তাঁর মনস্তুষ্টির পর্যন্ত ব্যবস্থা আছে। যেমন রয়েছে ভোগ মণ্ডপ। জগমোহন (দরবার কক্ষ), নাটমন্দির এবং বিমান অর্থাৎ মূল দেবমন্দিরের উর্ধ্বে বিমান, অর্থাৎ আকাশস্পর্শী মন্দির শিখর, যা স্থূল থেকে সূক্ষ্মে উঠে গেছে, ব্রহ্মাণ্ডের সঙ্গে বস্তুর যোগাযোগ করেছে। কিন্তু জীবননৃত্যে স্পন্দিত অঙ্গসজ্জা তেমন নেই। আঙ্গিক ঠিকই আছে, কিন্তু প্রাণের যেন কোথায় একটু অভাব রয়ে গেছে।

স্তরে স্তরে ওঠা জগমোহন ও নাটমন্দিরের শিখর দেখলাম। পিরামিডাকৃতি মূল মন্দিরের পাঁজরাকৃতি নকশা করা উর্ধ্বগতি লক্ষ্য করলাম। অঙ্গশিখরের অনুকরণ আছে, আছে নকল জানালার অভিনয়, তামিল ভাষায় যাকে বলে কুণ্ডু। আছে পাঁজরাকৃতি অমলকময় অঙ্গশিখর। মন্দির শিখরে অমলকও (গোল তাকিয়ার আকৃতি চূড়া) আছে। কিন্তু তবু কিসের জন্য যেন একটা অভাব রয়েছে। ভারতীয় স্থাপত্যশিল্পের ইতিহাসে এই জন্যই পুরীর মন্দিরের তেমন স্থান নেই। যদিও ধর্মমন্দির হিসেবে এটি অন্যতম হিন্দু তীর্থক্ষেত্র।

তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। মন্দিরে প্রবেশের মুখেই এমন করে দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁ-করে দেখব, পাণ্ডা বোধহয় তা অনুমান করতে পারেনি। হয়তো বা একটু বিরক্ত হল। কিন্তু এদের ধৈর্য অপরিসীম। বাইরে বিরক্তির এতটুকুও লক্ষণ দেখাল না। হয়তো সে আমাকে পাগলাটে ধরনের ভেবে বিরক্তি চেপে রাখল। এরকম পাগলাটে ধরনের বহু পর্যটক পুরীতে বেড়াতে আসে।

মন্দিরের কথা, মন্দিরের ইতিহাসের কথা ভাবছিলাম। তা দেখে পাণ্ডা বোধহয় নিজের পাণ্ডিত্য জাহির করার ইচ্ছা চেপে রাখতে পারল না। এগিয়ে এসে নিজে থেকেই মন্দিরের ইতিহাস বলতে আরম্ভ করে দিল এই যে মন্দির দেখছেন, এ মন্দির আজকের নয়। বহু পুরনো মন্দির এটা। আরম্ভ করেছিলেন রাজা অনন্তদেব বর্মণ। সময় ১১৯০ খ্রিস্টাব্দ। শেষ করেন তাঁর পুত্র অনঙ্গদেব। ওড়িশার বারো বছরের রাজস্বের সবটাই এই মন্দির নির্মাণ করতে গিয়ে ব্যয় হয়ে গিয়েছিল। তবে অনন্তদেব ও অনঙ্গদেব মন্দির নির্মাণ করলেও জগন্নাথের অধিষ্ঠান এখানে অনেকদিন আগে থেকেই।

পাণ্ডুবংশের রাজা উদয়নের পুত্র ইন্দ্রবল ওড়িশার আদি অধিবাসীদের সঙ্গে মিলে প্রথম এখানে জগন্নাথদেবের পুজো করেছিলেন। তখন শ্রীশ্রীজগন্নাথ দেবের নাম ছিল নীলমাধব দেব। নীলমাধবের এত গুণ ছিল যে, একবার মগধের রাজা মহাপদ্মনন্দ পুরীতে এসে নীলমাধবকে চুরি করে নিয়ে যান। কলিঙ্গরাজ খারবেল মগধ আক্রমণ করে নীলমাধবকে আবার পুরীতে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন। ৮২৪ খ্রিস্টাব্দে রাজা যযাতিকেশরী প্রথম মন্দির তৈরি করেন। সমুদ্রের নোনা হাওয়ায় অল্পদিনের মধ্যেই

মন্দিরটি নষ্ট হয়ে যায়। ১০৩০ খ্রিস্টাব্দে গঙ্গো-বংশের রাজা চোড় গঙ্গো আবার নতুন করে মন্দির তৈরি করেন।

পাণ্ডার বর্ণনা শেষ হলে আবার মন্দিরের দিকে তাকালাম। মন্দির বিশাল। প্রায় একটি দুর্গের মত। ভারতে পুরনো দিনের, বিশেষ করে মধ্যযুগের মন্দিরগুলি সবই দুর্গাকৃতি ছিল। এর কারণ, মন্দির শুধু দেবতার বাসস্থান নয়, তাঁর সেবায় নিযুক্ত অসংখ্য ব্যক্তিরও বাসস্থল। এর মধ্যেই আছে নৈবেদ্য ফল ও ফুলের বাজার। আছে সহস্র ব্যক্তির জন্য রন্ধনশালা ও ছোট ছোট আরও অনেক মন্দির। আছে অসংখ্য পুজারীর বাসগৃহ ও দেবদেবীর পীঠস্থান। সুতরাং প্রাচীন বা মধ্যযুগীয় মন্দির ছোট হলে চলত না। প্রয়োজন হলে বিধর্মীর হাত থেকে বাঁচবার জন্য সৈন্যরাও এখানে আশ্রয় নিতে পারত। মন্দিরগুলি ধনরত্নের আকরও ছিল, ফলে বিধর্মী আক্রমণকারীরা এগুলি লুণ্ঠন করার আগ্রহ দেখত। অর্থগৃধ্নু তার জন্যই সুলতান মামুদ ভারত আক্রমণ করতে এসে মন্দিরগুলোকে কখনও রেহাই দেননি।

মন্দিরের বিশাল প্রাচীরের বাইরে দাঁড়িয়ে এতক্ষণ মন্দিরটিকে দেখছিলাম। মন্দিরের বহির্প্রাচীরের পরই জগন্নাথদেবের রন্ধনশালা। ছোট ছোট বাগানও আছে। পদাচারণাচত্বর থেকে গভীর পরিখা দিয়ে রন্ধনশালা বিচ্ছিন্ন। সিংহদ্বারের মধ্য দিয়ে বর্হিপ্রাচীর অতিক্রম করলেই সিঁড়ি বেয়ে ঊর্ধ্বে উঠতে হয় মূল মন্দিরে যাবার জন্য। সেখানেই এতদঞ্চলের শিল্পরীতি অনুযায়ী প্রথমে আছে জগমোহন, অর্থাৎ দরবার কক্ষ। তারপর নাটমহল। শেষে মূল মন্দির বা বিমান। এই ব্যাপক পরিকল্পনার পেছনে শিল্পীদের একটা বিশেষ রকমের মনস্তত্ত্ব কাজ করেছিল।

মন্দির কল্পনায় একটা মহোত্তর চিন্তাশক্তি কাজ করলেও ঈশ্বর চিন্তায় কিন্তু সেকালের লোকেদের একটা সীমাবদ্ধতা ছিল। মন্দিরে এসে ভগবানও হাত-পা-ওয়ালা মানুষের মত হন এটাই ছিল তৎকালের মানুষের বিশ্বাস। সেইজন্য মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও শক্তিশালী যে ব্যক্তি—নৃপতি বা সম্রাট, তিনি যেভাবে জীবন যাপন করতেন সেইভাবেই দেবতার জন্য পরিকল্পনা করা হত রাজগৃহের। প্রথমেই থাকত দরবারগৃহ, পরে নাটমহল এবং তারপর বাসগৃহ। ভারতীয় শিল্পীরা মনে করতেন যে, ঈশ্বরের জীবন যাপন প্রণালীও অনেকটা রাজাদের মত।

পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের জগমোহনে শিল্পকর্ম তেমন নেই। সেইজন্য সেখানে দাঁড়ালাম না। জগমোহন কেন, কোথাও শিল্পকর্ম তেমন নেই। সেইজন্য জগমোহন ছাড়িয়ে নাটমহলের অভ্যন্তরটা সামান্য একটু দেখে নিয়েই মূল মন্দির অর্থাৎ বিমানের কাছাকাছি চলে গেলাম।
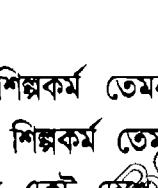
ওড়িশায় যে শিল্প-রীতির প্রাধান্য তার উৎস কিন্তু শুধুমাত্র মধ্যযুগই নয়, আরও অতীতে। মন্দিরের পঞ্জরবন্ধনরীতি গুপ্ত যুগের। পুরীর মন্দিরের মূল বিমানও মৃত্তিকা থেকে উর্ধ্ব অবধি পঞ্জরে আবদ্ধ। পঞ্জরগুলো মূল শিখরের অনুকরণ। এই জন্য
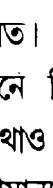
একে অঙ্গশিখরও বলা হয়। পঞ্জর ও দুই পঞ্জরের মধ্যবর্তী অংশ সর্বত্রই অঙ্গসজ্জা। কিছু কিছু ভাস্কর্যও আছে। মিথুনচিত্র থেকে দেবদেবী, পশুপাখি, কিংবদন্তির প্রাণী, সব। সবারই একটা Significance আছে। বিশেষ করে ভাস্কর্যগুলির! মন্দিরগাত্রে এ ধরনের মূর্তি-সংযোজন আজকের চোখে অনেকটাই বিসদৃশ মনে হয়। তবে এ ধরনের ভাস্কর্যে ভারতীয় শিল্পীদের এক সময়ে কোনো দ্বিধা ছিল। কিন্তু কেন?

ভারতীয় শিল্প-সমালোচকদের মতে এর কারণ এক ধরনের ভারতীয় দেহ-দর্শন। ভারতীয় শিল্পে মিথুন মূর্তির আত্মপ্রকাশ খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকেই। ভাস্কর্যশিল্পনির্দেশক গ্রন্থের মতে মিথুন হল সৌভাগ্যের প্রতীক। একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে যে, মূর্তিগুলোর নির্মাণ-কৌশল এমন যে, এতে নির্লজ্জ স্থূল আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ ঘটেনি। ভারতীয় শিল্পীদের কাছে যেমন আতিশয্যের কোনো প্রশ্ন ছিল না, তেমনই ছিল না দেহজ পাপবোধের তেমন কোনো ধারণা। শুধুমাত্র শিল্পীদের কাছেই নয়, প্রতিটি ভারতীয়ের কাছেই একসময় ভালবাসা বা মানবীয় প্রেম ছিল প্রকৃতিরই একটা অভিব্যক্তি মাত্র। মৈথুন ছিল জীবাত্মার সঙ্গে ঈশ্বরের অতীন্দ্রিয় যোগাযোগের একটা প্রতীক। সেই কারণে কলিঙ্গ-শিল্পে মিথুন মূর্তি একটা স্বতঃস্ফূর্ত অভিব্যক্তি পেয়েছে। এতে তন্ত্রের একটা প্রভাব আছে বলে অনেকে মনে করেন। ধর্মীয় দৃষ্টিতে দেখলে মিথুন চিত্র তখন মিথুন থাকে না, শিল্প তাৎপর্যে ভরে ওঠে। শিবলিঙ্গ আপাতদৃষ্টিতে অশ্লীল। কিন্তু এর পেছনে যে অধ্যাত্ম তত্ত্ব কাজ করেছে তা জানলে মহিমময় হয়ে ওঠে। যারা জানে না তারাও দীর্ঘ আচরিত ধর্মবিশ্বাস অনুযায়ী একে পরম পবিত্র জিনিস বলে মানে। কলিঙ্গের মিথুন মূর্তিগুলিকেও যদি সাধারণ্যে স্বর্গীয়ভাবে উদ্বোধিত করা যেত তাহলে মন্দিরগুলি সাধারণের চোখে ভিন্নদৃষ্টিতে দেখা দিত।

তন্ত্রের গূঢ় তত্ত্ব বাদ দিয়েও কিছু কিছু লোক ওড়িশা-মন্দিরের গায়ে মিথুন মূর্তিগুলির নিজস্ব ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আমার বাবার কাছে ছোটবেলায় জগন্নাথদেবের মন্দিরগাত্রে মিথুন চিত্র সম্পর্কে একটা বিশেষ রকমের ব্যাখ্যা শুনেছিলাম। জগন্নাথদেবের রথগাত্রেও মিথুন মূর্তি আছে। বাবা এর ব্যাখ্যা দিতেন রথকে মানব দেহের সঙ্গে তুলনা করে। তিনি মনে করতেন, রথ হল মানুষেরই দেহ। এই স্থূল মানবদেহে নানা ক্লেদ আছে। জীবাত্মা পরিচালিত এই মানবদেহকে নানা পঙ্কিল পথের উপর দিয়ে চলতে হয়। তাতে দেহে কাদা লাগেই। এই দেহ-রথের আরোহী হলেন পরমাত্মন। তিনি দেহের মধ্যে নির্বিকার বসে থাকেন। তাঁকে কোনো ক্লেদ স্পর্শ করে না। হয়তো কলিঙ্গের মন্দিরগুলিকে মানব-দেহের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে বলেই বহিরঙ্গে নানা ক্লেদের ব্যবস্থা।

ওড়িশার মন্দির-শিল্প সম্পর্কে এইসব কথা মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই মূল মন্দিরে গিয়ে জগন্নাথদেবের মূর্তি দেখবার জন্য প্রবল আগ্রহ জন্মাল। আর কালবিলম্ব না

করে নাটমন্দির ছাড়িয়ে বিমানে গিয়ে ঢুকলাম।

পুরীর জগন্নাথদেবের মন্দিরের বেদীতে যে তিনটি বিশাল মূর্তি আছে—জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্র, তাতে শিল্পকর্ম কতদূর আছে বিচার করবার আগেই মূর্তি তিনটির বিশালতা যেন প্রথমেই দর্শককে অভিভূত করে ফেলে। তিনটি মূর্তির শিরস্ত্রাণে তিনটি বিশাল মণি জ্বলজ্বল করছে। কিছুক্ষণ ভাবনাচিন্তারহিত ভাবে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। অদ্ভুত একটা চমকের মধ্যে ছিলাম যেন। চমক ভাঙল পাণ্ডার কথা শুনে। সে আমাকে হাত ধরে মন্দিরের বেদীর কাছাকাছি নিয়ে গিয়ে বেদী ছুঁতে বলল। বেদীর চারদিকে রয়েছে একটা সমতল পদচারণা ক্ষেত্র—স্থাপত্যের ভাষায় যাকে বলে স্পেস, ভারতীয় স্থাপত্যনির্দেশে যাকে বলা হয় অন্তরাল। বেদি স্পর্শ করাবার পর পাণ্ডা আমাকে নিয়ে সেই অন্তরাল দিয়ে একবার মূল বেদিটা পরিক্রমণ করিয়ে নিয়ে এল। বাইরে আলো। পেছনে নিঃসীম অন্ধকার। সেই অন্ধকারে প্রবেশ করলে বাইরে যে পুরীর সুনির্মল আকাশে একটা প্রবল নক্ষত্র অকল্পনীয় তেজ বিকিরণ করে চলেছে, সে কথা মনেও হয় না। প্রদক্ষিণ শেষ করে নতুন করে আবার আলোর মধ্যে প্রবেশ করলে মনে ব্যাখ্যাতীত এক চেতনার সঞ্চার হয়। মনে হয় চিরন্তন আলো-আঁধার—অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যুর এক বৃত্তাকার গতির কথাই বোধহয় এই বেদি-প্রদক্ষিণ ভক্তজনকে বুঝিয়ে দিতে চাইছে।

কিন্তু অন্ধকার শেষ করে আলোর মধ্যে এসে আবার মূর্তিগুলির দিকে তাকাতেই মনে প্রশ্ন জাগল—এই মূর্তি তিনটির Significance কী? একি জন্ম, মৃত্যু ও পালনের প্রতীক। না, সত্ত্ব, রজঃ ও তমের প্রতীক? জন্ম, মৃত্যু ও পালনের ভাবনা—মূর্তি তিনটির মধ্যে আরোপ করা যায় না। কিন্তু সত্ত্ব, রজঃ ও তম সম্পর্কে চিন্তা করা যায়। জগন্নাথ সত্ত্ব গুণের প্রতীক। বলভদ্র রজঃ গুণের এবং সুভদ্রা তম গুণের। পরম ব্রহ্মণকে সচ্চিদানন্দ বলা হয়, কারণ তাঁর তিনটি aspect আছে! যেমন, সৎ, নির্গুণ অস্তিত্ব; চিৎ, অহংবোধ ও আনন্দ, অর্থাৎ প্রকাশ। জগন্নাথ নির্গুণ। বলরাম, যিনি কর্ষণকারী, তিনি সগুণ এবং সুভদ্রা প্রকৃতি। আমার ব্যাখ্যা যা-ই হোক না কেন, ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, জগন্নাথ মন্দিরের মূর্তিত্রয়ের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্ন, অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ আশ্রয় লাভ করে আছে। তিনি মূর্তির কপালের তিনটি রত্ন সেই কথাই প্রকাশ করছে! এই ত্রিরত্ন এক সময় বজ্র নামে ত্রিশূল হয়ে বৌদ্ধদের হাতে শোভা পেত। বজ্রের এক অর্থ যেমন মেঘবজ্র, তেমনই তা হীরক বা রত্নও। বৌদ্ধদের বজ্র ছিল হীরকেরই প্রতীক। হীরক এমন কঠিন জিনিস যা দিয়ে অপর জিনিস ছেদন করা যায় কিন্তু নিজে সে ছেদিত হয় না। এই থেকেই বৌদ্ধদের বজ্রযান তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল। এই হীরক বা বজ্র তারা ব্যবহার করত অতিপ্রাকৃত ক্ষমতা বোঝাবার জন্য।

শৈবদের সঙ্গে বৌদ্ধদের একটা নিকট সম্পর্ক আছে। সেইজন্য জগন্নাথদেবের

সঙ্গেও! শৈব তান্ত্রিকেরা সাম্যবাদী, বৌদ্ধরাও, বৈষ্ণবেরাও। শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথের মন্দির-প্রাঙ্গণে কোনো জাতিভেদ নেই। বৌদ্ধদের সঙ্গে শৈবদের নানা ধরনের নিকট সম্পর্ক আছে। শৈব সম্প্রদায়ও ত্রিশূল ব্যবহার করে। এই ত্রিশূল শৈব ত্রিচিন্তার প্রতীক—অর্থাৎ সত্ত্ব, রজঃ ও তম! বৌদ্ধদের ক্ষেত্রে এই ত্রিশূল বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রতীক। বৌদ্ধ ধর্ম যেমন ইতরজনকেই বেশি আকৃষ্ট করেছিল, শৈবেরাও তেমনি। সিন্ধু উপত্যকাতে পাওয়া যোগাসনে বসা পশুপতির যে মূর্তি দেখা যায় গৌতম বুদ্ধের বসবার ভঙ্গিও কতকটা অনুরূপ। পশুপতির মাথার উপর যে ত্রিপত্রবৃক্ষের ডাল দেখা যায়, গৌতম বুদ্ধের মাথার উপর অশ্বত্থ ডালের পাতাও অনেকটা সেইরকম দেখতে। দু'জনেরই আসন বৃক্ষনিম্নে। শৈবে সর্প আছে, বিষ্ণুতেও, বুদ্ধেও! শিবে আছে কণ্ঠে, বুদ্ধে ছত্রক হিসেবে এবং বিষ্ণুতে অনন্তনাগ হিসেবে। কিন্তু পার্থক্যও একটা বিরাট আছে। বুদ্ধের মূর্তি সুন্দর, শিবের মূর্তি নয়নহর। কিন্তু জগন্নাথের মূর্তি কিম্ভূতকিমাকার, অসমাপ্ত। ভারতীয় বৌদ্ধশিল্পের পাশে এ শিল্পের কোনো যেন স্থানই নেই। বৌদ্ধশিল্পের মধ্যে আবার গন্ধার শিল্প নয়নমুগ্ধকর। গ্রিকো-রোমান রীতিতে তৈরি। গ্রিসের শিল্প হল গ্রিকো-রোমান শিল্পের আদর্শ। বাহ্যিক নিখুঁত সৌন্দর্যে গ্রিক ভাস্কর্যের তুলনা নেই। সেখানে কায়া-সাধনার বিজয় নিশান উড়ছে। কিন্তু জগন্নাথদেবের মূর্তির মধ্যে কায়া এমনভাবে অবহেলিত যে এ শিল্প অপরকে দেখাতেও আপাতদৃষ্টিতে বেদনাদায়ক ঠেকবে।

মূর্তি তিনটির বিশালত্ব বোকা বানিয়ে দেবার মত বটে, কিন্তু কলাকৌশলের দিক থেকে এত ছোট কেন, ভাবতে ভাবতেই অদ্ভুত একটা জবাব পেয়ে গেলাম যেন। এইই তো সব চেয়ে বড় শিল্প। যা নয়নমুগ্ধকর তাই মহৎ শিল্প নয়। মহৎ ভাবনাকে যে শিল্প প্রকাশ করে তাই মহৎ শিল্প। জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা আপাতদৃষ্টিতে কুৎসিত হলেও ভাবের জগতে অনবদ্য। জগন্নাথদেবের মূর্তির মধ্যে বিরাট ভারতীয় ভাবনাকে রূপ দেওয়া হয়েছে। ভারতীয়েরা মনে করেন যে, যিনি পরম সত্য তাঁর কোনো গুণ নেই। সত্যি তিনি নির্গুণ। তিনি চলেন না, কিন্তু চলেন; তিনি করেন না, অথচ করেন; তিনি দেখেন না, অথচ দেখেন। পরমাত্মন বা পরম-ব্রহ্মাণের এই যে ভাবটি, তা বোঝাবার জন্যই জগন্নাথের এমন ধরনের মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে। তিনি সর্বত্রগামী অর্থাৎ সর্বদাই সর্বত্র গিয়ে আছেন, এইজন্য তাঁর পা নেই। তিনি সর্বশ্রোতা, তাই তাঁর কান নেই। তিনি সব কিছুই করেন, এইজন্য তাঁর হাত নেই। তিনি সর্বদর্শী এইজন্য তাঁর দৃষ্টি নেই। মূর্তি 'তিনটি' হবার কারণ তিনি সৎ+চিৎ+আনন্দ। এক এক মূর্তিতে এক এক ভাবের প্রকাশ। কিন্তু বিভিন্ন হয়েও তাঁরা এক। এই আশ্চর্য শিল্পে সেই চমকপ্রদ জিনিসটা ধরা পড়তেই আমার সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গিটাই যেন কেমন পাল্টে গেল। অদ্ভুত এক শ্রদ্ধাবোধ করলাম মূর্তিত্রয়ের দিকে তাকিয়ে। অন্তরাল থেকে পেছনে সরে এসে দেওয়ালের কাছাকাছি তন্ময় হয়ে

সাত-পাঁচ ভাবছি এমন সময় পাণ্ডার কণ্ঠ শুনে চমক ভাঙল—দেখুন, দেখুন।

—'কি?' ফিরে তাকালাম।

দেওয়ালের একটা জায়গায় সামান্য অংশ ক্ষয়ে গেছে। হাতের তালুর ছাপের মত একটা অংশ মাত্র। পাণ্ডা বলল, এই ছাপটা হল ভগবান শ্রীচৈতন্যদেবের করতলের ছাপ। এখানে দাঁড়িয়ে ভগবান জগন্নাথকে দর্শন করে তিনি ভাবে এমন উদ্বেলিত হয়েছিলেন যে, সেই মহাভাবের স্পর্শে পাষাণও গলে গিয়েছিল।

ভারতীয় অধ্যাত্ম দর্শনের সত্যতা সম্পর্কে আমার তেমন সন্দেহ নেই। কিন্তু পুরাণের এবং এই ধরনের গল্পকথার প্রতি আমার কিছুমাত্র আস্থা নেই। মূর্তির মত ভারতীয় গল্প-কাহিনির অনেকগুলিরই কিছু রূপকতত্ত্ব থাকতে পারে। কিন্তু এই ধরনের গল্পের সঙ্গে বিজ্ঞানের বিন্দুমাত্র সম্পর্ক আছে বলে মনে হয় না। সামাজিক বঞ্চনায় বঞ্চিত কিছু লোক কোনো একটা জায়গায় আশ্রয় পাবার চেষ্টা করে। তাদের সেই দুর্বলতার সুযোগ নেয় কিছু প্রতারকশ্রেণীর লোক। তাদের কল্যাণেই পুরাণের কিছু আজগুবি গল্প, মহাপুরুষদের অলৌকিকতা প্রভৃতি প্রচারিত হয়েছে। আমার নিজের যুক্তির মধ্যে ধরা না গেলে কোনো কিছুতেই আমি বিশ্বাস করি না। সেইজন্য পাণ্ডার কথায় আবেগে উদ্বেলিত হয়েছি, এমন কোনো ভাব দেখালাম না। জগন্নাথ, সুভদ্রা ও বলভদ্রের মূর্তিতত্ত্ব নিয়ে নিজের মধ্যে তন্ময় হয়েছি বলে পাণ্ডা হয়তো ভেবেছিল, আমিও তথাকথিত বৈষ্ণবদের মত একজন, 'ক' শুনতে কৃষ্ণভাবে চোখ দিয়ে জল ঝরবে। কিন্তু যখন ঝরল না, সে তখন স্থানান্তরে যাবার জন্য তৈরি হল। আমাকে বহির্প্রাচীরের কাছে এনে জগন্নাথদেবের রন্ধনশালা দর্শন করাল। রন্ধনশালা সত্যিই রাজসিক। পাণ্ডা রন্ধনশালার খুঁটিনাটি সব আমাকে বুঝিয়ে বর্ণনা করল। তারপর বলল, হোটেলে খাবেন, না মহাপ্রসাদ নেবেন?

জগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদের আর যা-ই গুরুত্ব থাক বা না থাক, একটি জিনিস সত্যিই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল অর্থাৎ জগন্নাথদেবের মন্দিরে জাতপাত স্থান পায়নি। ভোজনালয়ে আদ্বিজচণ্ডাল সবাই এক পংক্তিতে ভোজন করছে। ভারতবর্ষের হিন্দু সমাজের সব চাইতে একটি বড় ত্রুটি এতে দূর হয়েছে। এই মানসিকতা ভারতবর্ষের সর্বত্র থাকলে ভারতের সমাজ এত দুর্বল হয়ে পড়ত না। তাই বললাম, হোটেল তো দুনিয়ার সর্বত্রই আছে। লন্ডনেও পয়সা দিলে ভাত পাওয়া যায়। কিন্তু জগন্নাথপ্রভুর মহাপ্রসাদ সর্বত্র মেলে না। মিললেও এমন পরিবেশ কোথাও পাওয়া যাবে না। মন্দিরে ঢোকার মুখে ডোমের ঝাঁটা খেয়ে শুদ্ধচিত্ত হতে হয়। কাঙালের সঙ্গে, অস্পৃশ্যের সঙ্গে এক পংক্তিতে এক সাথে আহার করলে এখানে জাত যায় না। চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার মধ্যে এমন মহৎ ব্যতিক্রম আর কোথায় পাব? সুতরাং এ সুযোগ ছাড়ব না। মহাপ্রসাদই নেব।

পাণ্ডা বলল, তাহলে দুটো টাকা দিন, আট্‌কা নিয়ে আসি। হোটেলে গিয়ে খাবেন।

হেসে বললাম, হোটেলের নয়, সাধারণ মানুষ—মুচি, মেথর, ভিখারির সঙ্গে এক পংক্তিতে বসে এখানেই খাব। আপনি ভোগের প্রসাদ আনার ব্যবস্থা করুন।

পাণ্ডা সামান্য কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে দুটো টাকা নিল, তারপর আর কোনো কথা না বলে আট্‌কা আনার জন্য এগিয়ে গেল।

পাঁচ

ওড়িশায় স্থাপত্য-শিল্পের সব চেয়ে বড় কীর্তি রয়েছে কোনারকে—তারপরই ভুবনেশ্বরে। হোটেলে ফিরে এসে সেইদিনই কোনারক-গামী একটি বাস ঠিক করে নিয়েছিলাম। বাস ছাড়বে পরদিন ভোরবেলা। একই বাস ফেরার পথে দেখিয়ে আনবে ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দির এবং খণ্ডগিরি ও উদয়গিরি।

খুব ভোরবেলা উঠতে হবে এই চিন্তায় রাতে ভাল ঘুম হয়নি। 'এই বুঝি ভোর হল, এই বুঝি ভোর হল' অবস্থা, এই চিন্তাতে আধো-ঘুম আধো-জাগরণের মধ্যে সারা রাত কেটে গিয়েছিল। ফলে রাত তিনটেতেই উঠে পড়ে হাত-মুখ ধুয়ে ঠিকঠাক হয়ে নিয়েছিলাম। বাইরে তখন সমুদ্রের একটানা গর্জন শোনা যাচ্ছে। ভোরের হাওয়ার এক উন্মত্ত দাপাদাপি চলেছে। প্রকৃতির মধ্যে যেন অদ্ভুত একটা অস্থিরতা। যেন সারা পৃথিবীব্যাপী কি একটা বিচিত্র ভাঙাগড়ার খেলা চলছে। ঘড়িতে পৌনে চারটে বাজতেই ঘরের দরজায় তালা ঝুলিয়ে বেরিয়ে পড়লাম।

আলো তখনও স্পষ্ট নয়। পাতলা অন্ধকার ঘন কুয়াশার মত পৃথিবীকে জড়িয়ে ধরে রয়েছে। পুরী হোটেলের সীমারেখার বাইরে সমুদ্রতটে এসে সামান্য কিছুক্ষণ দাঁড়ালাম। ঢেউয়ের চূড়া তখন আরও বিশাল। তরঙ্গশীর্ষের ফেনপুঞ্জের মধ্যে কিছু হয়তো ফসফরাস আছে যা মাঝে মাঝে ঝক্‌মক্ করে উঠছে। হাওয়া যেন ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ কোনো উন্মাদ রমণীর কেশাগ্র, তেমনি করে চোখে-মুখে চিট্‌মিট্ করে আছড়ে পড়ছে।

এর আগে সকাল সকাল ঘুম থেকে উঠে ব্রাহ্মমুহূর্তের স্বাদ জীবনে আর কখনও নিইনি। মুহূর্ত যেটাই হোক, আমার মনে হল, এরকম একটা রহস্যময় প্রকৃতিই বোধহয় বৈদিক ঋষিদের অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রতি শ্রদ্ধাবনত করে তুলেছিল—যা থেকে বৈদিক স্তোত্রের উৎপত্তি। খানিকক্ষণ চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম।

আবছা কয়েকটা ছায়া নড়ছে। হাওয়ায় একটা শীতার্ত ভাব আছে। ওধারে সৈকতনিবাসী কয়েকটা ভবঘুরে আগুন জ্বালিয়ে বোধহয় উত্তাপ নিচ্ছে। সত্যি, মানুষের বিচিত্র জীবনের বোধহয় শেষ নেই। আমি অন্য দিকে ঘুরে স্বর্গদ্বারের দিকে হাঁটতে আরম্ভ করে দিলাম।

নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখি গুটিগুটি আরও কয়েকজন লোক এসে আমার

পাশে দাঁড়াল। বুঝলাম, এরাও কোনারক যাত্রী। দেখলাম সাগরিকা, পুরী হোটেল, সি-ভিউ প্রভৃতি থেকে আরও লোক স্বর্গদ্বারের দিকেই আসছে।

সূর্য তখনও ওঠেনি। তবে অন্ধকারের আবরণ অনেকটা পাতলা হয়ে এসেছে। পায়ের নিচে বালির রঙ স্পষ্ট দেখা যায়। সমুদ্র ক্রমশ নীলাভ হচ্ছে। দুরে সামান্য একটা রঙের রেখা পড়েছে দিগন্তের কোলে। বুঝলাম, কিছুকাল পরেই সূর্য উঠবে। শুনেছি, সমুদ্রে সূর্য উঠে অকস্মাৎ দিগন্ত থেকে লাফিয়ে। সে দৃশ্য তুলনাহীন। সেই সুবর্ণসুযোগ যখন হাতে এসেছে সেটা দেখতে হবে। সুতরাং সুদুর পূর্বদিগন্তে সমুদ্র আর আকাশ যেখানে পরস্পর মিশে গেছে সেই দিকে তাকিয়ে থাকলাম। কিন্তু তবু সূর্যোদয় দেখা হল না। দিগন্তে রঙের আলিম্পনা ক্রমশ বেশি করে ছড়িয়ে পড়ছে, ঠিক সেই সময় বাসের কনডাক্টর বললে, আপনারা সব এবারে উঠে পড়ুন, বাস ছাড়বে।

বাধ্য হয়ে উঠতে হল। বাস ছেড়েদিল মিনিট দুয়েকের মধ্যেই। সূর্যোদয়ের রঙের খেলাকে সে গ্রাহ্যই করল না। ঢেউয়ের গর্জন আর হাওয়ার মাতামাতি অস্বীকার করে আমাদের রথ স্বর্গদ্বার দিয়ে পুরী শহরের বুকে উঠল। সমুদ্রের ধার দিয়ে বরাবর একটা রাস্তা তৈরি হচ্ছে পুরী থেকে কোনারক যাবার পথ। সেটা তখনও সম্পূর্ণ হয়নি। সুতরাং বাস পুরানো পথ ধরেই যাবে।

বাস চলছে। আমি আমার স্বভাব অনুযায়ী জানালার ধারে বসে পথের দিকে তাকিয়ে দেখছি। উৎকলের সমুদ্র তীরে অনন্তের আবেগ থাকলেও মাটিতে কোথায় যেন একটা সোঁদা গন্ধ আছে যা ইনফিনিট সাজেশন অর্থাৎ অসীম ইঙ্গিত দিয়ে মনকে টেনে নিতে পারে না। কিন্তু উত্তর ভারতের মাটিতে অনন্তের একটা গন্ধ আছে। হিমালয়ের পাদদেশ অঞ্চলে বহুদূরলোকের একটা আহ্বান শোনা যায়। ওড়িশার মাটিতে কেন যেন সে রকম কোনো অতীন্দ্রিয়তার গন্ধ আমি পেলাম না, যেমন পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মাটিতে অতীন্দ্রিয় জগতের বিন্দুমাত্র ছোঁয়া নেই। অথচ বর্ধমান ছাড়ালেই বীরভূমের মাটি থেকে বাউলের একতারা বাজাতে থাকে।

পুরী শহরের উপর দিয়ে যে রাজপথ গেছে তা ধূলাকীর্ণ হলেও চওড়া। সমগ্র রাজপথের দুধারে শুধুমাত্র শহরের উপরের পথটুকুর দুদিকেই অনন্তের স্বাদ সামান্য পাওয়া যায়। শহর ছাড়িয়ে মাঠে নামলেই মৃত্তিকার সরস সজীবতায়, পৃথিবীর মায়াই বেশি, অতীন্দ্রিয়ের পরশ তেমন নাই। পথের দু'ধারে অগণিত বৃক্ষ ছায়া বিস্তার করে আছে। পথের দৃশ্য তবু ভাল। রুক্ষ ধূলাকীর্ণ যে রাজপথ তীর্থযাত্রীকে দিল্লী থেকে মথুরার দিকে নিয়ে যায়, সেই রাজপথের দু'দিকে যে উদাসীন সুরের প্রকাশ, পুরী থেকে কোনারকের পথে সেই গভীরতর আহ্বান নেই। যে-কোনো নতুনেরই যে একটা বিশেষ আকর্ষণীয় ক্ষমতা থাকে, পুরী কোনারকের পথে তার অভাবের কারণ বোধহয় এই যে, এ অঞ্চলের মাঠে-ঘাটে চরিত্রগত অভিনবত্ব কিছু নেই,

বিশেষ করে সন্ধানীর চোখে। বাংলাদেশের যে-কোনো উর্বর অঞ্চলের সঙ্গে ওড়িশার এই উপকূলীয় সমভূমির একটা নিকট সম্পর্ক আছে। সেই সামঞ্জস্যের জন্যই উপকূলীয় ওড়িশার মাটিতে অভিবনত্ব তেমন নেই। আর সেই কারণেই আকর্ষণ কম বলে মনে হয়।

তবু....গতির মধ্যে অনন্তপ্রয়াসী ভিন্নতর একটি স্বাদ আছে। কলকাতার একই রাস্তায় নিত্যদিন যাতায়াত করলেও বাসে যদি জানালার ধারে বসা যায় তবে একই পথের দুধারে নিত্যদিন ভিন্নতর স্বাদ পাওয়া যায়। ভাবুক মানুষ গতির মধ্যে বসে ভিন্নতর স্বাদ অনুভব করেন। হৃদয়ে যাঁরা অগভীর তাঁরা গতির মধ্যে বসে থেকেও পারিপার্শ্বিকের দিকে তাকিয়ে দেখেন না। তুচ্ছ অভিনব তাঁদের মধ্যে মহান অভিনবত্বের স্বাদ সৃষ্টি করতে পারে না। তাঁরা অমৃতের মধ্যে বসে থেকে মৃতের এবং অসীমের মধ্যে থেকে সীমাবদ্ধ দৈনন্দিন সংসারের গল্প করে সময় কাটান।

কোনারক। একদিকে তার সমুদ্র আর ঝাউবন, আর তিনদিকে সমতলভূমি। সমুদ্র একসময় মন্দিরের গা-ঘেঁষে ছিল। এখন সামান্য দূরে। মন্দির চত্বরে দাঁড়িয়ে ঝাউবনের ওধারে এখন আর সমুদ্রের সেই বিশাল তরঙ্গনৃত্য দেখা যায় না। কিন্তু একটু কান পেতে থাকলেই হাওয়ায় ভেসে আসা সমুদ্রের একটানা গর্জন শোনা যায়। সমুদ্রবিহারী নাবিকেরা একসময় এই অনবদ্য মন্দিরের কৃষ্ণচূড়া লক্ষ্য করে বিস্ময়ে অভিভূত হতেন। তাই পর্তুগিজ নাবিকেরা এর নাম দিয়েছিলেন 'ব্ল্যাক প্যাগোডা'। তখন নীলের শ্বেতশুভ্র ফেনপুঞ্জ অনবরত আছড়ে পড়ে এর চরণ ধুয়ে দিত।

'কোনারক' কথার দেশীয় অর্থ হল সূর্যের কোণ। অর্থাৎ যে অঞ্চলে সূর্য থাকেন, সে অঞ্চল সূর্যের জন্য উৎসর্গ করা হয়েছে। সূর্যের স্থান শুধুমাত্র ওড়িশার এই অঞ্চলটুকুই, একথা আজ মহামূর্খেও বিশ্বাস করবে না। কিন্তু তাকে কেন্দ্র করেই ওড়িশার এই অঞ্চল আজ মহিমময় হয়ে উঠেছে। কলিঙ্গ-স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্প এক অপূর্ব সিদ্ধিলাভ করেছে।

বাস থেকে নেমে সবাই দেখছি দৌড়াচ্ছে কোনারকের মন্দির দেখতে। আমিও যাচ্ছিলাম। হোটেলের একজন লোক এসে বলল, বাবু, আগে খেয়ে যান। বললাম, না, আগে মন্দির দেখে আসি।

লোকটি বলল, অনেক সময় লাগবে বাবু, যদি দেখার মত দেখতে চান তবে খেয়ে যান। আর যদি শুধু চোখে দেখতে চান, বিচার না করে দেখেন, তাহলে দেখে এসে খাবেন।

শেষের কথাটি বেশ মনে লেগে গেল। আমি তো শুধুমাত্র দেখতে আসিনি, বিচার করে দেখতে এসেছি। দেখতে দেখতে যদি হঠাৎ ক্ষুধার তাড়না বোধ করি তাহলে দেখাটা ঠিক হবে না। বরং মন্দির দেখার পর 'অন্য কোনো কাজ থাকবে'-

এ-বোধ না রেখে মন্দিরে যেতে হবে। আমি থামলাম। বললাম, চলো। খেয়ে নি আগে।

খড়ের ছাউনি দেওয়া হোটেল। স্টিমার-ঘাটে নদীর চড়ায় হোটেলের মত। আধুনিকতা নেই। সাদাসিধে রান্না, সাদাসিধে খাবার। তাই খেতে লাগলাম।

আমার সামনের দিকে দু'জন ভদ্রলোক বসে খাচ্ছিলেন। মনে হল কোনো কলেজ বা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক হবেন। কোনারক মন্দিরের গঠনশৈলী ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করছিলেন। আমাদের বাসে এঁদের দেখতে পাইনি। হয়তো প্রাইভেট-কারে এসেছেন। তাঁদের কথা থেকে যা সামান্য কিছু বুঝলাম, তার সারাংশ এই কোণারক মন্দিরের বহিঃপ্রাঙ্গণে আছে তিনটি প্রবেশ-পথ—পুবে, পশ্চিমে আর উত্তরে। পুব তোরণের মুখে দু'টো সুন্দর হাতির মূর্তি। দুইয়েরই শুঁড়ের উপর রয়েছে দু'টি মানুষ। পশ্চিমে দু'জন অশ্বারোহী একেবারে রণসাজে সজ্জিত। আর উত্তর তোরণে আছে দুটো বাঘের মূর্তি, দুটো হাতিকে মেরে তার উপর বসে আছে।

কোণারকের মন্দির সম্পর্কে যে একটা কিংবদন্তি আছে আমি সেটাও জানতাম না। এঁদের কথা থেকে তা জানতে পারলাম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পুত্র শাম্ব। হঠাৎ তাঁর হল কুষ্ঠ রোগ। রোগ আর সারে না। ঋষিরা বললেন, কলিঙ্গের মৈত্রেয় বনে গিয়ে প্রায়শ্চিত্ত কর, তবে এ রোগ সারবে। শাস্ত্র ও পুরাণ পড়ে জানা যায় যে, সেই মৈত্রেয় বন ছিল কোনারকেই।

শাম্ব মৈত্রেয় বনে এসে কঠোর প্রায়শ্চিত্ত করবার পর সত্যি সত্যিই রোগমুক্ত হলেন। চন্দ্রভাগা নদী এই কোনারকের কাছ দিয়েই সমুদ্রে এসে পড়েছে। রোগমুক্তির পর শাম্ব যখন এই নদীর জলে স্নান করছিলেন সেই সময় নদীর জলে একটি মূর্তি পান। মূর্তিটি সূর্যমূর্তি। সূর্যের কৃপাতেই তাঁর রোগমুক্তি ঘটেছে শাম্বের এটাই ধারণা ছিল। সুতরাং তিনি এখানে একটি মন্দির নির্মাণ করেন। সেই থেকেই এ অঞ্চল তীর্থ-মাহাত্ম্যে পূর্ণ।

কিন্তু অধ্যাপক দুজন শাম্বের এই গাল-গল্পে বিশ্বাস করেন না। কোনো আধুনিক মানুষই প্রমাণ ছাড়া কোনো কিছুতে বিশ্বাস করতে পারেন না। সুতরাং অধ্যাপকেরা ইতিহাসে যে প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে সেই কথাই বলছিলেন। একটি উৎকীর্ণ লিপি থেকে নাকি জানা গেছে যে, গঙ্গো-বংশের শাসক রাজা প্রথম নরসিংহদেব ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। আসলে এ মন্দিরের উৎপত্তি প্রকৃতপক্ষে একটা বিজয়স্তম্ভ হিসেবে।

বিজয়স্তম্ভ তোলার কারণ নরসিংহদেব ভারতবর্ষে মুসলমান আক্রমণকারীদের অপ্রতিরোধ্য বিজয়গতিতে প্রথম বাধা দিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ যখন দ্রুত মুসলমানদের পদানত হচ্ছে, সেই মুহূর্তে তাদের বাধা দিয়ে পরাজিত করা যে-কোনো হিন্দু শাসকের পক্ষে বিরাট একটা কাজ সন্দেহ নেই। রাজা নরসিংহদেব ওড়িশার কাতাসিন নামক

স্থানে মুসলমানদের প্রথম এমন করে হারিয়ে দেন যে, অর্ধচন্দ্রের সম্মান ধূলিসাৎ হবার উপক্রম হয়। শুধু যে তাদের পরাজিত করেছিলেন তাই নয়, তাদের হাত থেকে বাংলাদেশের মেদিনীপুর, হাওড়া ও হুগলী জেলাও ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। এর ফলে ওড়িশা দুই শতাব্দীর জন্য মুসলমানদের আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায়। সেই যুদ্ধজয়ের স্মৃতিকে স্থায়ী করে তোলার জন্যই রাজা প্রথম নরসিংহদেব এই মন্দিরটি তৈরি করেছিলেন।

মন্দিরের গঠনশৈলী সম্পর্কে অধ্যাপক দু'জন যে আলোচনা করছিলেন তা সত্যিই আমার পক্ষে স্পষ্ট জ্ঞানের কারণ হল। যদিও এ সম্পর্কে সামান্য একটা জ্ঞান আমার ছিল—যে জ্ঞানের আলোতে পুরীর মন্দিরকে আমি মিলিয়ে দেখবার চেষ্টা করেছিলাম।

ওড়িশা অঞ্চলে যে-সব মন্দির দেখা যায় তার গঠনরীতি মধ্যযুগে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তখনকার দিনে নিয়ম ছিল যে, মন্দিরের অন্তত তিনটি অংশ থাকবে। যেমন নাটমহল, জগমোহন ও বিমান। এরকম করার কারণ এই যে, দেবতাকে রাজার মতই কল্পনা করা হত। একজন রাজা যেভাবে জীবন যাপন করেন, দেবতার জন্যও সেই ভাবে ব্যবস্থা করা হত। রাজার অন্দরমহলের মত দেবতার অন্তঃপুর থাকত। তারই নাম বিমান। বিমান নাম এই কারণে যে, সেই গৃহের চুড়ো ক্রমশ ছুঁচোলো হয়ে আকাশের দিকে উঠে যেত। দেবতা তো আর সাধারণ নন! তিনি অতিপ্রাকৃতের প্রতীক। এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে জীবন মহাশূন্য থেকে নেমে এসেছে। সেই জন্য আকাশস্পর্শী বিমানের চুড়ো নিচের দিকে ক্রমশ স্থূল এবং ব্যাপক। সেই বিমানের অঙ্গসজ্জায় বিন্দুমাত্র ফাঁক নেই, শূন্যতা নেই। নানা অলংকরণে তা পূর্ণ। অধিকাংশই জীবনের চিত্র, পশুপাখি উদ্ভিদ থেকে সব। তবে তার পরিকল্পনা এমন করে করা হয়েছে, যাতে দেখা যায়, ঊর্ধ্বে রয়েছে দৈবী জীবন, তারপরে মানবীয়, তারপরে স্তর অনুযায়ী পশুপাখি উদ্ভিদ এইসব। অঙ্গসজ্জার কোথাও একটু ফাঁক না রাখার কারণ এই যে, হিন্দুদর্শনের চিন্তাতে প্রাণহীন শূন্য বলতে কোথাও কিছু নেই। সর্বত্রই জীবন। সুতরাং দেবতা যার প্রাণকেন্দ্র, তার চারিদিকে কোথাও জীবনের অস্তিত্ব ছাড়া আর কিছু থাকতে পারে না। তাই অসংখ্য জীবনচিত্রের অঙ্গসজ্জা করা হয়েছে মন্দির গাত্রে। তবে নকশা হিসেবে, স্থানভেদে মন্দিরসজ্জার প্রকৃতি ভিন্ন। ওড়িশার মন্দিরের চুড়ো কতকগুলি পাঁজরাকৃতি রেখা দ্বারা বেষ্টিত। কোথাও পাঁজরগুলি ছোট ছোট মন্দিরের আকারে ক্রমশ ঊর্ধ্বে উঠে গেছে। কোথাও বা মূল মন্দিরেরই প্রতিকৃতি স্থান পেয়েছে দুই পাঁজরের মধ্যকার অংশে। মন্দিরশীর্ষে কোথাও বা গোল তাকিয়ার মত আছে। একে বলে অমলক।

বিমানের পরেই কোথাও বা নাটমন্দির, কোথাও বা জগমোহন। এই নাটমন্দির বা জগমোহনের অঙ্গসজ্জাতেও এতটুকু ফাঁক নেই। তবে এগুলির উপরের আচ্ছাদন

বা ছাদ চতুষ্কোণ ভঙ্গিতে ছুঁচোলো হয়ে উপরে উঠে গেছে। জগমোহন হল দরবার কক্ষ। সুতরাং তার দেয়ালচিত্রও সেই রকম। নাটমহল হল চিত্ত বিনোদনের স্থান। তার দেয়ালে নর্তক-নর্তকীদের চিত্র রয়েছে নানা ভঙ্গিতে। পুরী থেকে ভুবনেশ্বর, কোনারক সর্বত্রই মন্দির নির্মাণের পরিকল্পনা এক।

কোনারকের মন্দির প্রাঙ্গণে ঢুকলে প্রথমেই নজরে পড়বে একটা ভাঙা গৃহের নিম্ন অংশ। যতটুকু এখনও আছে, তার দেয়ালে অসংখ্য নানা ভঙ্গিমায় খোদাই করা নর্তক-নর্তকীর মূর্তি। এইসব মূর্তি দেখে কল্পনা করা যায় যে, এটাই ছিল নাটমন্দির। নাটমন্দিরের পরেই রথাকৃতি বিরাট-মণ্ডপ। এটা এখনও সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়নি। অসংখ্য দর্শক এটাকে দেখেই মনে করে যে, এটাই সূর্যমন্দির। কিন্তু এটা আসলে মুল মন্দির নয়। এটাই জগমোহন বা দরবার কক্ষ। জগমোহন ও বিমান অধিষ্ঠিত ছিল একটা রথাকৃতি ভিতের উপর। গুণে দেখলে দেখা যায় যে, সেই রথে বারো জোড়া চক্র রয়েছে। তার মধ্যে চার জোড়া চক্রের উপর জগমোহনটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে। এর পেছনেই ছিল বিমান যেটা দেবতার মূল গৃহ। কিন্তু সেটা নেই, ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। যা আছে তার শিল্পশৈলীই নাকি দর্শককে অভিভূত করে দেয়।

মন্দিরের গায়ে নাকি অসংখ্য অশ্লীল চিত্র। নানা মিথুন চিত্র, নানা ভঙ্গিতে, নানা ভাবে। ঐতিহাসিক দু'জন এই মিথুন চিত্রের কারণ হিসেবে মধ্যযুগীয় মানসিকতাকেই দায়ী বলে মনে করেন। তাঁরা মনে করেন যে, এই সময় ভারতীয় সমাজ অবক্ষয়ে ভুগছিল। ভারতীয়দের নৈতিক অধঃপতন হয়েছিল। অবশ্য শিল্পীরা নাকি ভিন্ন দৃষ্টিতে বিচার করেন। তাঁদের মতে রক্তমাংসের দেহ উপভোগকে মধ্যযুগীয় ও প্রাচীন ভারতীয়েরা পাপদৃষ্টিতে দেখতেন না। তাঁরা দেহজ উপভোগকে ভালবাসারই অভিব্যক্তি বলে মনে করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, নরনারীর মিলন জীবাত্মার সঙ্গে পরমাত্মার মিলনের একটা প্রতীক মাত্র। ভাস্কররা মিথুন চিত্রকে সৌভাগ্যের প্রতীক বলে মনে করতেন। মধ্যযুগীয় তন্ত্রে একটা বিশ্বাস ছিল যে ভোগই হল যোগ, আনন্দই ধর্ম। সুতরাং সেই আনন্দের চিত্রে কোনো বাধা নেই।

বিশ্রাম নেবার অবসরে সামান্য আহার্য গ্রহণ করতে করতে অধ্যাপক দু'জন গল্প করছিলেন। খাওয়া শেষ হলেই তাঁরা উঠে গেলেন। কিন্তু কোনারক মন্দিরে প্রবেশের আগে আমি সৌভাগ্যবশত যে ধারণা লাভ করলাম, সেটা আমার ভাগ্যের প্রসন্নতার জন্যই বোধহয় হল। খেতে বসে লাভই হয়েছিল। এবার কোনারককে নতুন দৃষ্টিতে বিচার করতে পারব। তথাকথিত যে-সব গাইড এখানে আছে, তারা মধ্যযুগীয় কুসংস্কারেরই ধারক, শিল্পমূল্য কিছুই বোঝে না, ইতিহাস জানে না। পুরাণের গল্পকে আরো কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে বর্ণনা করে। গাইড ছাড়াই এবার কোনারক দেখতে পারব, বুঝতে পারব। সুতরাং বেশ হাল্কা বোধ করলাম। খাওয়া-দাওয়া শেষ করে

ধীরে ধীরে মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম।

কোনারক মন্দিরে ঢুকলাম সঠিক পথ দিয়েই। সামনে প্রথমে কালের নির্মম আঘাতে বিধ্বস্ত নাটমহল। কিছুই প্রায় নেই। আছে শুধু ভিত্ আর ভগ্ন কিছু স্তম্ভযুক্ত দেয়াল। সেই ভগ্ন অংশটুকুর মাঝেই আছে অতুলনীয় সৌন্দর্যের প্রকাশ। যেন কোলেরিজের 'কুবলাই খাঁ' কবিতা। সমাপ্ত না হয়েও অসীম ইঙ্গিতময়! শিল্পের এই অনবদ্য অভিব্যক্তির মুখোমুখি এসে পড়তেই আমার ব্যক্তি-কল্পনা যেন মুহূর্তে কোথায় উবে গেল। এক সুবিশাল সৌন্দর্যের জগতে, লাবণ্যের জগতে নিজেকে হারিয়ে ফেললাম। পাথরের বুকে জীবনের এমন অপরূপ নৃত্য আগে কখনও সম্ভব বলে ভাবতে পারিনি। বিস্ময়াভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকলাম শুধু। যেন সর্বত্রই এক ছন্দময় ঝঙ্কার, অন্তত এক অদ্ভুত রাগিণী। স্থির অথচ জীবন স্পন্দনে স্পন্দিত এক অব্যক্ত হারানো জগৎ। কী বিশাল পরিকল্পনা! কী নিখুঁত পরিসমাপ্তি! বিশপ হেবারের সেই বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে গেল : The Indians built like Titans and finished like jewellers.

থরে থরে স্তম্ভ দিয়ে দেওয়াল তৈরি। প্রত্যেকটি স্তম্ভ নিখুঁত শিল্পকলায় আচ্ছাদিত। অসংখ্য আনন্দের ভঙ্গিতে নর্তকীরা দাঁড়িয়ে আছে বিভিন্ন ভাবে। অপ্সরা ও গন্ধর্বের ছড়াছড়ি। তাদের মধ্যে কেউ নৃত্যরতা, কেউ বাদ্যরতা। কেউ বাজাচ্ছে করতাল, কেউ পাখোয়াজ, কেউ বাঁশি, কেউ ঢোলক। মানুষের এমন ছন্দময় অপরূপ অভিব্যক্তি অন্য কোথাও আর ভাস্কর্যশিল্পে আছে কিনা জানা নেই। হিউম্যান এনাটমি স্টাডি করার পর গ্রিস ও রোমের ভাস্করেরা তাঁদের শিল্প-প্রতিভার অনবদ্য প্রকাশ ঘটিয়েছিলেন। সৌন্দর্যের প্রতিমূর্তি রমণী নারীর দুটি প্রতিকৃতি— 'ভিনাস ও ডিমিলো' অর্থাৎ দেবী-আফ্রোদিত্ (হাত কাটা যে ভিনাসের মূর্তি এখন কৃষ্ণনগরের কারিগরদের অনুকরণে ভারতবর্ষেরও প্রায় সর্বত্র সহজলভ্য) এবং ক্যাপিটোলাইন ভিনাস (গ্রিক শিল্পীদের অনুকরণে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে রোমক শিল্পীদের সৃষ্ট দেবী ভিনাস) গ্রিক ও রোমান ভাস্কর্য শিল্পের সার্থক অভিব্যক্তি, মসৃণ পাথরের মূর্তিতে দুটি মনুষ্যদেহের নিখুঁত অনুকরণ। কোথাও যেন এতটুকু কলঙ্ক নেই। কিন্তু তবু ভারতীয় শিল্পীদের ভাবমূর্তি ও ব্যঞ্জনার কাছে সেসবও যেন অত্যন্ত নিষ্প্রভ।

ইউরোপীয় ভাস্কর্যের তুলনায় ভারতীয় ভাস্কর্যে মসৃণতা নেই বললেই চলে। তবু জীবনের কী অদ্ভুত স্পন্দন! মানবদেহের সৌন্দর্য-কল্পনায়; বিশেষ করে নারীদেহের ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাস্কর্য নিশ্চয়ই ইউরোপীয় ভাস্কর্যের মত এনাটমি অনুসরণ করে চলেনি। যদিও কোনারকের ভাস্কর্যশিল্প প্রাচীন ভারতের ভাস্কর্যশিল্পের একটা অনবদ্য উত্তরাধিকার, তথাপি ফর্মের কল্পনায় তখনও এর মধ্যে ছিল সেই পুরানো রীতিরই নির্দেশ। যেমন ক্ষীণ কটি, স্থূল ঊর্ধ্ব দেহ, পূর্ণ বৃহৎ স্তন, গোলাকৃতি জঙ্ঘা (শাস্ত্রকারেরা যার উপযুক্ত সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছেন হস্তীশুণ্ডের মধ্যে) এইসব। অথচ

হিউম্যান এনাটমি ও দৈহিক সত্যকে অতিক্রম করে তার কী সুদূরপ্রসারী গতি!

মূকের মধ্যে মুখরতা, স্থিতির মধ্যে গতি, প্রতীকের মধ্যে ভাবব্যঞ্জনা, ভারতীয় শিল্পীদের এ এক অননুকরণীয় সৃষ্টি। কে, কে এই মহান শিল্পের স্রষ্টা? প্রচলিত একটা কাহিনি আছে বটে যে, জনৈক বিষ্ণু মহারানা তৈরি করেছিলেন এই মহান শিল্পকর্ম, এবং একে চূড়ান্ত সিদ্ধি দিয়েছিলেন—তার পুত্র ধর্মপাল, কিন্তু সেটা বোধহয় সত্য নয়। ভারতীয় শিল্পের ধারা নৈর্ব্যক্তিক। কোনো ব্যক্তি নয়, বংশপরম্পরায় যুগের পর যুগ ধরে এ শিল্পের সাধনা এ দেশে চলে এসেছে। Heinrich Zimmer-এর মন্তব্য মনে পড়ে There is never in the Indian workshop any sense of individual quest, vocation or enterprise. The doors are closed, and the craft is completely monopolised and governed by an almost miraculously skillful · stable guild.

যদিও মানব ধর্মশাস্ত্রে মনু ভারতীয় শিল্পীদের বংশকৌলীন্য দিতে চাননি, তথাপি সুপ্রাচীন ভারতীয় শিল্পশাস্ত্রে শিল্পীর জন্য যে বিশেষ স্থান নির্দেশ আছে, এদেশের শিল্পীরা তারই সুযোগ্য উত্তরাধিকারী। শাস্ত্রের সেই যে কথা, শিল্পীকে জানতে হবে—অথর্ববেদ, বত্রিশটি শিল্পশাস্ত্র, এবং বৈদিক মন্ত্র; তাকে হতে হবে দ্বিজ, বিশ্বস্ত স্বামী, বারাঙ্গনা বর্জিত, বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় তাকে হতে হবে পারদর্শী; মূর্তি কল্পনায় শিল্পীকে তাকাতে হবে ভক্তের দৃষ্টি নিয়ে তার ধ্যানের মূর্তির দিকে, এই প্রাচীন বর্ণনাই সত্য। না হলে এমন মূর্তি নির্মাণ সম্ভব নয়। এমন নগ্নপ্রায় মূর্তি, এমন ইন্দ্রিয়স্পর্শী ভঙ্গি অথচ এমন অতীন্দ্রিয়, সাধক-শিল্পী না হলে এধরনের রূপদান কোনোক্রমেই সম্ভব হত না।

কী অপূর্ব প্রতিভা! এই যে এত অসংখ্য চিত্র, এত নটনটীর মেলা, কিন্তু কোথাও একটার সঙ্গে আর একটার সামঞ্জস্য নেই। একই ছন্দ, একই মূর্তি, একই নৃত্যের ভঙ্গি দুবার করে আঁকা হয়নি। অতিমানবিক ক্ষমতা না হলে এ সম্ভব ছিল না। মনে মনে শ্রদ্ধা না জানিয়ে পারলাম না। শ্রদ্ধাবনত মনে শুধু এইটুকু বললাম, হে অজ্ঞাত শিল্পীগোষ্ঠী আমার প্রণাম গ্রহণ করো।

নাটমন্দির হল মূল মন্দিরের পূর্বে অবস্থিত। রথভিত্তিক মূল মন্দিরের জগমোহন অংশটুকু প্রায় সর্বাংশেই টিকে আছে। কিন্তু মূল বেদীর উপর নির্মিত যে বিমান, যেটা এধরনের মন্দিরের সর্বোৎকৃষ্ট অংশ, সেটাই নেই।

নাটমন্দির থেকে জগমোহনের মধ্যে ত্রিশ ফুটের একটা ব্যবধান আছে। নাটমন্দির দেখা শেষ করে সেই দিকে এগিয়ে গেলাম। নাটমন্দিরে উঠেছিলাম পূর্বদিকের সিঁড়ি বেয়ে। এবার পশ্চিম দিকের সিঁড়ি বেয়ে জগমোহনের দিকে এগিয়ে গেলাম। সামগ্রিকভাবে কোনারকের যে মন্দির-পরিকল্পনা হয়েছিল তার মধ্যে অধিকাংশই কালের আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে প্রায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। শুধুমাত্র প্রাক্তন

আকৃতির রূপরেখা নিয়ে জগমোহন দাঁড়িয়ে আছে।

জগমোহনের সারা দেহে অপূর্ব ভাস্কর্য। নানা ধরনের মিথুন চিত্র। নানা ধরনের রক্তমাংসের দেহ উপভোগের দৃশ্য। একদিন বোধহয় নগ্নতাই ছিল শিল্পের প্রাণ। প্রাচীন রোম আর গ্রিসেও নগ্ন শিল্পের অভাব নেই। ভারতেও আনন্দময় জীবন উপভোগে পাপবোধের কোনো প্রশ্ন ছিল না। এ বড় কঠিন সাধনা, শক্ত সাধনা। আজ ইউরোপে নুড কলোনি খুলে আবার সেই আদি অকৃত্রিমতার জগতে ফিরে যাবার চেষ্টা চলেছে। মানুষ যেমন একসময় সংযমে নিজেকে বাঁধতে পারত, তেমনি অত্যন্ত সহজ ভাবে রক্তমাংসের প্রাকৃতিক প্রয়োজনকেও স্বীকৃতি দিতে পারত। সে যুগে পাপবোধ ছিল না। এখনই মনে পাপ ঢুকেছে।

বিচিত্র মিথুন চিত্র। অসংখ্য। তা ছাড়া আছে আরও নানা ধরনের মূর্তি যেমন যক্ষিনী, সর্পিনী, রণ-অশ্ব, হস্তী, রথচক্র, রথচক্রের অভ্যন্তরস্থ নকশা, আরও কত কি! এ ছাড়া আছে বিচিত্র কিছু সংখ্যক জীবের মূর্তি। প্রাণীজগতে তাদের অনুরূপ কিছু আজও নেই, কোনোদিনও ছিল বলে মনে হয় না। সম্ভবত এ জীবগুলি মিথোলজিক্যাল। কিংবা যোগীদের ধ্যানদৃষ্ট মূর্তি যা তাঁরা ভিন্নগ্রহে কূটস্থান পরিক্রমা কালে দেখেছিলেন। সবচেয়ে বিস্ময়কর সপ্তাশ্ব বাহিত ও অরুণ চালিত সূর্যরথের দেবতা এবং নবগ্রহের প্রতিকৃতি। প্রত্যেকটাই অর্থবহ, কোনোটাই অর্থহীন নয়। বিচ্ছিন্নভাবে তিন ধরনের পশুমূর্তি বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মত। মূর্তিগুলি বিশাল এবং দৃষ্টি আকর্ষণকারী, যেমন রণসাজে সজ্জিত অশ্ব, বিশালাকায় প্রস্তরহস্তী, হস্তীর উপর অধিষ্ঠিত সিংহ, মন্দির চত্বরের অভিভাবক সিংহ প্রভৃতি। অবাক বিস্ময়ে এইসব খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিলাম। হঠাৎ পাশে কার কণ্ঠস্বর শুনে কেমন চমকে গেলাম কেমন দেখছেন?

কে বলল! কাকে বলল! আমি অবাক হয়ে পাশে তাকাতেই দেখি একজন ভদ্রলোক! চোখ দুটো যেন মসৃণ ইস্পাতের মত ঝলমল করছে। দেহের রঙ উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ কি হেমবর্ণ বলতে পারব না। কিন্তু একটা আলোর দীপ্তিতে ঝলমল করছেন। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। ফিট বাবু।

হাসলেন তিনি। আবার বললেন, কেমন দেখছেন?

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে বলছেন?

—হ্যাঁ।

—আপনাকে আমি ঠিক—

—চেনেন না, এই তো?

—আজ্ঞে ঠিক—

—ঠাহর করতে পারছেন না, এই তো?

—হ্যাঁ।

—সে-সব পরে হবে। এখন বলুন, কেমন দেখছেন?

—ভাল।

—এই মিথুন চিত্রগুলোর অর্থ বুঝলেন?

—ঠিক যে বুঝেছি, তা নয়। তবে এইটুকু জেনেছি যে, অশ্লীল চিন্তা থেকে এগুলোর সৃষ্টি নয়। একসময় মিথুনমূর্তি সৌভাগ্যের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হত।

ভদ্রলোক বললেন, আপনি তো অধ্যাপনা করেন?

অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকালাম, আপনি...

ভদ্রলোক বললেন, সে-সব কথা পরে হবে। শুনুন বলছি। আর একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে এখানে আমার দেখা হয়েছিল। ভদ্রলোক একেবারেই পার্থিব। তিনিও আপনারই মতো ইতিহাসের লোক।

খুবই অবাক হলাম। মনে হল ভদ্রলোক আমার নাড়ি নক্ষত্র সবই জানেন। অথচ...।

ভদ্রলোক বললেন, সেই ইতিহাসের অধ্যাপকটির ধারণা—এসব পারভারটেড রুচির প্রতিফলন। মধ্যযুগে ভারতে একসময় সুস্থতার মধ্যে প্রচণ্ড অবক্ষয় দেখা দিয়েছিল। তখনকার শিল্প-সাহিত্য সর্বক্ষেত্রেই সেই যুগের প্রতিফলন ঘটেছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে মিথুন তত্ত্বের উপর কাজ করছেন। বিভিন্ন ইতিহাস পড়ে তাঁর ধারণা হয়েছে যে, রাজাদের ব্যক্তিগত রুচির ওঠা-নামার উপর সেকালে মিথুন মূর্তির চরিত্র কম বেশি নির্ভর করত। ধর্মের বিকৃত-চর্চার মাধ্যমে মন্দিরের দেহে তা স্থান পেয়েছে। আপনি কি বলেন?

বললাম, ইতিহাসে পড়েছি যে, একসময় যখন ব্রাহ্মণ্য ধর্মে আনুষ্ঠানিকতা প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছিল, বর্ণের অনাচার ঘটেছিল, সামাজিক সমস্যা দেখা দিয়েছিল, তখন একদল মানুষ তথাকথিত ধর্মানুষ্ঠান বর্জন করে তন্ত্রের নামে এমন এক জিনিস অনুসরণ করেছিল যা সামাজিক কোনো রীতি-নীতিকেই প্রশ্রয় দেয়নি। প্রচলিত ব্যবস্থার কাছে জিনিসটা ভয়ানক দৃষ্টিকটু ঠেকেছিল। যাকে বলে social revenge তাই থেকেই এধরনের ধর্মের উদ্ভব হয়েছিল, তন্ত্রের পঞ্চ-'ম' কারের উদ্ভব, মিথুন তত্ত্বের উদ্ভব।

ভদ্রলোক হাসলেন, বললেন, আদপেই তা নয়। এ খুব segnificant cult খুব সুস্থ বিজ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞানের চাইতেও বড় ভিতের উপর এ cult দাঁড়িয়ে। একে পরাবিজ্ঞান বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মণধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ থেকে এটা কোনো পারভারটেড ধর্মের উদ্ভব নয়, বরং ব্রাহ্মণরাই একে বিকৃত করেছে। আপনি শিবলিঙ্গ পুজো করেন?

বললাম, পুজো আচ্চায় তেমন কোনো—

—আপনি না করলেন, এ দেশের হাজারো লোক করে তো?

—তা করে।

—শিবলিঙ্গ যথার্থ জিনিসটা কি?

ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে রইলাম।

ভদ্রলোক বললেন, একটি পুরুষের জননেন্দ্রিয়, আর একটি নারীর, এই তো?

—হ্যাঁ।

—জিনিসটা ধরতে গেলে খুবই নগ্ন, অশ্লীল, তাই না?

—হ্যাঁ।

—তবু লোকে পুজো করে কেন?

—একটা কনভেনশনাল ধর্মের ভাব এর মধ্যে জড়িয়ে গেছে বলে।

—ঠিক বলেছেন। কিন্তু ওড়িশার শিল্প একটা কনভেনশনাল ধর্মের ভাব দর্শকের মধ্যে জাগাতে পারেনি বলেই তারা এর মধ্যে অশ্লীলতা দেখতে পায়। আসলে যে ধারাবাহিকতার মধ্যে এই মিথুন-শিল্প চলে আসছিল—হঠাৎ মাঝখানে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগের মধ্যে তার একটা generation gap পড়ে যায়। ফলে সেই কনভেনশনাল ভাবধারাটা হারিয়ে যায়। নইলে একসময় কিন্তু এই শিল্পকে লোকে ধর্মের দৃষ্টিতেই দেখত।

বললাম, তা হতে পারে! তাহলে এই শিল্পের যথার্থ significance কী?

ভদ্রলোক বললেন, দেখুন, তন্ত্র আছে তিন ধরনের। দৈবাচার, বীরাচার আর পশ্বাচার তন্ত্র। সত্ত্ব গুণের অধিকারীরাই যথার্থ তন্ত্রের অধিকারী। তাঁরা দৈবাচারী। পঞ্চ 'ম'-কার মূলত তাদেরই জন্য। বীরাচারীরা রজঃ গুণের অধিকারী। তারাও পঞ্চ 'ম'-কারের উপাসক হতে পারেন। কারণ স্থূল থেকে তাদের সূক্ষ্মে উঠবার অধিকার আছে। তবে তম গুণের অধিকারীরা পঞ্চ 'ম'-কার তন্ত্রের অধিকারী নয়, তাহা হল পশ্বাচারী।

এই পাঁচটি তত্ত্বাকার 'ম'-এর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল মৈথুন। এই পাঁচটি 'ম'-কার হল—মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈথুন। সাধারণের চোখে মদ হল সুরা, মাংস পশুমাংস, মৎস্য মাছ, মুদ্রা হল শস্যকণা এবং মৈথুন হল নরনারীর যৌন-সম্পর্ক।

বললাম, এ ছাড়া অন্য কোনো অর্থ আছে কি?

লোকটি বলল, ভিন্ন অর্থটাই আসল। এ অর্থটা মোটেই অর্থ নয়। চিন্তা করুন না; ভারতবর্ষের সমাজ রক্ষণশীল। মধ্যযুগে তো এ রক্ষণশীলতা আরও বেড়েছিল। সে সময় ধর্মের সঙ্গে এ ধরনের অশ্লীলতা অসম্ভব। আসলে এর ভিন্ন ধরনের অর্থ ছিল বলেই মন্দিরগাত্রে মিথুন চিত্রের স্থান হয়েছিল।

—সে ভিন্ন অর্থটা কি?

ভদ্রলোক সুন্দর ভাবে পঞ্চ 'ম'-কারের ব্যাখ্যা করে শোনালেন আমাকে। প্রথম মদ্য সম্পর্কে একটি সংস্কৃত শ্লোক আবৃত্তি করলেন। এই শ্লোকের মধ্যেই মদ্যের

যথার্থ অর্থ রয়েছে। শ্লোকটি এই ঃ

সোমধারা ক্ষরেদ্ যাতু ব্রহ্মরন্ধ্রাদ্ বরাননে।
পিত্বানন্দময় স্তাং যঃ স-এব মধ্য সাধকঃ।।

অর্থাৎ মদ হল ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে যে সুধা ঝরে সেই সুধা।

—'ব্রহ্মরন্ধ্রের সুধা মানে?' অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম। হেসে ভদ্রলোক বললেন, কুলকুণ্ডলিনীর নাম শুনেছেন?

—হ্যাঁ। দেহে যে ষট্ চক্র আছে, তার মূলাধারে শিবলিঙ্গকে ঘিরে তার মুখ বন্ধ করে পড়ে থাকে।

—হ্যাঁ। সেই কুণ্ডলিনী শক্তি সাধকের সাধনার বলে ক্রমশ উর্ধ্বে উঠে আজ্ঞাচক্র ভেদ করে যখন ব্রহ্মরন্ধ্রে গিয়ে পৌঁছায় তখন ব্রহ্মরন্ধ্র থেকে যে সুধা ঝরে তাকেই মদ্য বলা হয়েছে।

বললাম, এসব কি বিশ্বাস্য?

ভদ্রলোক হাসলেন। তাঁর শাণিত চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, বিশ্বাস্য কিনা, একদিন আপনিই তা জগৎকে বলবেন।

—আমি!

—হ্যাঁ।

—কিন্তু....

—'সে-সব পরে হবে। আগে যা বলছি, তা শুনুন।' ভদ্রলোক দ্বিতীয় শ্লোক বললেন ঃ

মাশব্দাসনা জ্ঞেয়া তদংশান্ রসনা প্রিয়ান্।
সদা যো ভক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংস সাধক।।

অর্থাৎ—মাংস মানে জিহ্বা, রসনা। বাক্য হল রসনার অংশ। রসনার অত্যন্ত প্রিয়। যে ব্যক্তি বাক্য ভক্ষণ করে অর্থাৎ বাক্ সংযম করে মৌন হয়ে যায়, সেই হল মাংস সাধক।[১]

—তারপর?

ভদ্রলোক তৃতীয় শ্লোক বললেন

গঙ্গাযমুনয়োর্মধ্যে মৎস্যৌ দ্বৌ চরতঃ সদা।
তৌ মৎস্যৌ ভক্ষয়েদ যস্তু স ভবেন্মৎস্য সাধক।।

---

১. মাংস ভক্ষণের যথার্থ অর্থ মাংস ভক্ষণ নয়। যে জ্ঞানী ব্যক্তি জ্ঞানখড়্গ দ্বারা কাম, ক্রোধ, লোভ ও মোহরূপ পশু চতুষ্টয়কে ছেদন করে ব্রহ্মানন্দপ্রদ নির্বিষয়রূপ মাংস ভক্ষণ করেন তিনিই মাংসভক্ষক। এঁরা হিংসাপর পশুমাংস ভক্ষণ করেন **রহস্য পূজাপদ্ধতি**, Edt. মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য, p. 12.

অর্থাৎ=গঙ্গা যমুনার মধ্যে দুটি মৎস্য চরে বেড়ায়। এই গঙ্গা যমুনা হল—ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ি। রজঃ ও তম এই দুই মাছ তার মধ্য দিয়ে চলে। সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে তিনটি গুণের খেলা চলেছে। সত্ত্ব, রজঃ ও তম। রজঃ ও তম মায়ার প্রভাবে প্রভাবিত। সত্ত্ব-গুণ-মায়া প্রভাবিত নয়। যতক্ষণ রজঃ ও তম গুণের প্রভাব অতিক্রম করা না যাচ্ছে, ততক্ষণ মুক্তি নেই। যে সাধক এই দুটি মৎস্য ধরে ভক্ষণ করতে পারেন অর্থাৎ নাশ করতে পারেন তিনিই মৎস্যাসী।[১]

মুগ্ধ হয়ে নিজের অজ্ঞাতেই বলে উঠলাম, চমৎকার!

ভদ্রলোক চতুর্থ শ্লোক বললেন

সহস্রারে মহাপদ্মে কর্ণিকা মুদ্রিতা চরেৎ।
আত্মা তত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমম।
সূর্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্রকোটি সুশীতলম।
অতীব কমনীয়ঞ্চ, মহাকুণ্ডলিমী যুতম।
যস্য জ্ঞানোদয় তত্র মুদ্রা সাধক উচ্যতে।।

ভদ্রলোক নিজের ব্রহ্মতালুতে হাত রেখে বললেন, এইখানে সহস্রার মহাপদ্ম আছে। তার কর্ণিকার মধ্যে পারদের মত ঢল ঢল সুনির্মল শ্বেতবর্ণ কিছু আছে। তার এমন জ্যোতি যে, চন্দ্র সূর্যের জ্যোতি থেকেও সে জ্যোতিষ্মান। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে আছে কুণ্ডলিনী আকারে মহাশক্তি। ইনিই পরমাত্মা, পরমব্রহ্মাণ, তুরীয়, তুরীয়াতীত, সব। যিনি যোগবলে দেহের মধ্যে ঘনীভূত বস্তুশক্তিকে এই পরমানন্দময় পরম সত্যের সঙ্গে যুক্ত করাতে পারেন তিনিই মুদ্রাসাধক।[২]

ভদ্রলোক এবার পঞ্চম শ্লোক বললেন

মৈথুনং পরমং তত্ত্বং সৃষ্টিস্থিত্যন্তকরণম।
মৈথুনাজ্জায়তে সিদ্ধির্ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম।।
রেফস্তু কুঙ্কুমাভাসঃ কুণ্ডমধ্যে ব্যবস্থিতঃ।
মকরাশ্চ বিন্দুরূপো মহাযোগৌস্থিতঃ প্রিয়ে।।
আকারহংসমারুহ্য একতা চ যদা ভবেৎ!
তদা জাতং মহানন্দং ব্রহ্মজ্ঞানং সুদুর্লভম।।

অর্থাৎ, পরম তত্ত্ব মৈথুন হল, সৃষ্টি-স্থিতি প্রলয়ের কারণ। এই মৈথুন তত্ত্বে জ্ঞান

---

১. অহংকার, দম্ভ, মদ, পৈশুন্য, মাৎসর্য ও হিংসারূপ ছয়টি মৎস্যকে বৈরাগ্য জালে ধারণ করে সত্ত্বগুণ বিশিষ্ট ব্যক্তি জ্ঞানাগ্নিতে পাক করে তাই উপভোগ করেন। জলচর মৎস্য ভক্ষণ করেন না। **রহস্য পূজাপদ্ধতি**, Edt. মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য, p. 12.

২. আশা, তৃষ্ণা, জুগুপ্সা, ভয়, ঘৃণা, মান, লজ্জা ও ক্রোধরূপ অষ্টামুদ্রাকে যিনি জয় করেন সেই পশুপাশবিচ্ছিন্ন মহাত্মাই মুদ্রা ভক্ষক। **রহস্য পূজাপদ্ধতি** Edt. মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য, p. 13.

হলেই সিদ্ধি হয়, সুদুর্লভ ব্রহ্মজ্ঞান হয়। নাদ এবং বিন্দু যুক্ত হয়ে যে পরম পুরুষ রয়েছেন, তিনি রমণ করে মৈথুনের অবসান করেন। এই রমণের মূল উপাদান হল পরমাত্মা আর কুণ্ডলিনী শক্তি। যে সাধক এই মৈথুন করতে পারেন অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগ্রত করে সহস্রারে নিয়ে গিয়ে পরম শিবের সঙ্গে মৈথুন করাতে পারেন, তিনিই হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ সাধক। এইবার মৈথুন অর্থ বুঝলেন?[১]

—আজ্ঞে।

—তাহলে বুঝেছেন, মন্দির গাত্রে কেন এই মৈথুন চিত্র?

—বুঝেছি। তবে—

—তবে?

—Physical মৈথুন কেন?

—এগুলো ঠিক Physical মৈথুন নয়। মূর্তিগুলোর স্তর দেখুন। নিম্নস্তরে পশুশক্তি। সেখানে যে মৈথুন তা Physical। উপরে মানবিক। সেখানে আর এক স্তর উচ্চ মৈথুন ক্রিয়া[২]। এই মৈথুন ক্রিয়া আরো ঊর্ধ্বে স্থূল বাসনা-কামনা অতিক্রম করেছে। এগুলো বুঝবেন মুদ্রা ও চোখের দৃষ্টিতে। কুণ্ডলিনী যে ষট্‌চক্র ভেদ করে স্থূল থেকে ঊর্ধ্বে মৈথুন অভিলাষে গমন করছেন এ তারই চিত্র। এর অর্থ বুঝলে এ শিল্প তখন অশ্লীল থাকে না। পরমপুরুষ ও মহাশক্তির মৈথুন ক্রিয়া বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সর্বত্রই প্রসারিত। তারই ফলে জগৎ। মন্দির হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের প্রতীক। এর ঊর্ধ্বশির উঠে গেছে অনন্তে, ছুঁচোলো হয়ে। নিম্নে স্থূল। এইজন্য মন্দির গাত্রের সর্বত্রই মৈথুন চিত্র, বুঝলেন?[৩]

মুগ্ধ হয়ে শুনছিলাম। বললাম, হ্যাঁ। এবার মৈথুন চিত্রের তাৎপর্য বুঝলাম।

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, আপনি খাজুরাহ গিয়েছেন?

বললাম, না।

—সেখানে আরও বিচিত্র রকমের মৈথুন চিত্র আছে?

—কী রকম?

—খাজুরাহের খাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দির বিপরীত মৈথুনের ভাস্কর্য আছে।

—কী রকম?

---

১. ইড়া ও পিঙ্গলা উভয় নাড়িতে বাহিত বায়ুকে সুষুম্নাতে সংযোগ করানো ও আলিঙ্গনরূপ মৈথুন স্বরূপ। **রহস্য পূজাপদ্ধতি**, Edt. মিহিরকিরণ ভট্টাচার্য, p. 13

২. পুরুষ ও প্রকৃতির সাম্যাবস্থায় স্থিতি। চৈনিক তাও প্রতীকে এবং ভাবে এই মিলনের চমৎকার ব্যাখ্যা আছে।

৩. মহাবিশ্বে interpenetration of atoms-ও এক ধরনের মৈথুনক্রিয়া যার সাহায্যে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড লীলাময় ছন্দে ছন্দায়িত হচ্ছে, চৈনিক Hexagram-এ যাকে রেখাচিত্র দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

—মহাদেব নিচে রয়েছেন। পার্বতীকে সখীরা ধরে মহাদেবের লিঙ্গের উপর বসিয়ে দিয়েছেন।

—এর অর্থ?

ভদ্রলোক বললেন, তন্ত্রের মৈথুনের এটাই হ্ল গূঢ় তত্ত্ব। কারণ বিশ্বজগৎ বিপরীত মৈথুন থেকে সৃষ্টি। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মণ। তিনি যখন নির্গুণ তখন শুধুমাত্র সৎ। তাঁর মধ্যে রয়েছে আত্মচৈতন্য অর্থাৎ চিৎ এবং ইচ্ছাপ্রসূত আনন্দ। আনন্দ-শক্তি সুপ্ত থাকে। অজ্ঞাত কারণে সেই নির্গুণ পরম অস্তিত্বে আত্মবোধ জাগে। তখন আত্মবোধ থেকে উপভোগের ইচ্ছা হয়। সেই ইচ্ছার আনন্দ থেকে জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। ইচ্ছা মানেই ক্রিয়া, অর্থাৎ vibration সেই vibration কোয়ান্টাম পদ্ধতিতে একান্নটি মূল স্তরে আণবিক জগৎ অর্থাৎ বস্তুর মৌল উপাদান সৃষ্টি করেছে! সেই অণু-পরমাণুর পরস্পর মিলনে জীব ও জড় জগতের সৃষ্টি। ঁকালী হলেন সেই তরঙ্গায়িত ইচ্ছা বা শক্তির প্রতীক। সেইজন্য ঁকালীর গলায় তরঙ্গ বা বর্ণ, যাকে অক্ষর দ্বারা সংস্কৃত ভাষাতে প্রতীকত্ব দান করা হয়েছে। সেই একান্নটি অক্ষরের প্রতীক হিসেবে ঁকালীর গলায় পঞ্চাশটি মুণ্ড এবং হাতে একটি মুণ্ড রয়েছে। যে নির্বিকার পরমপুরুষ থেকে তাঁর উৎপত্তি সেই নির্গুণ ব্রহ্মণ নির্বিকার ভাবে তাঁর কেন্দ্র হিসেবে কাজ করছেন। সেইজন্য তাঁর বুকের উপর ঁমা কালী দাঁড়িয়ে। বস্তুত আণবিক বিস্ফোরণেও এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, কেন্দ্রস্থ মূল, বিস্ফোরণ ঘটলে নিষ্ক্রিয় থাকে। এই যে ইচ্ছারূপ শক্তি, পুরুষের যা গুণ, তা তাঁর উপরে থাকে, অর্থাৎ তাকে আবরিত করে থাকে। নিচে বা অন্তরালে মূল থাকে, উপরে ক্রিয়াশক্তি। এই ক্রিয়াশক্তিই প্রকৃতি বা মহামায়া অর্থাৎ পুরুষের উপরের গুণ। সেই গুণও পুরুষের সঙ্গমের ফলেই সৃষ্টি। উপরে গুণ বা প্রকৃতি ও নিচে বা অন্তরালে পুরুষ থাকেন বলে এই সঙ্গমকে বিপরীত সঙ্গম বা রতিক্রিয়া বলা হয়। তারই একটা প্রতীক মূর্তি খাজুরাহের খাণ্ডারীয় মহাদেবের মন্দির গাত্রে আছে। এ হোল অত্যন্ত গূঢ় তন্ত্রতত্ত্ব।[১]

অবাক হয়ে বললাম, এরকম ব্যাখ্যা আগে তো কখনও শুনিনি!

ভদ্রলোক বললেন, শোনেননি কারণ, এ বিদ্যা পুঁথিপুস্তকের বিদ্যা নয়। এ হোল Practical art. অভিজ্ঞতাপ্রসূত জ্ঞান। গুহ্য ব্যাপার সবাই বোঝে না, সবাইকে বলাও যায় না।

—আপনি কি....

---

১. কালীর যথার্থ রূপ ব্যাখ্যার জন্য এবং বিপরীত রতিক্রিয়া ব্যাখ্যার জন্য লেখকের 'সাধু সন্তের দেশে' গ্রন্থের ১২ পৃষ্ঠা দেখুন। এই মৈথুনের ধারণা খ্রিস্টানদের মধ্যে আছে। Genesis-এ এই ধরনের বর্ণনা পাওয়া যায়—'Chaos created and then mated with a goddess called night, and their offspring eventually produced all the gods and men. vide. Cosmos, Carl Sagn, p. 140

ভদ্রলোক বললেন, আমার কথা পরে হবে। এবার রজঃ গুণের অধিকারী বীরাচারী সাধকেরা কি ধরনের পঞ্চ 'ম'কারের সাধনা করেন, শুনুন। আমাদের দেশে একটি কথা আছে যে, যে-মাটিতে মানুষ আছাড় খেয়ে পড়ে, সেই মাটিতেই ভর দিয়ে উঠতে হয়। অর্থাৎ স্থূল জগৎ থেকেই সূক্ষ্ম জগতে ওঠা যায়। রজঃ গুণের অধিকারী ব্যক্তিদের এক পা থাকে স্থূলে, আর এক পা সূক্ষ্মে। স্থূল হল তম গুণ, আর সূক্ষ্ম হল সত্ত্ব গুণ। এই দুয়ের মধ্যে রজঃ গুণ ঘড়ির পেণ্ডুলামের মতো দোলে। যখন তমের দিকে যায় তখন ঘোরতর তামসিক। যখন সত্ত্বের দিকে যায় তখন রীতিমতো সাত্ত্বিক। রজঃ গুণের অধিকারীরা স্থূল জগৎ থেকে সূক্ষ্মের দিকে এগিয়ে যান। সেইজন্য পঞ্চ 'ম'-কারের অর্থ তাদের কাছে ভিন্ন রকম। মদ তাদের কাছে যথার্থই মদ। মদ খান তাঁরা দেহে শক্তি আনার জন্য। কারণ সুস্থ ও শক্তিশালী দেহ না হলে তাতে মহাশক্তি নির্ভর করতে পারেন না। মাংসও দেহ ও শক্তি বৃদ্ধির জন্য, মৎস্যও তাই। মুদ্রাও আহার্য। এই শক্তিশালী দেহ নিয়ে প্রথম বীরাচারী সাধক মৈথুন করেন। শক্তিশালী ব্যক্তিই সংযমের সঙ্গে মৈথুন করতে পারেন। তারপর দেহজ মৈথুনের তাৎপর্য বুঝে তাকে পরিত্যাগ করেন। পার্থিব আকাঙ্ক্ষা জয় করে আত্মস্থ মৈথুন অর্থাৎ কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করে সহস্রারে নিয়ে গিয়ে পরম শিবের সঙ্গে মৈথুন করান।

জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, দৈবাচারী সাধকদের দৈহিক শক্তির জন্য চেষ্টা করতে হয় না?

ভদ্রলোক বললেন, ওঁরা জন্মাতই এমন দেহ নিয়ে জন্মান যে, যাতে মহাশক্তি ভর করতে পারেন! অনেক সূক্ষ্ম পাতলা কাচের পাত্রে প্রচণ্ড গরম দুধও ঢালা যায়। আবার মোটা কাচের গ্লাসে হঠাৎ সে দুধ ঢালতে গেলে তা ফেটে যায়। সইয়ে ঢলতে হয়। দৈবাচারীর দেহ হল পাতলা কাচের গ্লাস আর বীরাচারীর মোটা কাচের গ্লাস! আর পশ্বাচারী অর্থাৎ তম গুণের লোক কোনো গরম জিনিসই ধরতে পারে না। এইজন্য তাদের ক্ষেত্রে ভিন্ন প্রকার সাধনার ধারা। তারা যদি দৈহিক ভাবে পঞ্চ 'ম'-কারের সাধনা করতে যায় তাহলে আরও ডুববে। আরও বেশি তামসিক হবে। তাদের দেহ আগুনের মত। ঘি ঢাললে আগুন আরও বাড়বে। তাদের জন্য ঘিয়ের ব্যবস্থা নেই, জলের ব্যবস্থা আছে, যাতে কামনার আগুন আগে মরে। কামনার আগুন মরে তম গুণের শেষে রজঃ গুণের উদ্ভব হলে তবেই তারা পঞ্চ 'ম'-কারের সাধনা করতে পারবে।

ভয়ানক কৌতূহল হল। ভদ্রলোককে বললাম, তন্ত্র, সম্পর্কে আপনার প্রভূত জ্ঞান। আপনি কি—

ভদ্রলোক বাধা দিয়ে বললেন, সে কথা পরে হবে। আগে যা দেখতে এসেছেন, তাই দেখুন।

তিনি আমাকে রথাকৃতি মন্দিরের ভিতের কাছে নিয়ে গেলেন। রথের একটি

চাকা দেখিয়ে বললেন, এই রথের চাকাটা দেখছেন? কী নিখুঁত অনবদ্য শিল্পকর্ম! কিন্তু এটাই শেষ নয়। এ সবের অন্তরালে অর্থাৎ শিল্পোৎকর্ষের বাইরেও এর একটা অর্থ আছে। যেমন ধরুন, এই রথের স্পোকগুলো। গুনে দেখুন, সংখ্যায় আটটি। আটটি স্পোকের কেন্দ্রে একটি বা দু'টি করে মূর্তি। এই আটটি স্পোক হল দিনরাতের আটটি প্রহর। আর স্পোকের মধ্যে যে মূর্তিগুলি—এগুলো প্রকৃতপক্ষে জ্যোতির্বিদ্যাবিষয়ক কোনো ইঙ্গিত যার অর্থ আজকে আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

দেখুন, জগমোহন ও বিমান একটি রথের উপর অবস্থিত। এই রথ টানছে সাতটি সুসজ্জিত অশ্ব। সংখ্যায় সাতটি হওয়ার অর্থ, এই অশ্ব প্রকৃতপক্ষে সূর্যের রঙের সাতটি ধারা। এরা সপ্তাহের এক একটি দিনেরও প্রতীক। এ ছাড়া আরো একটি অর্থ আছে। সূর্যদেবতার পায়ের নিচে লক্ষ্য করে দেখুন, দেখবেন অশ্বগুলির তিনটি সামনের দিকে, দুই জোড়া দুই প্রান্তে। সামনের তিনটি বর্তমানের এবং পাশের দুই জোড়া হল অতীত ও ভবিষ্যতের প্রতীক।

গুণে দেখুন, সমগ্র রথটা বারজোড়া চাকার উপর দাঁড়িয়ে। এই বারো জোড়া চাকা প্রকৃতপক্ষে বৎসরের বারো মাসের প্রতীক।

ভদ্রলোকের বলা শেষ হলে তার মুখের দিকে তাকালাম : বাঃ! চমৎকার জানেন তো! এ-সব না জানলে কোনারকের শিল্পকর্ম দেখাই অনর্থক।

ভদ্রলোক বললেন, যে-কোনো শিল্পই অন্তর্নিহিত অর্থ না বুঝলে, শুধু চোখ দিয়ে দেখা নিরর্থক। পিকাসোর নাম শুনেছেন তো?

—হ্যাঁ। আধুনিক স্পেনীয় শিল্পী। ফ্রান্সে থাকতেন।

—পিকাসোর এনালিটিক্যাল cubism-এর কোনো ছবি দেখেছেন?

—হ্যাঁ।

—বোঝেন?

—কিম্ভূতকিমাকার মনে হয়।

—অর্থ না বুঝলে ওটা কিম্ভূতকিমাকার। আসলে একটা বড় concept-এর উপর তাঁর আর্ট দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের বা কোনো জিনিসের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের চতুর্দিক তিনি একবারে এঁকে দেখিয়েছেন। আমরা সব সময় প্রত্যেকটি জিনিসের থ্রি-ডাইমেনশনাল ভিউ দেখি। সর্বাঙ্গীণ ভিউ কখনও দেখতে পারি না। সর্বাঙ্গীণ ভিউ না দিতে পারলে সত্যদর্শন হয় না। তিনি সেই সর্বাঙ্গীণ ভিউ দেখাবার চেষ্টা করেছেন। দর্শক সেটা বুঝতে গিয়ে হিমশিম খায়। ছবিটা বুঝবার জন্য সে নিজেই ঘোরাফেরা করতে থাকে। মনে হয় ছবিটা নড়তে আরম্ভ করে দিয়েছে। শেষপর্যন্ত ছবিটাই যেন দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যায়। এ হল ব্রহ্মান দর্শনের মত। ব্রহ্মাণ্ডই ফোর্থ-ডাইমেনশনাল।[১] তাঁকে এঁকে

১. বর্তমান বিজ্ঞানের ধারণা অনুযায়ী মাল্টি-ডাইমেনশনাল। ১০টি ডাইমেনশনের নামকরণ হয়েছে। ২৬টি কল্পনা করা হয়েছে।

বোঝানো যায় না, বলে বোঝানো যায় না। পিকাসোর শিল্পকর্মের এই গোড়ার তত্ত্ব বুঝলে এর অর্থ স্পষ্ট হয়। শুধু যে শিল্প তা নয়, সাহিত্যের ক্ষেত্রেও তাই। জেমস জয়েসের নাম শুনেছেন?

—হ্যাঁ। তাঁর বিখ্যাত বই 'ইউলেসিস'।

—পড়েছেন?

—না। শুনেছি সারা বিশ্বে গুটিকয় ব্যক্তি ছাড়া সে বই কেউ পড়েননি।

—বস্তুত তাই-ই। Highly symbolical বই। তবে তার সর্বোৎকৃষ্ট symbol পাঠকরা বুঝতে পারেন না।

—কোন্‌টা?

—এই বইয়ের সবচেয়ে বড় Symbol হল বিশ্বরহস্যের স্বরূপ বোঝানো। সমগ্র বিশ্বজগৎ গতিময় এক বিরাট জিনিস বোঝায়। কিন্তু বস্তুত এটা সত্য নয়। চিরকাল টিকেও থাকবে না। আপেক্ষিক তত্ত্ব অনুযায়ী বিচার করলে চোখের পলক না পড়তেই জগৎ সৃষ্টি হচ্ছে, লয় পাচ্ছে। চণ্ডীর মতে 'কাষ্ঠি' সময়ের মধ্যে। 'কাষ্ঠি' হল, এক সেকেন্ডের এগারো লক্ষ ভাগের এক ভাগ সময়। বস্তুত বিশ্বজগৎ সৃষ্টি হচ্ছেই না, অথচ মনে হচ্ছে কালের বুকে বিরাট এক সৃষ্টি। জেমস জয়েসের বিরাট ভলিউম বইটিও বস্তুত তাই। Laws of association অনুযায়ী কাজ করছে। তুচ্ছ, বিরাট হয়ে ফুলে-ফেঁপে উঠেছে। কিন্তু অনেক সময় নিয়ে বইটি যখন পড়ে শেষ করলেন তখন দেখবেন যে, বইটি মোটেই এগোয়নি। যেখান থেকে আরম্ভ সেখানেই রয়েছে। সমগ্র বিশ্বজগৎও ঠিক এই ধরনের। মনে হয় বিরাট expansion বস্তুত যে মূলে ছিল সেখানেই সে আছে। মোটেই তার কোনো expansion ঘটেনি। এই জন্যই বস্তুজগৎকে শঙ্করাচার্য মায়া বলে বর্ণনা করেছেন।

বললাম, এতবড় কল্পনা ওই বইয়ের মধ্যে আছে?

—হ্যাঁ।

—জেমস জয়েস তো তাহলে আমাদের ঋষিদের মত!

ভদ্রলোক বললেন, কিন্তু দুঃখের ব্যাপার এই যে, তিনি তা নন।

—কেন?

—ওঁরা জিনিসটাকে intellectually বুঝবার চেষ্টা করেছেন। অনুভব দিয়ে নয়। ইউরোপের অধিবস্তুবাদীদের মতন।

—কী রকম?

—Pascal-এর একটি উক্তি থেকে ইউরোপ নিজের ভেতর খুঁজে দেখতে চেয়েছে—আপনি নিশ্চয়ই জানেন সে উক্তি, সেই যে The heart has its reason of which reason knows nothing! ফ্রয়েডের স্বপ্নতত্ত্ব ব্যাখ্যা মানুষের অবচেতন মনের বিরাট প্রহেলিকাকে তুলে ধরেছে। তারই ভিত্তিতে ইউরোপ অবচেতন মনে

ডুব দিয়ে শিল্প-সাহিত্য চর্চার চেষ্টা করছে।

বললাম, হ্যাঁ। অনেকটা আমাদের আত্মানং বিদ্ধির মতন।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, ঠিক তা নয়।

—কেন?

—অধিবস্তুবাদ abnormal মন থেকে সৃষ্ট। ফ্রয়েড মূলত abnormal মন নিয়ে চর্চা করেছেন। ওরা যথার্থই দেহের ভেতর যে মন আছে সেই মনের ভেতর ডুব দেয়। ভেতরেই থাকে, বাইরে যেতে পারে না। ভারতবর্ষ কিন্তু সুপারনরমাল মনকে নিয়ে চর্চা করেছে। ভারতবর্ষ মনের ভেতর ডুব দিয়ে সেখানে থাকে না বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। ইউরোপ মনকে বস্তু বলেনি। বস্তুর প্রভাবজাত একটা ভাব বলেছে বরং। ভারতবর্ষ মনকে আণবিক উপাদানে গঠিত বলে মনে করে। ভারতবর্ষের মন যথার্থই দেহের মধ্যে নয়। আছে বাইরে। ভারতবর্ষ মনে করে যে, সমগ্র বস্তুজগৎই পরমাত্মনকে কেন্দ্র করে। পরমাত্মনের মধ্যেই তাঁর ইচ্ছা-তরঙ্গ বস্তুদেহ ধারণ ক'রে, তাঁকে আবৃত ক'রে, তাঁরই মধ্যে স্বতন্ত্র-সত্তায় প্রতিভাত হচ্ছে। যেন সমুদ্রের মধ্যে স্বতন্ত্র কলসী। তার চারি দিকেও জল, ভেতরেও জল। ভেতরের জল কলসীর বাইরের আবরণ দ্বারা সীমিত। কিন্তু একই পরমাত্মন। আবরণটা সরে গেলে মূল সমুদ্রের সঙ্গে এক হয়ে যায়। ভারতবর্ষ ব্যক্তি মানুষকে সেই কলসীর মত মনে করে। এই কলসীর আবরণ হল ছয়টি। একটি ঘনীভূত স্থূল আবরণ আর চারটি সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর বস্তুর আবরণ। সর্বশেষ অবস্থা পরমাত্মন স্বরূপ মহাসমুদ্র। আবরণের ভেতরেও সেই সমুদ্র, বাইরেও সেই সমুদ্র। ভেতরের সমুদ্র আর বাইরের সমুদ্রের মধ্যে আবরণ একটি মায়া সৃষ্টি করে রেখেছে। সমুদ্রের কলসীর ভেতরের অংশটি নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে। তাকে সক্রিয় করে তুলতে পারলে বাইরের সমুদ্র আর ভেতরের সমুদ্র এক হয়ে যায়। ভেতরের সমুদ্র একটি হ্যারিকেনের পলতের মত। না জ্বললে অন্ধকার, আর জ্বললে স্বচ্ছ আলোর বৃত্ত। মানুষের মূলাধারস্থিত ঘুমন্ত শক্তিকে জাগরিত করতে পারলে আত্মার দীপশিখা ভেতরে জ্বলে উঠে। তখন স্থূলদেহের প্রাচীর অতিক্রম করে তা বাইরের সূক্ষ্ম দেহকে আলোকিত করতে থাকে।[১] এইভাবে দেহের পাঁচটি প্রাচীর ভেঙে গিয়ে শেষ স্তর রূপ পরমাত্মনের সঙ্গে ভেতরের আত্মন মিশে যায়। ফ্রয়েড অন্তরের গোলকধাঁধায় ডুব দিয়ে অন্ধকার হাতড়ে কিছু নুড়ি কুড়িয়ে পেয়েছেন মাত্র। তাঁর কাজ ডুবুরির মত। ভারত অন্তরে ডুব দিয়ে মূলাধারকে ভিত্তি করে সেখানে অন্ধের মত হাতড়ে বেরিয়ে উর্ধ্বগতি হয়েছে। তাঁর অন্তরে

১. Carl Sagan-এর ভাষায় এটা হল ডাইমেনশন বৃদ্ধি। ত্রিমাত্রিক মানুষের ডাইমেনশন বৃদ্ধি পেলে তার ভেতর বাইরে চলে আসে। সীমা তখন অসীম হয়ে যায়। গ্রহনক্ষত্রাদি বুকে নিয়ে আকাশ ফুটে উঠে। Cosmos, C. Sagan. p. 219.

ডুব দেওয়া মানে বাইরে ছড়িয়ে পড়া। অন্তরে ডুব দিয়ে সে দেহের স্থূলকোষ, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ পার হয়ে আনন্দময় কোষ এবং শেষে পরমাত্মনে মিশে যায়। ফ্রয়েডের মনস্তত্ত্ব অন্তরের অভ্যন্তরেই অন্ধ ডুবুরির মত হাতড়ে বেড়ায়। সেইজন্য ইউরোপের অধিবস্তুবাদ ভারতের 'আত্মানং বিদ্ধি' নয়।

অবাক হয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। গভীর জ্ঞানের অধিকারী। কে ইনি! হঠাৎ আমাকেই বা অযাচিত ভাবে এ-সব বোঝাচ্ছেন কেন?

ভদ্রলোক এক পলকে আমাকে তাকিয়ে দেখে বললেন, ওসব এখন থাক। হ্যাঁ, কোনারকের শিল্প দেখতে এসেছিলেন, তাই বুঝে নিন। জগমোহনের পেছনে এই যে ভগ্নস্তূপ দেখছেন, এখানেই ছিল বিমান। জগমোহনের উচ্চতাও প্রায় দু'শো আটাশ ফুট। সম্ভবত এই বিমানের ভারেই মূল মন্দিরটি ভেঙে পড়েছিল। বিমান থাকলে তার কারুকার্য বোধহয় দর্শককে আজ বিস্ময়ে হতবাক করে দিত।

কলিঙ্গের লোকেদের বিশ্বাস, সমগ্র মন্দিরটি তৈরি করতে বারো বছর সময় লেগেছিল। আধুনিক শিল্পপতিদের ধারণা এক হাজার লোক নিত্যদিন কাজ করলেও বারো বছরে এ মন্দির নির্মাণ করা সম্ভব নয়। কিংবদন্তি বলে, বারো হাজার স্থপতি বারো বছর এক নাগাড়ে কাজ করে এই মন্দির সমাপ্ত করেছিল। এজন্য ব্যয় হয়েছিল, কলিঙ্গের বারো বছরের রাজস্ব।

বললাম, মানুষের এত এত শ্রম, অথচ টিকল না!

ভদ্রলোক হেসে বললেন, পার্থিব কোন্ জিনিসটাই নিত্য কালের বলুন? সমগ্র বিশ্ব-জগৎটাও তো একদিন ধ্বংস হয়ে যাবে। বরং এই ধ্বংসলীলা মানুষের চৈতন্যশক্তিকে জাগরিত করে অনিত্য সংসারের যথার্থ স্বরূপ ভাল করে বুঝিয়ে দিয়ে তাকে নিত্য সত্যের দিকে আকৃষ্ট করতে পারে।

জিজ্ঞাসা করলাম, মধ্যযুগের অনেক শিল্পকর্ম তো আজো বেশ টিকে আছে! কোনারক এত দ্রুত ধ্বংস হল কেন?

ভদ্রলোক বললেন, ওড়িশার লোকেরা বলে, জলদস্যুদের আক্রমণে মন্দিরটা ধ্বংস হয়ে গেছে। মন্দিরের চূড়ায় নাকি একটি বড় কুম্ভক পাথর অর্থাৎ চুম্বক পাথর ছিল। সামনে সমুদ্র দিয়ে যাবার সময় যে-কোনো জাহাজকে কূলে টেনে নিয়ে আসত। এজন্য একদল বণিক একবার সমুদ্র দিয়ে যাবার সময় চুপি চুপি কোনারকে নেমে মন্দির আক্রমণ ক'রে অত্যন্ত গোপনে এই চুম্বক পাথরটি খুলে নিয়ে যায়। পুরোহিতরা এতে এত ভয় পেয়ে যায় যে, মন্দিরের পবিত্রতা নষ্ট হয়েছে, এই মনে করে সূর্যমূর্তির সঙ্গে অনেক কিছুই পুরীতে নিয়ে আসে। এরপর থেকেই এই পরিত্যক্ত মন্দির ধীরে ধীরে ধ্বংস হতে থাকে। লবণাক্ত হাওয়া, লতাগুল্ম, এবং পরিশেষে লোহার জন্য স্থানীয় অধিবাসীদের মন্দির ভাঙবার চেষ্টা অল্পদিনের মধ্যেই কোনারকের সৌন্দর্যকে ধূলিসাৎ করে দেয়। কেউ কেউ মনে করেন, বজ্রপাত বা

ভূমিকম্পের ফলেই মন্দিরটি শেষপর্যন্ত ধ্বংস হয়ে যায়! ভিন্ন দল মনে করে যে, বালুকণার মধ্যে ধীরে ধীরে এই মন্দিরের ভিত্ ডুবে যাচ্ছিল বলেই এই বিপর্যয়। তবে আসল কথা কালের প্রভাবে সবই তো একদিন ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। মানুষ এবং বিভিন্ন জাতির যেমন বৃদ্ধি ও ক্ষয় আছে, শিল্পেরও তাই। প্রথম যখন তৈরি হয়, তখন মনে হয় চিরকালীন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত জরাজীর্ণ হয়। অবশেষে ধ্বংস হয়। মানুষ তার পূর্ণ যৌবনে এসে কখনও ভাবতে পারে না যে, সে বৃদ্ধ হবে। জাতিও তেমনি। একদিন এথেন্স ভাবতে পারেনি যে, তার সাম্রাজ্য ভেঙে পড়বে। রোম ভাবতে পারেনি যে তার সাম্রাজ্যও চিরকালীন হবে না। আরবরাও ভাবতে পারেনি যে, আরবের মূল ভূখণ্ডই হবে আবার তাদের শেষ আশ্রয়। ইংরেজরাও কি কখনও ভাবতে পেরেছিল যে, তাদের সাম্রাজ্যে সূর্য অস্তমিত হবে? আসলে জগতে কোনো কিছুই স্থায়ী নয়। সেই সত্যটা জানলে অন্যান্য কারণ জানার আর প্রয়োজন নেই।

অবাক হয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

ভদ্রলোক বিদ্যুৎঝলকের মত সামান্য একটু হাসলেন। তারপর আবার বললেন, কোনারকের এই শিল্প—মূলত ব্রাহ্মণ্য শিল্প। ভারতবর্ষে শিল্পের প্রথম সার্থক প্রকাশ বৌদ্ধ ধর্মের জন্য, ইউরোপে যেমন খ্রিস্টান ধর্মের জন্য। গুপ্ত যুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনর্জাগরণের জন্য। কোনারকের শিল্পও ব্রাহ্মণ্য শিল্প। তবে বৌদ্ধ শিল্পের অনুকরণে। বৌদ্ধ শিল্প ও ব্রাহ্মণ্য শিল্পের মধ্যে একটা পার্থক্য আছে। বৌদ্ধশিল্পে আছে একটা স্নিগ্ধ প্রশান্তি, হিন্দু শিল্পে আছে গতি ও ঐশ্বরিক অনুভূতি।

বললাম, সত্যি আপনার জ্ঞান অপরিসীম। আমিও লেখাপড়া করেছি। এখনও করি। কিন্তু...। আপনার সম্পর্কে আমার ভারি কৌতূহল হচ্ছে।

ভদ্রলোক একটু অমায়িক হাসলেন শুধু।

বললাম, আচ্ছা, এই যে আমার দেশ ভারতবর্ষ, একসময় যার এই মহান কীর্তি, এত অবদান, সেই দেশটা আজ এমন করে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে কেন?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, স্বধর্মচ্যুত হয়েছে বলে।

—কী রকম?

—দেখুন, যে-কোনও জাতি, যে-কোনও ব্যক্তি বা যে-কোনও নীতি যখন তার স্বধর্মচ্যুত হয় তখন তার মৃত্যু হয়। দেখুন না রাজতন্ত্রের ধর্ম ছিল প্রজাপালন। সেই ধর্মচ্যুত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। স্বৈরতন্ত্রের ধর্ম হোল ভীতি প্রদর্শন। যখন ভীতি প্রদর্শন করতে ব্যর্থ হয় তখনই তার মৃত্যু হয়। গণতন্ত্রের ধর্ম হোল সমদর্শন। কিন্তু যেখানেই সে তাতে ব্যর্থ হয়েছে, সেখানেই তার পতন হয়েছে। জাতিরও তেমনি নিজস্ব একটা ধর্ম আছে। ইউরোপীয় জাতির অধ্যাত্ম ধর্ম হল খ্রিস্টান ধর্ম, কিন্তু মূল ধর্ম কর্ম। ইউরোপীয় জাতি বাহ্যিক দিকে খ্রিস্টান ধর্ম অনুসরণ করলেও খ্রিস্টান ধর্মের মূলকে মানে না। যীশুখ্রিস্ট বলেছেন, একগালে থাপ্পড় খেলে আর এক গাল

পেতে দেবে। কিন্তু কোনো ইউরোপীয় জাতিই তা করেনি। একগালে থাপ্পড় খেলে দশটি গাল ভেঙে দিয়েছে। কিন্তু অধ্যাত্ম ধর্মচ্যুত হয়ে আজো জাতি হিসেবে সে বেঁচে আছে এই কারণে যে, তার চরিত্রগত ধর্ম হচ্ছে কর্ম। কর্ম কখনও সে বিস্মৃত হয়নি। তবে তার ব্যক্তি-জীবনের কথা যদি আলোচনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে যে, পারিবারিক জীবন বলতে তার কিছু নেই। ঐশ্বর্য আছে, সুখ আছে, শান্তি নেই। ফ্রান্স, আমেরিকা প্রভৃতি দেশের উপন্যাসে সমাজজীবনের আলেখ্য পড়লে এই চিত্রই দেখা যায়। ওয়েস্ট জার্মানিতে মানবতা এত নিচু পর্যায়ে নেমে গেছে যে, শিশুরক্ষা নাকি রাষ্ট্রের একটা মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। মা-বাবা-সন্তান প্রতিপালন করতে চাচ্ছেন না। প্রভূত সম্পদ থাকতেও, ভোগের পথ ও উপায় থাকতেও ব্যক্তি-জীবনে সেখানে সুখ নেই। আত্মহত্যা প্রচুর পরিমাণ। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে যে জাতি, সে জাতি হিসেবে তারা বেঁচে থাকলেও ব্যক্তি হিসেবে বেঁচে নেই।

ভারতবর্ষে ক্রমশ রাজনৈতিক জাতি হিসেবে ভারতীয় জাতির মৃত্যু হয়েছে। ব্যক্তি জীবনেও ভাঙন দেখা দিয়েছে। এর কারণ, ভারতও স্বধর্মচ্যুত হয়েছে। ভারতের স্বধর্ম কী? অধ্যাত্মতাই ভারতের স্বধর্ম। ভারত সেই স্বধর্ম থেকে চ্যুত হয়েছে বলেই মৃত্যুর-মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। অথচ এই অধ্যাত্ম শক্তিই ভারতবর্ষকে যুগের পর যুগ বাঁচিয়ে রেখেছে। নানা বিপর্যয়েও তার ক্ষতি হয়নি এই অধ্যাত্মতার জোরেই। সেই অধ্যাত্মশক্তি হারানোর জন্যই স্বাধীনতা লাভ করেও তার অস্তিত্ব আজ বিপন্ন।

ভারতবর্ষে শক হূণ দল পাঠান মোগল; বহিরাক্রমণ তো যুগের পর যুগ কম হয়নি। তবুও যে-ভারতবর্ষ ছিল, সে-ভারতবর্ষই আছে। ভারতের আভ্যন্তরীণ আত্মিক শক্তি তাকে বাঁচিয়ে রেখেছিল। ভারতবর্ষ তাকে প্রত্যাখ্যান করেনি। ভারতের অন্তরাত্মায় সবাই ডুবে গিয়েছিল। এই মাটিতে একটা গভীর সত্য চিরকাল আছে। সেই সত্যের অদ্ভুত একটা চরিত্র। এত উদার চরিত্র পৃথিবীর অন্য কোথাও দেখা যায় না। যা সত্য তাকে গ্রহণ করতে তার দ্বিধা নেই। মিথ্যেকে বর্জন করতেও দ্বিধা নেই। সত্যকে নিতে দ্বিধা নেই, দিতেও দ্বিধা নেই। এই আত্মশক্তিই তাকে টিকিয়ে রেখেছিল। মুসলমান ও খ্রিস্টান ধর্মের মত ধর্ম থেকেও সে সার গ্রহণ করতে ভোলেনি। মুসলিম সুফী মতবাদ থেকে প্রচুর জিনিস নিয়েছে। যীশুখ্রিস্টকে শ্রীকৃষ্ণের সমকক্ষ করে দেখেছে। যার ফলে এই মাটিতে এমন একটা অধ্যাত্ম ধর্মের আত্মপ্রকাশ হয়েছে, যে ধর্মকে বলা যেতে পারে 'সনাতন ধর্ম'। হিন্দুধর্ম বলতে কোনো ধর্ম নেই। সিন্ধু, অর্থাৎ হিন্দের অধিবাসীদেরই বলে হিন্দু। হিন্দু নামে কোনো ব্যক্তি নেই যে, তার নামানুসারে হিন্দুধর্ম প্রচারিত হয়েছে। আসলে সত্য ধর্ম হিসেবে এ ধর্ম হোল সনাতন ধর্ম। 'হিন্দু' ধর্ম নয়, 'হিন্দু' শব্দ হোল সংস্কৃতি। বহু বিশ্বাস বহু মতবাদের সেখানে সমাবেশ ঘটেছে। এখানে বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ থেকে ষড়দর্শন; বৃহস্পতি লৌক্যের লোকায়ত দর্শন, চার্বাকের দর্শন, বৌদ্ধ দর্শন, জৈন দর্শন, মুসলমান

ধর্ম, খ্রিস্টান ধর্ম সব নিয়ে বিরাট এক সংস্কৃতি। কিন্তু অধ্যাত্ম ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা হল সনাতন ধর্ম, যা বিজ্ঞানের উপর, পরাবিজ্ঞানের উপর, উদারতার উপর প্রতিষ্ঠিত। সেই সনাতন ধর্মই ভারতকে বাঁচিয়ে রেখেছিল।

পৃথিবীতে দুটো দেশ ব্যক্তির নামে পরিচিত, রোমুলাস থেকে রোম, ভরত থেকে ভারত। রোমুলাসের রোম কিসের প্রতীক? পৃথিবীকে কি দিয়েছে? আইন। রোমান সাম্রাজ্য ভেঙে যাবার পর রোমক জাতি আর নেই। আইন আছে। অপর দিকে ভরতের নাম থেকে ভারতবর্ষ। ভরত কিসের প্রতীক? ভরত একটি অধ্যাত্ম শক্তির প্রতীক। সেই শক্তির ভিত্তিতে সমগ্র ভারতবর্ষ বাঁধা পড়েছিল। এমন কোনো নজির নেই যে, ভরত নামে কোনো রাজা সমগ্র ভারতবর্ষকে এক রাজছত্রতলে বেঁধে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি যে-অধ্যাত্ম ধর্মের প্রতীক ছিলেন, তার প্রভাব ছিল সারা ভারতবর্ষে। সারা ভারত তিনি যে-অধ্যাত্ম চেতনার প্রতিভূ ছিলেন তাকে মেনে নিয়েছিল। সেই অধ্যাত্ম শক্তিই ভারতবর্ষকে যুগে-যুগে এক করে বেঁধে রেখেছে। এই যে সমগ্র ভারতবর্ষটা এক, এটা সম্ভব হয়েছিল অধ্যাত্মতার জন্যই, ধর্মের জন্যই। এই অধ্যাত্মতা বা ধর্ম এই দেশকে মায়ের মত ভাবতে শিখিয়েছিল : 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপী গরিয়সী।' অথর্ব বেদে মাতৃভূমিকে কেন্দ্র করে বহু শ্লোক আছে। ভারতের প্রত্যেকটি ধর্মের তীর্থক্ষেত্র সারা ভারত জুড়ে ছড়িয়ে আছে। বৌদ্ধ, শৈব, শাক্ত, জৈন, এমনকি মুসলমান, খ্রিস্টান তাদেরও। প্রত্যেকটি তীর্থক্ষেত্র পরিক্রমা না করলে ভারতের কোনো মানুষের ধর্ম-কর্ম পূর্ণতা লাভ করে না। অর্থাৎ এদ্বারা এই সমগ্র উপমহাদেশটি যে এক দেশ সে ভাবটাই ভারতীয়দের মনে জাগাবার চেষ্টা করা হয়েছে। হিন্দুরা যে পুজোর আগে বাড়ি শুদ্ধ করে নেয়, তাতে গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী, নর্মদা, কাবেরী ও সিন্ধু নদের জল আহ্বান করা হয়। ফলে ভারতবর্ষের অধ্যাত্ম-ধর্ম সমগ্র উপমহাদেশটিকে এক করে বেঁধে রেখে দিয়েছিল। সেই ধর্মবোধটা ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বকাল পর্যন্ত টিকে ছিল। ভারতবর্ষের জাতীয় জাগরণের সৃষ্টি করেছিল এই অধ্যাত্ম ধর্ম। রাজা রামমোহন নবভারতের সূচনা করেন ধর্ম সংস্কার আন্দোলন দিয়ে! ভারতবর্ষ তার যথার্থ সত্তার নতুন করে পরিচয় পায় শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসের ধর্মসমন্বয় বোধের মধ্যে। বিবেকানন্দ বিশ্ব ধর্মসম্মেলনে ভারতের জন্য সম্মানজনক স্বীকৃতি আদায় করে আত্মবিস্মৃত ভারতবাসীকে আত্মজ্ঞানে জাগরিত করেন। ভারতবর্ষে কংগ্রেসের জন্ম এলান অক্টেভিয়ান হিউমের বিশেষ উদ্দেশ্যের জন্য হলেও শেষপর্যন্ত তার ব্যাপ্তি ঘটে মহাত্মা গান্ধীর মত অধ্যাত্মবাদী পুরুষের জন্যই। ভারতের সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের মূল প্রেরণা ছিল একটি ধর্মীয় গ্রন্থ 'গীতা'। এর প্রভাব এত বেশি ছিল ভারতীয়দের উপর যে ইংরেজ সরকার এই বইকে বে-আইনি বলে ঘোষণা করেছিলেন। বাংলা দেশের স্বদেশী আন্দোলনের মূল সুর ছিল দেশকে জননী হিসেবে কল্পনা করে। রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছিলেন, 'ও আমার

দেশের মাটি তোমার পরে ঠেকাই মাথা, তোমাতে বিশ্বময়ী, তোমাতে বিশ্ব মায়ের আঁচল পাতা।' স্বাধীনতার পরে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা থেকে সেই অধ্যাত্ম চিন্তার অপসারণ ঘটেছে বলেই দেশ আজ বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে।

এ ধরনের চিন্তাধারা অবশ্য আজকের আধুনিক মানুষের কাছে, প্রগতিশীল লোকের কাছে হাস্যাস্পদ। তারা মনে করেন যে, ধর্মের কোনো মূল ভিত্তি নেই। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মের সংস্রব জাতির পক্ষে ক্ষতিকর। দেখা যায়, ধর্ম প্রতিক্রিয়াশীল রাজনীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। ফ্রান্সে যাজক সম্প্রদায় প্রতিক্রিয়াশীল বুর্বোঁ শাসকদের অত্যাচারের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছিল। রাশিয়াতে পবেদোনেস্তেভ, রাসপুটিন এরা সব জারের অত্যাচারী শাসনের যন্ত্র হয়েছিলেন। ফলে ধর্ম কখনও সুস্থ জাতি গঠনে সহায়ক হতে পারে না।

ইউরোপ সম্পর্কে এ অভিযোগ সত্য হলেও ভারত সম্পর্কে এ অভিযোগ চলে না। ইউরোপের এক অদ্ভুত ধরনের সমাজব্যবস্থা ধর্মকে দুর্নীতিপরায়ণ করে তুলেছিল। যেমন, ফ্রান্সে সারা দেশের এক-দশমাংশ জমি ছিল চার্চের। এই জমিদারী যাতে যথার্থই সাধারণ মানুষের হাতে চলে না যায়, সেজন্য ব্যবস্থা করা হয়েছিল যে, জমিদারদের বড় ছেলেরা জমিদারী পাবে! মেজরা বড় বড় রাজপদ ও মন্ত্রীত্ব পাবে, সামরিক বিভাগে কাজ পাবে। ছোট ছেলেরা পাবে চার্চের জমিদারী। তারা বিশপ হবে। ফলে চার্চের জমিদারীর যারা মালিক তারা ধর্মপ্রতিষ্ঠার দায়িত্ব নিয়েছিল অধার্মিক হয়ে। বাহ্যত অবিবাহিত থেকে বিশপ হলেও অন্তরে কেউই বিশপ হতে পারেননি। ফলে বিশপ হয়েও উচ্ছৃঙ্খল জমিদারদের মতই জীবনযাপন করতেন। স্ট্রাসবুর্গের বিশপ কখনও দু'শো জন ব্যক্তির নিচে নিমন্ত্রণ করতেন না। আস্তাবলে সবসময় সমপরিমাণ ঘোড়া মজুত থাকত। রান্না হত রুপোর সসপেনে। রুপোর প্লেটে, রুপোর চামচেতে খাওয়া হোত। এই দেখে ষোড়শ লুইয়ের মত বুর্বোঁ রাজাও ব্রিয়েনের বিশপ পদে নিয়োগ নিয়ে আপত্তি করে বলেছিলেন, Let me at least appoint a bishop who believes in God।'

ইউরোপের এহেন ধর্মযাজকদের নিয়ে ভারতের ধর্মীয় নেতাদের বিচার করলে চলবে না। ভারতবর্ষের অধ্যাত্মতার যাঁরা যথার্থ ধারক, সেই সব আত্মত্যাগী সন্ন্যাসীদের কেউই সম্পদ নিয়ে মাথা ঘামাননি। ত্যাগই ছিল তাঁদের মহান মন্ত্র। এঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন প'হারী, কেউ ফলাহারী। এক মুঠো আতপ চাল আর কাঁচকলা ছিল যথার্থ ব্রাহ্মণের খাবার। রাজা বাদশার তাঁরা কখনও তোয়াজ করেন নি। রাজা বাদশারা তাঁদের কাছে মাথা নুইয়েছেন। জনসাধারণের কাছে তাঁরাও মহারাজ হিসেবে চিহ্নিত। এই সব সন্ন্যাসীদের যেমন ছিল আত্মবল তেমনই ছিল লোভহীনতা। আলেকজান্ডার ভারত জয় করতে এসে একজন যোগীকে ভয় দেখিয়েছিলেন, লোভ দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁকে একচুলও বিচলিত করতে পারেন

নি। আলেকজান্ডার তাঁর কাছে সেই যোগীকে কিছু প্রার্থনা করতে বললে তিনি বলেছিলেন—'ঈশ্বরের রোদ্দুর ছেড়ে দাঁড়াও তো বাপু।'

ভারতবর্ষের ধর্মসাধক যাঁরা তাঁরা সবাই এই ধরনের। বালানন্দ ব্রহ্মচারী এসেছেন কাশীপুরে। মহারাজা প্রসন্নকুমার ঠাকুর তাঁকে খবর পাঠালেন যে, সাধুজী যদি তাঁর বাড়িতে একটু আসেন। শুনে বালানন্দ বলেছিলেন, 'হামভি তো মহারাজ হ্যায়। উন্‌কো আনে বোলো।' প্রসন্নকুমার ঠাকুর ভ্রান্তি বুঝতে পেরে নিজেই বালানন্দজির কাছে এসেছিলেন। জিজ্ঞাসা করেছিলেন, তাঁর কিছু হবে কি না? বালানন্দ বলেছিলেন, 'কাহে নেহি হোগা, জরুর হোগা। আপ উলট যাইয়ে। অর্থাৎ মহারাজের অহংকার ছেড়ে তিনি প্রজা হোন। এই হল আমার দেশের সন্ন্যাসী। তাঁরা রাজার বা শাসকের তোয়াজ তো করেনই না বরং তাঁর অহংকার ভেঙে দেন।

ধর্মই ভারতবর্ষের জীবন, অধ্যাত্মতাই জীবন। এই ধর্ম বা অধ্যাত্মতার গ্লানি হলে ধর্মীয় পুরুষেরাই তার প্রতিবাদ করেছেন। ধর্মের গ্লানি রোধ করার জন্যই কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে শ্রীকৃষ্ণ পাণ্ডব পক্ষের হয়ে কৌরবদের বিরুদ্ধে গিয়েছিলেন। একদিন বৈদিক আচারে অনুষ্ঠানসর্বস্বতা প্রবল হয়ে উঠলে উপনিষদকারেরা প্রতিবাদ করেছিলেন। উপনিষদকে দমিয়ে ব্রাহ্মণ্য কুসংস্কার প্রবল হয়ে উঠলে মহাবীর জীন এবং গৌতম বুদ্ধ জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের প্লাবন এনেছিলেন। সামাজিক সাম্য যাদের মূল কথা ছিল, মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা যাদের মূল কথা ছিল, আবার সেই বৌদ্ধ ধর্মে অনাচার ও কুসংস্কার প্রবল হয়ে উঠলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তাকে দূর করে দেয়। ব্রাহ্মণ্যধর্ম সংস্কারের জন্য আবার আসে ভাগবত ধর্ম। আবার সমাজে অনাচার প্রবেশ করলে তার বিরুদ্ধে তন্ত্রধর্ম প্রবল হয়ে দেখা দেয়। হিন্দু ও বৌদ্ধতন্ত্র অনাচারপুষ্ট হলে মধ্যযুগে তার বিরুদ্ধে ভক্তি আন্দোলন প্রবল হয়ে দেখা দেয়। ভক্তি আন্দোলনের মূল কথা ছিল মানুষে-মানুষে সাম্য। সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য। আবার একদা ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থা বড় হয়ে উঠলে আধুনিক যুগের সূচনায় দেখা দেন রাজা রামমোহন রায় ও শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব। স্বামী বিবেকানন্দ কঠোরভাবে ধর্মীয় আলোচনাতে ভ্রান্তিপূর্ণ সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। 'জীবই শিব' এই ছিল তাঁর মূল কথা। সেবাই মূল লক্ষ্য। কার্ল মার্কসের মত তিনিও একই কথা বলেছেন। কার্ল মার্কস দ্বন্দ্ববাদের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের কথা বলে ভাবি সাম্যবাদী সমাজ অনিবার্য, একথা ঘোষণা করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ একটি চিরন্তন নিয়মের ভিত্তিতে এই একই কথা বলেছিলেন। দেওয়া ও নেওয়ার মধ্যেই সমাজ বেঁচে আছে। হৃদপিণ্ড রক্ত ছেড়ে দেয় এবং টেনে নেয়, যার ফলে দেহ বেঁচে থাকে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম হলে যেমন দেহ বাঁচে না তেমনি মানব সমাজও এই দেয়া নেয়ার ভিত্তিতে না চললে মৃত্যুর মুখোমুখি হয়। একদিন ভারতীয় সমাজে ব্রাহ্মণেরা যখন সুযোগ সুবিধা নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখতে চাইল, অপরকে দিতে

চাইল না, তখন তাঁদের পতন হল। এল ক্ষত্রিয়েরা। ক্ষত্রিয়েরা যখন এই সুযোগ সুবিধা নিজেদের হাতে রাখতে চাইল, অপরকে ভাগ দিতে চাইল না, তখন তাদের বিরুদ্ধে এল বৈশ্যেরা। আজ ভারতীয় সমাজে বৈশ্যতন্ত্র চলেছে। Capitalist শ্রেণি সকল সুযোগ-সুবিধা নিজেদের কুক্ষিগত করে রাখতে চাইছে, কাউকে ভাগ দিতে চাইছে না। এর পরিণতি হবে এদের পতন। আসবে শূদ্রেরা, সমাজতন্ত্রের ভাষায় যাদের সর্বহারা শ্রেণি নামে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। সুতরাং ভারতবর্ষে ধর্ম কখনও প্রতিক্রিয়াশীলতার ভূমিকা নেয়নি, বরং অন্যায়ের বিরুদ্ধে কঠোর ভাবে প্রতিবাদ জানিয়েছে। অবশ্য তথাকথিত কিছু কিছু গুরুজী আছেন আজকের সমাজে যাঁদের খুব প্রভাব দেখা যায়, এরা বড়লোককেই তাঁদের করুণার পাত্র করে নিয়েছেন। গরিব অঞ্চলে আনাগোনা নেই। কোনো একটি বড় ধর্মীয়, মিশন, সেবার আদর্শেই যার জন্ম হয়েছিল, অভিযোগ, আজ সেই মিশন বড়লোক-ঘেঁষা। এধরনের ধর্মগুরু ও এধরনের মিশন ধর্মের ক্ষেত্রে ক্ষতিকর। এঁদের লক্ষ্য করেই প্রধোঁর বক্তব্য উদ্ধৃতকারী কার্ল মার্কসের ধর্ম-সম্পর্কিত মন্তব্য উল্লেখ করা যায় যে, Religion[১] is opium of the people.

ভদ্রলোকের অদ্ভুত জ্ঞান দেখে সত্যই আশ্চর্য বোধ করলাম। বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, আধুনিক শিক্ষায়ও তিনি শিক্ষিত। ইতিহাস চেতনা যে প্রচুর পরিমাণে আছে সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। তবু আর একটু বাজিয়ে নেবার জন্য বললাম, কিন্তু হিন্দুধর্মের সমাজ ব্যবস্থাটা তো অত্যন্ত অনাচারের উপর দাঁড়িয়ে আছে। মানুষে-মানুষে চিরন্তন ভেদ করে রেখেছে এই সমাজ। চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা আমাদের কাছে যেমন দৃষ্টিকটু, জগতের কাছেও তেমনই। যে-ধর্ম এই ব্যবস্থাকে প্রশ্রয় দেয় সেই ধর্মের উপর লোকে আস্থা রাখবে কি করে?

ভদ্রলোক হাসলেন, বললেন, self imposed গুরু ও লোভী কিছু মিশনের জন্যই এটা হয়েছে। এই শ্রেণির লোক সবসময়েই সমাজটাকে নিজেদের হাতে রাখার জন্য এই ব্যবস্থা করেছিল। ভারতবর্ষে যথার্থ যাঁরা অধ্যাত্ম-সাধনা করেন, তাঁরা এ ধরনের ব্যবস্থাতে বিশ্বাস করেন না। যাঁদের কাছে বিষ্ঠা ও অমৃত সমান, একই ব্রহ্মণসম্ভূত, তাঁরা ভেদাভেদ স্বীকার করবেন কী করে?

—কিন্তু জিনিসটা তো চলছে?

—চলছে ভুল ব্যাখ্যার জন্য। বস্তুত যাঁরা এই চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা করেছিলেন তাঁরা মানুষে-মানুষে ভেদ সৃষ্টি করার জন্য এটা করেননি। বরং মানুষকে মর্যাদা দেবার জন্যই এটা করেছিলেন। অপব্যাখ্যা করে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় শ্রেণির লোকেরা এই

১. Religion-শব্দের উৎপত্তি রোমান 'Religore' শব্দ থেকে যার অর্থ tie back, অর্থাৎ যেখান থেকে উৎপত্তি সেখানে ফিরে যাওয়া—যাকেই আমার বলি অধ্যাত্মতা।

ভেদটাকে বহাল রাখবার চেষ্টা করেছে। জগতে একমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই শ্রেণিভেদ নেই। অন্যত্র সর্বত্রই আছে। আজকে ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে যে ভেদ হিন্দু বর্ণ ব্যবস্থার সেরকম ভেদ কোনো দিনই ছিল না। আমাদের দেশের এক বিড়লা এ-দেশের দরিদ্র লোকের পাশ দিয়ে যাবার সময় নাকে রুমাল চাপা দেবেন। কিন্তু আমেরিকায় ফোর্ডের সঙ্গে এক টেবিলে খানা খাবেন। সমগ্র জগতে দুটোই শ্রেণি আছে ধনী ও দরিদ্র। পৃথিবীর নানা দেশের ধনীদের মধ্যে যেমন জাত ভেদ নেই, গরীবদের মধ্যেও তেমনি জাতিভেদ নেই। হিন্দুরা এ ধরনের চিরকালীন ভেদ যাতে না হয় সেই জন্য কর্মের ভিত্তিতে বর্ণভেদ করেছিল। এ ধরনের বর্ণভেদ সমগ্র পৃথিবীতেই একদিন ছিল। প্রাচীন সমাজে স্বাধীন মানুষ ও দাসের মধ্যে ছিল দুস্তর ব্যবধান। মধ্য যুগে উৎপাদকেরা guild society গঠন করে কর্মের ভিত্তিতে সমাজে জাতিভেদ করেছিল। সে ভেদটা সহজে মিলনযোগ্য ছিল না। ভারতবর্ষও কর্মের ভিত্তিতে শ্রেণিভেদ করেছিল। কিন্তু সে ভেদটা চিরন্তন নয়। আর্যরা ব্রহ্মচর্যকালে সবাইকে সমান দেখতেন। শূদ্রেরা বিজিত জাতি ছিল বলে তাদের অবশ্য এই শ্রেণির মধ্যে ফেলা হয়নি। তা ছাড়া ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য সবাই গুরুগৃহে সমান মানবিক মর্যাদায় শিক্ষা গ্রহণ করতেন। সবাইকে ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করে এনে গুরুকে দিতে হোত। সমান অন্ন খেতে হোত। শিক্ষা সমাপ্ত হলে যে যে-বিদ্যা লাভ করতো সেই বিদ্যার ভিত্তিতে সমাজে প্রবেশ করতো। পুজো আর্চা যিনি করতেন তিনি হতেন ব্রাহ্মণ। রাজ্য দেখা ও দেশ রক্ষা যাঁরা করতেন তাঁরা ক্ষত্রিয় এবং কৃষিকাজ ও ব্যবসা বাণিজ্য যাঁরা করতেন তাঁরা বৈশ্য নামে পরিচিত হতেন। কিন্তু এই ভেদ সাময়িক। আমাদের সমাজ, আমাদের ধর্ম কখনই কাউকে এই পৃথিবীকে চিরকালীন বলে ভাবতে শেখায়নি। গার্হস্থ্য জীবন ও বাণপ্রস্থ পর্বটাকেই তাঁরা পার্থিব জীবনের জন্য রেখেছিলেন। এর পরই 'সংসার সত্য নয়' এই বোধ থেকে সংসার ত্যাগ করা। সংসার ত্যাগ করে চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ করলেই অর্থাৎ সন্ন্যাস নিলেই মানুষে-মানুষে আর কোনো ভেদ থাকত না। সুতরাং আমাদের ধর্ম ব্যবস্থার আদিতে ছিল সাম্য, মধ্যে ভেদ, পরিণতিতে সাম্য। সুতরাং চিরন্তন ভেদ বলে আমাদের ধর্ম ব্যবস্থার মধ্যে কিছু নেই। হেগেলের দ্বন্দ্ববাদের সূত্র যেন আমাদের সমাজ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে কাজ করেছে।

সত্যি এ ধরনের নতুন ব্যাখ্যা আমি কখনও শুনিনি, বেশ চমকিত হলাম। তবু ভদ্রলোককে আর একটি প্রশ্ন করলাম, ধরে নিলাম বর্ণ ব্যবস্থা ভাল, কিন্তু আর একটি বড় অভিযোগ কিন্তু আমাদের ধর্মের বিরুদ্ধে আছে।

—কী রকম?

—পশ্চিমীরা ধরে নিয়েছেন, আমরা জীবনটাকে অস্বীকার করেছি! সোয়াইৎসারের মত দার্শনিকও জীবনের প্রতি ভারতীয়দের দৃষ্টিভঙ্গিকে Life negation-এর

দৃষ্টিভঙ্গি বলে বর্ণনা করেছেন।

ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন, আপনারও কি তাই মনে হয়?

বললাম, সে কথা অস্বীকার করি কি করে? আর এই দৃষ্টিভঙ্গীর জন্যই দুর্নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের হাত সমাজে শক্ত হচ্ছে। আপামর মানুষ 'জগৎ মিথ্যা' এই দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঈশ্বরনির্ভর পরমার্থিক হয়ে উঠেছেন। ফলে জোচ্চোরেরা তাদের ধর্মের আফিং খাইয়ে নিজেরা লুটেপুটে নিচ্ছে।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, না। এরকম ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। তাই যদি হত তাহলে চতুরাশ্রম ব্যবস্থা হোত কেন?

কথাটা ঠিক ধরতে না পেরে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

ভদ্রলোক বললেন, চতুরাশ্রম ব্যবস্থাটাই এ ধরনের অভিযোগের বিরুদ্ধে জীবন্ত প্রতিবাদ। চতুরাশ্রম মানে কী? ব্রহ্মচর্য পর্বে জীবনের জন্য প্রস্তুতি। গার্হস্থ্যে জীবন উপভোগ। তবে ইহলৌকিক জীবনটাই সব নয়। সেজন্য সংসারজীবন শেষে বাণপ্রস্থ পর্বে একটু একটু করে দূরে সরে যাওয়া। সন্ন্যাস পর্বে সম্পূর্ণভাবে সংসার পরিত্যাগ করা। জীবনের প্রতি এর চাইতে সত্য দৃষ্টিভঙ্গি আর কোথায় আছে? এ জগৎ যেমন মিথ্যে নয়, তেমনই সত্যও তো নয়। বিজ্ঞানীরাই বলছেন যে, একদিন এই সূর্যটাও মরে যাবে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডও থাকবে না। তাহলে সত্য কি? ভারতবর্ষ বলেছে, সত্য হল পরব্রহ্মণ। অবশ্য তাঁকে বর্ণনা দিয়ে বোঝানো যায় না। সেই পরব্রহ্মণ হলেন সচ্চিদানন্দ স্বরূপ। অর্থাৎ সৎ (নির্গুণ অস্তিত্ব) চিৎ (অস্তিত্ব সম্পর্কে আত্মবোধ) এবং আনন্দ (আত্মবোধ থেকে বিস্তৃতি)। ব্রহ্মণ থেকেই জগৎ। অবস্তু থেকে বস্তু। কিন্তু বস্তুরূপে চিরকাল থাকবে না। আবার অবস্তু রূপে স্বীয় অস্তিত্বে ফিরে যাবে। কিন্তু যখনই কোনো কিছুর উৎপত্তি হয়েছে তখন তা মিথ্যা হতে পারে না। তবে ব্রহ্মণের দুটো দিক আছে নির্গুণভাবে তিনি শাশ্বত। সগুণ ভাবে মৃত্যুশীল। সগুণ পর্যায় হোল তাঁর অবতরণ পর্যায়। নির্গুণ ভাব আরোহ পর্যায়। এই দুই পর্যায় মিলেই সত্যের যথার্থ রূপ। এই সত্যকে বোঝাবার জন্যই ভারতবর্ষের জীবনব্যবস্থা এই রকম। সেই জন্য ভারতবর্ষ 'জগৎ মিথ্যা' বলে চুপ করে থাকেনি। শঙ্করের মত মায়াবাদীও বলেছেন, মূর্তামূর্তম। যিনি অমূর্ত তিনিই মূর্ত। সুতরাং জগৎ মিথ্যা হবে কেন? এই জন্যই তো জীবনসাধনার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ বলে, ধর্ম (সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় নিয়ম) অর্থ (পার্থিব সম্পদ) কাম (ভোগ) ও মোক্ষ (মুক্তি)। জীবনকে সে যেমন চূড়ান্ত ভাবে অস্বীকার করেনি, তেমনই স্বীকারও করেনি। সুতরাং ভারতবর্ষের আদর্শ Life negation নয়, Truth acceptance. পৃথিবীর অন্যসব দেশ এই সত্যকে ধরতে পারেনি। বস্তুবাদীরা একপেশে।

সত্যেই বিমুগ্ধ হলাম ভদ্রলোকের গভীর দৃষ্টিভঙ্গি দেখে। সবটাই যে অধীত বিদ্যা থেকে বলা, তা মনে হোল না। ভদ্রলোকের কোথায় একটা সৃজনশীল ক্ষমতা আছে।

স্রষ্টামনের পক্ষেই এ ধরনের অভিমত সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ কবি হয়েও তাই তাঁর স্রষ্টা মনের জন্য A vision of India's History-তে ভারত-ইতিহাসের কতকগুলি অন্তর্নিহিত সত্যকে দেখতে পেয়েছিলেন। তবু ভদ্রলোককে পরীক্ষা করার জন্য আর একটি মোক্ষম প্রশ্ন তুললাম—যে প্রশ্ন তুলে হিন্দুধর্মের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় আঘাত হানা হয়েছে—পৌত্তলিকতা। বললাম, তবু হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে কিন্তু সব চেয়ে বড় একটি অভিযোগ আছে। সেজন্য সুস্থ জীবনের ভিত্তি এ ধর্ম হতে পারে না। জাতি গঠনের ভিত্তি হিসেবে বিশেষ করে এ ধর্ম কাজ করতে পারে না। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন, সেটা কী?

বললাম, পৌত্তলিকতা। হিন্দুরা পুতুল পূজারী।

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, একমাত্র হিন্দুরাই পুতুল পূজারী নয়। তাছাড়া জগতের অন্যসব ধর্মানুসারীরাই পুতুল পূজারী।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী রকম?

ভদ্রলোক বললেন, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের দেখুন। তারা মূর্তিতে বিশ্বাস করে না। অথচ কোনো খ্রিস্টানই ক্রুশকে[১] অস্বীকার করতে পারে না। গির্জায় অলটারের কাছে তাদের যেতেই হয়। মুসলমানরা এ-দেশ থেকে পশ্চিম দিক বা ইউরোপ থেকে পুব দিক অর্থাৎ মক্কার দিকে মুখ না রেখে নামাজ পড়তে পারে না। তাদের স্মৃতিপথে হয়তো ভেসে ওঠে কাবা মসজিদ ও চতুষ্কোণ কৃষ্ণপ্রস্তরটি। কিন্তু হিন্দুরাই একমাত্র জাতি যারা মঠ-মন্দির মূর্তি সব বাদ দিয়ে শ্মশানে নির্বিকল্প সমাধিতে লিপ্ত হোতে পারেন। মুসলমান পণ্ডিত অল্‌বিরুণী এটি বুঝতে পেরেছিলেন বলেই হিন্দু মুসলমানে তিনি কোনো ভেদ দেখতে পাননি।

মূর্তি হিসেবে আমাদের সামনে যা আছে তা মূর্তি নয়, পুতুল নয়। একে বলে প্রতিমা। প্রতিম থেকে প্রতিমা শব্দের উৎপত্তি। অর্থাৎ সত্যের প্রতিম ভাবই প্রতিমা। সত্যকে জানার জন্য এ হল বড় একটা ইঙ্গিত মাত্র। মুসলমানদের মসজিদের চূড়া যেমন infinite-এর দিকে একটা ইঙ্গিত, আমাদের পুতুলও তেমনি সত্যের প্রতি একটা ইঙ্গিত মাত্র। গির্জায় ঘণ্টার শব্দ ঢং, মুসলমানদের আজানের আল্লা-আ-আ— হিন্দুদের অ-উ-ম সবই সেই ইঙ্গিত মাত্র। আমাদের প্রতিমার প্রতীকার্থ ধরা পড়লে মূর্তি তো থাকেই না বরং সত্য এক অপরূপ রূপে ধরা দেয়।

কৌতূহলী হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম, যেমন?

ভদ্রলোক বললেন, আপনি তো বাঙালি। বাঙালির মূর্তি নিয়েই প্রথম কথা বলা যাক। বাঙালি দেহে দুর্বল হলেও মনে মনে শক্তির উপাসক। এই জন্য বাঙ্গালির

---

১. খ্রীস্টানদের ক্রুশ 'Sacrifice'-এর প্রতীক, আমাদের যজ্ঞের মতন। Out of the sacrifice of God universe evolved, out of the sacrifice of our ego will shall go back to the Source.

ধর্ম-সাধনায় তার আরাধ্য দেবতা সম্পর্কে বলা হয়েছে, 'কালিকা বঙ্গ দেশে চ।' বাঙালির আরাধ্যা দেবী হলেন ঁকালী। ঁকালীর যে ভয়ঙ্কর মূর্তি কল্পনা করা হয়েছে বাহ্যদৃষ্টিতে তা বর্বরোচিৎ। মূর্তি ভয়ঙ্করী। নরখাদিকা। ক্রুদ্ধা। ক্রোধে হিতাহিতজ্ঞানশূন্যা হয়ে স্বামীর বুকে দাঁড়াতেও দ্বিধা নেই। গলায় নরমুণ্ডের মালা। হাতেও একটি নরমুণ্ড। আফ্রিকার কোনো নর-খাদক উপজাতি কর্তৃক পূজিতা দেবী হিসেবেই তিনি বেশি শোভনীয়া। এই জন্যই বিদেশিদের ধারণা, তিনি অসভ্য ধর্মীয় সংস্কৃতির একটি প্রকাশ মাত্র। আমাদের দেশের একজন সাধক শ্রেণির ব্যক্তিও ঁকালীর ঐতিহাসিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে, ভারতীয় সমাজ যখন উপজাতীয় স্তরে, পারস্পরিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত নিত্যকার ঘটনা, সেই সময়ে ঁকালী এ দেশবাসী কর্তৃক কল্পিত শক্তির একটি মূর্তিমাত্র। কিন্তু এ-সব ব্যাখ্যাই ভুল। এ মূর্তি অত্যন্ত সুপরিকল্পিত একটি সু-উচ্চ ভাবের শিল্পরূপ।

—কী রকম? ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালাম।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, এ মূর্তি হল তন্ত্র-বিজ্ঞানের এক অত্যন্ত ব্যঞ্জনাময় শিল্পরূপ। এতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উদ্ভবের কাহিনি বর্ণিত আছে। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মাণ থেকে কি ভাবে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি হয়েছে সেই কাহিনিই ব্যক্ত করা হয়েছে। ব্রহ্মাণের প্রথম অংশ সৎ (নির্গুণ অস্তিত্ব)। সেই নির্গুণ অস্তিত্বে এক সময় ব্যাখ্যাতীত উপায়ে অস্তিত্ব বোধ জাগরিত হয়। তখন সৎ-এর সঙ্গে যুক্ত হয় চিৎ অর্থাৎ অস্তিত্ববোধ সম্পর্কে চৈতন্য। অস্তিত্ববোধ সম্পর্কে চৈতন্য হলেই ইচ্ছা জাগে নিজেকে ভোগ করবার। সেই শিহরন থেকে সৎ-এর হৃদয়ে শিহরন হয়। শিহরন থেকে হয় কম্পন। সেই কম্পন থেকে হয় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। তন্ত্রের এই গূঢ় তত্ত্বই ঁকালীরূপের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। তন্ত্র বলে, সৎ-এর মধ্যে আলোড়ন প্রথম হল অবর্ণনীয় ও অবোধ্য। ইচ্ছা তখনও চেতনার মধ্যেই ডুবে থাকে। সেই অবস্থায় পরম সত্যকে অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত পুরুষ বা শিবকে কল্পনা করা হয়েছে। শিবলিঙ্গ হিসেবে। লিঙ্গ হল পুরুষের প্রতিকৃতি। গৌরীপট্ট প্রকৃতির। প্রকৃতি এবং পুরুষ তখনও একাত্মভাবে যুক্ত। এরপর সেই অবর্ণনীয় ইচ্ছা অনুভবগ্রাহ্য হয়। পুরুষের মধ্যে ইচ্ছার আবেগ স্পষ্ট বোঝা যায়। নির্গুণ পুরুষের মধ্যে গতি ফুটে উঠে। গতি ফুটে উঠলেই ইচ্ছা বা প্রকৃতি সক্রিয়া হন। প্রকৃতি সক্রিয়া হলেই কালের উদ্ভব হয়। সেইজন্য পুরুষের এই ইচ্ছাকে কালের অধিশ্বরী ঁকালী নামে চিহ্নিত করা হয়েছে। এই কালীশক্তি অর্থাৎ পরমা প্রকৃতি— একান্নটি বিশেষ তরঙ্গের আকারে ছড়িয়ে পড়ে সৃষ্টির প্রথম উপাদান, বস্তুগ্রাহ্য বিশ্বজগতের প্রথম উপাদান তৈরি করেন। তাঁর এই গতি বিজ্ঞানের ভাষায় কোয়ান্টাম পদ্ধতিতে চলে। এই যে ইচ্ছাতরঙ্গ একেই আমাদের শাস্ত্রে বলে বর্ণ, ইংরেজিতে যাকে বলে vibration এই বর্ণকে প্রতীকরূপ দেওয়া হয়েছে অক্ষরে। একান্নটি তরঙ্গের একান্নটি প্রতীকরূপ বা অক্ষর আছে। এই একান্নটি তরঙ্গই সৃষ্টি করেছে

প্রকৃতিরূপ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। ৺কালীই হলেন সেই পরমা প্রকৃতি। তাই তাঁর গলায় সেই অক্ষরের পঞ্চাশটি ও হাতে একটি, মোট একান্নটি অক্ষর আছে; অর্থাৎ একান্নক্ষরা প্রকৃতির তিনি প্রতিকৃতি। তিনিই জন্ম দেন, অনবরত প্রসবিনী। অনবরত প্রসবিনী এই অসীম জননীশক্তি সেইজন্য বসনহীনা। অসীমকে বাঁধা যায় না বলেই তাঁর বসন নেই।[১] তিনিই পালনকর্ত্রী বলে দু'হাতে বরাভয়। আবার তিনিই সংহার করেন বলে এক হাতে ধ্বংস। আর এক হাতে (যে হাতে মুণ্ড রয়েছে) সৃষ্টি করেন বলে রমণী। তিনিই রসনা দংশন করে আছেন, অর্থাৎ তিনিই প্রকৃতিতে সাম্য রাখছেন। তন্ত্রে রসনা হল সংযমের প্রতীক। রসনাকে সংযমে রাখলে মন সংযমে থাকে। মন চলে তিন গুণের প্রভাবে। যখন যে গুণের প্রভাব বেশি তখন সেইভাবে মনের গতি। সত্ত্ব, রজঃ ও তম কোনো ভাবের একটি যদি অপর দু'টি গুণকে বেশি ছাপিয়ে উঠে তখন সৃষ্টি রক্ষা পায় না। সত্ত্ব সব চাইতে প্রবল হলে মানুষ কর্মহীন হয়, সমাধিস্থ হয়! রজঃ বেশি হলে সংঘাত চলে। তম বেশি হলে অধঃপাতে যায়। এই তিন গুণের সাম্য থাকলে তবেই প্রকৃতি সচল থাকে। ৺কালী রসনা সংযত করে এই তিন গুণের মধ্যে সাম্য রক্ষা করছেন। তাঁর পায়ের নিচে শিব। তিনি নিষ্ক্রিয়। এটি একটি বৈজ্ঞানিক সত্য। শক্তির কেন্দ্র, যাকে বলে নিউক্লিয়াস, তা সব সময়ই নিষ্ক্রিয় থাকে। সেই নিষ্ক্রিয় নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করেই শক্তির নৃত্য চলে। আণবিক বিস্ফোরণ ঘটিয়ে বৈজ্ঞানিকরা এখন এই সত্যকে আমাদের কাছে স্পষ্ট করে ধরে দিয়েছেন। ৺কালীরূপ মহাশক্তির যে কেন্দ্ররূপ পুরুষ বা নিউক্লিয়াস তিনিই নিষ্ক্রিয় শিব। তিনি যতক্ষণ নিষ্ক্রিয় ততক্ষণ শক্তি বা প্রকৃতির খেলা। তিনি আত্মস্থ হলেই প্রকৃতি লয় পাবে।

আধুনিক Astro-physics-ও আমাদের তন্ত্রপরাবিজ্ঞানের এই বিশ্ব-সৃষ্টির ব্যাখ্যাকে মেনে নিয়েছে। অ্যাসট্রোফিজিক্স্ মনে করে যে, কখনও কোনো সময় মহাবিশ্বের কেন্দ্রস্থলে অব্যক্ত কারণে এক বিস্ফোরণ ঘটেছিল। সেই বিস্ফোরণের গতি আজও সক্রিয়। ফলে বস্তুজগৎ সেই বিস্ফোরণের কেন্দ্র থেকে আজও প্রতি সেকেন্ডে হাজার হাজার মাইল বেগে দ্রুত ছুটে চলেছে। কিন্তু যেদিন সেই বিস্ফোরণের বেগ শেষ হয়ে যাবে সেদিন লহমার মধ্যে উল্টোগতিতে সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সেই কেন্দ্রাভিমুখী হয়ে সমগ্র সৃষ্টিকে ধ্বংস করে দেবে। একেই বলা হয়েছে প্রলয়ের দিন। ৺কালীমূর্তির মধ্যে এত বড় একটি ভাবের ব্যঞ্জনা আছে। সুতরাং হিন্দুরা প্রতিমা নয়, একটা

---

১. আসলে গুণই বসন। Primordial energy-তার প্রথম সম্প্রসারণকালে পাঁচ লক্ষ বছর অন্ধকারের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। এই সময়টিতেই তিনি কৃষ্ণবর্ণরূপে কালের জন্মদাত্রী হিসেবে ৺কালী। তখনও গুণক্ষোভে আলো দেখা দেয়নি বলে অর্থাৎ তাঁর মধ্যে গুণের প্রকাশ ঘটেনি বলে তিনি বসন অর্থাৎ বন্ধনহীনা বলে উলঙ্গিনী। কেশ তাঁর শক্তির প্রতীক। ঋগ্বেদের নাসদীয় সূক্তের 'অন্ধকার ঘন তমিস্রায় আচ্ছন্ন' পর্যায়ের তিনি ঘনঘোর রাত্রিস্বরূপা।

সত্যের প্রতিমতার পুজো করে, প্রতিমার পুজো করে না।

অবাক হয়ে গেলাম ভদ্রলোকের জ্ঞান দেখে। মুগ্ধ বিস্ময়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

ভদ্রলোক বললেন, জানেন, এই সৃষ্টিতত্ত্ব থেকেই ভারতীয় তন্ত্র-সাধনার উদ্ভব।

—কী রকম?

—তন্ত্রকে মূলত বামাচার বলে।

বললাম, হ্যাঁ, পঞ্চ 'ম'-কারের সাধনা হয় বলেই একে বামাচার বলে, বিশেষ করে মৈথুন তত্ত্বের জন্য। বামা অর্থাৎ রমণী নিয়ে এখানে সাধনা করতে হয়।

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, না, এ ব্যাখ্যা যথার্থ ব্যাখ্যা নয়।

—কেন?

—এ হেন ব্যাখ্যা একদল লম্পট তৈরি করেছিল। সমাজে যখন সর্বাঙ্গীণ অনাচার চলছে তখন তারই সুযোগ নিয়ে তারা এই ধরনের তন্ত্র নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। এর ফলে তন্ত্র-ধর্মের যথার্থই ক্ষতি হয়েছিল। মৈথুনের যথার্থ অর্থ কী, আপনাকে তো তা ব্যাখ্যা করে বললামই।

জিজ্ঞাসা করলাম, তবে তন্ত্রকে বামাচার বলা হয় কেন?

—বামাচার অর্থ উল্টো আচার। 'বাম' মনে উল্টো। যে পদ্ধতিতে পুরুষ থেকে বিশ্বপ্রকৃতির উদ্ভব হয়েছে সেই উৎসে ফিরে যেতে হলে উল্টো পদ্ধতিতে চলা দরকার। তন্ত্র সেই উল্টো পদ্ধতিতে চলতে শেখায় বলেই একে বামাচার বলা হয়। তন্ত্র মতে এই দেহটাই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের ক্ষুদ্র প্রতীক। মানব দেহের মধ্যে বিশ্বরহস্যের উৎপত্তিক্রিয়া কাজ করছে। সহস্রার হল সেই পরমপুরুষ যার মধ্যে ইচ্ছা-তরঙ্গ মহাবিশ্বে একান্নটি পর্যায়ে কাজ করলেও দেহ বিশ্বে সংক্ষিপ্ত আকারে ছয়টি ভাগে কাজ করেছে। এ ভাগও quantum পদ্ধতিতে হয়েছে। এই ছয় ভাগ, দেহের মধ্যে ষট্‌চক্র নামে চিহ্নিত। সহস্রার থেকে ইচ্ছা-তরঙ্গ ছড়িয়ে পড়ে মূলাধারে এসে অবশিষ্ট ক্ষমতা নিয়ে কুণ্ডলিকৃত বস্তুরূপ নিয়েছে। শক্তির শেষ নেই। বস্তুরূপ সৃষ্টি করে আর অগ্রসর না হয়ে তার মধ্যেই সে ঘুমিয়ে পড়েছে। সেই ঘুমন্ত শক্তিকে যদি জাগরিত করে বিপরীত গতিতে কেন্দ্রাভিমুখে পাঠানো যায় তাহলে আবার সে পরমপুরুষের সঙ্গে মিলতে পারে। তন্ত্রসাধকরা এই কাজই করেন। তাঁরা দেহের শেষ প্রান্তে মূলাধারে এসে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়া শক্তিকে জাগরিত করে সহস্রার অভিমুখী করেন। সেইজন্য এই আচারকে বামাচার বলে। এই বামাচারের উপরই তন্ত্রের সর্বোৎকৃষ্ট গান রচিত হয়েছে।

নিবিড় কৌতূহলে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম—কোন্ গান?

—সেই যে 'এবার কালী তোমায় খাব'?

জিজ্ঞাসা করলাম, এ গানের অর্থ কি? সত্যিই এ গানের অর্থ আমরা বুঝি না।

ভদ্রলোক বললেন, এ হল বামাচারী তন্ত্রসাধনার গান।

—কী রকম?

—যে শক্তি বিশ্বপ্রকৃতি হয়েছেন, সাধক সেই শক্তিকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিয়ে পরমাত্মনের সঙ্গে মিশতে চান।

কী ভাবে?

—মূলাধারস্থ কুলকুণ্ডলিনী-শক্তিকে জাগরিত করে সাধক একের পর এক ষট্‌চক্র ভেদ করে সহস্রারের দিকে এগিয়ে যান। এক একটা স্তর ভেদ করেন আর এক একটা স্তরের প্রকৃতিকে তিনি আত্মস্থ করেন অর্থাৎ গ্রাস করেন। প্রকৃতিকে গ্রাস করার এই অভীপ্সাই হল সাধকের বড় অভীপ্সা। এই জন্যই রামপ্রসাদ বলেছেন, 'এবার কালী তোমায় খাব'। অর্থাৎ ব্রহ্মাণ্ডকে আত্মসাৎ করব।

সত্যিই অভুতপূর্ব এ ব্যাখ্যা শুনে আমি বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলাম। ভদ্রলোক আমার দিকে তাকালেন,—এবার আমাদের প্রতিমার অর্থ বুঝলেন? আমরা যে মূর্তিপূজারী নই, বুঝলেন?

বললাম, হ্যাঁ। এবার দয়া করে আমাকে দুর্গার অর্থ বলবেন?

ভদ্রলোক একটু হেসে আমার দিকে তাকালেন, তারপর বলতে লাগলেন—'দুর্গা' শব্দের অর্থ জানেন?

—বললাম, দুর্ভেদ্যা।

—হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন। 'দুর্গ' শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ হল দুর্গা। 'দুর্গ' হল দুর্ভেদ্য। সুতরাং দুর্গা শব্দের অর্থ দুর্ভেদ্যা। ইনিই মহাশক্তি। মানুষের মধ্যে মহাশক্তির চূড়ান্ত অভিব্যক্তি হলে তিনি 'দুর্গা' রূপে প্রতিভাত হন। তাঁরই এক নাম তখন পার্বতী। তিনি পশুরাজ সিংহারূঢ়া। তিনি ত্রিশূল দ্বারা অসুরকে শাসন করছেন। তাঁর এক দিকে লক্ষ্মী, একদিকে বিদ্যাদেবী সরস্বতী, একদিকে জ্ঞানরূপ গণেশ, অপর দিকে বীর্যরূপ কার্তিকেয়। এর একটা গভীর তান্ত্রিক তাৎপর্য আছে।

—কী রকম?

ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, পর্বত কাকে বলে জানেন?

বললাম, উত্তুঙ্গ স্থানকে পর্বত বলে।

—মানুষের মধ্যে উত্তুঙ্গ স্থান কোন্‌টা?

—মস্তিষ্ক।

তিনি মস্তিষ্কের ব্রহ্মরন্ধ্রে হাত দিয়ে বললেন, এইখানে।

বললাম, তাহলে এই স্থানকেই আপনি পর্বত বলতে চান?

—হ্যাঁ। মানুষের দেহে কোথায় শক্তি স্থির হয়ে আছে জানেন?

—মূলাধারে।

—সেই শক্তি যদি সহস্রারে আসেন? তাহলে তিনি কী হন?

জবাব দিতে না পেরে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

ভদ্রলোক বললেন, পর্বত আশ্রয়ী হলে তাকে কি বলা যায়?

বুঝতে পেরে আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে বললাম, পার্বতী।

—ঠিক ধরেছেন।

—এই হল তাহলে পার্বতীর অর্থ?

—হ্যাঁ।

—তিনি যে সিংহের উপর অধিষ্ঠিতা, এর অর্থ কি?

ভদ্রলোক জিজ্ঞাসা করলেন, সিংহকে কি বলা হয়?

বললাম, পশুরাজ৷

—মানুষকে কী বলে?

অবাক হয়ে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম, কি বলব! মানুষ!

ভদ্রলোক হেসে বললেন, না। মানুষও যথার্থই পশু। যে জীব পাশ দ্বারা আবদ্ধ তাকেই বলে পশু। যে পশু সেই পাশমুক্ত হতে পারেন তিনিই পশুরাজ। মানুষের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মানুষই পশুরাজ হতে পারেন, পাশমুক্ত হতে পারেন। তিনি পাশমুক্ত পশুরাজ হলে তাঁর উপর নির্ভর করেই শক্তি দাঁড়াতে পারেন। এই জন্যই দেবী সিংহের উপর অধিষ্ঠিতা।

সত্যিই আমার বিস্ময়ের কোনো সীমা থাকল না। আমি বাক্ হারিয়ে সেই ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

ভদ্রলোক বললেন, তিনি মহিষাসুরকে বধ করছেন কেন জানেন?

—বলুন?

—মহিষাসুর কে, বলতে পারেন?

—না।

—মহিষাসুরও আসলে একটি ভাবের প্রতীক।

—কি রকম?

—মহ্+ঈষ্ হল মহিষ। দীর্ঘ ই (ঈ) এবং তালব্য স হল 'শ'। এই ঈশ হল ঈশের বা ঈশ্বরের মূর্ধ্বা-উষ্মা অবস্থা। শিবই মহা+ঈশ। বিশ্বশক্তির নিয়ন্ত্রণ-ক্রিয়ার মহা বা শ্রেষ্ঠ দেবতা। তিনিই এই জন্য মহেশ বা মহেশ্বর। এই ঈশ্ ক্রিয়া যখন মূর্ধ্বা-উষ্মা Kinetic energy level প্রাপ্ত হয় তখন হয় ঈষ্ এবং তখনই আর রুদ্ধ না থেকে ইষু হয়ে ছুটে যায়। এই ঈশের মহ বা মহত্ত্বযুক্ত ভাব—মহিষ, সর্বদা অস্থির, ছুটে যাবার জন্য উন্মুখ (অস+উ) এবং অগ্নিশক্তি (র) যুক্ত। একেই বলে অসুর। এই মহিষ সৃষ্টিক্রিয়া রক্ষায় বিঘ্ন সৃষ্টি করে বলে চণ্ডী তাকে প্রথমেই বধ করেন।

ঈশের শক্তি তমগুণ-সম্পন্ন হলেই ইষ্ হয়। সৃষ্টিতে সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের কোনো একটি যদি গুণসাম্য হারিয়ে অত্যন্ত বেশি প্রবল হয়ে ওঠে তাহলে সৃষ্টিতে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়! সুতরাং সৃষ্টি রক্ষার জন্য গুণ-সাম্যের প্রয়োজন। দেবী তাকে যে ত্রিশূল দিয়ে আঘাত করছেন, সেই ত্রিশূল সত্ত্ব, রজঃ ও তম গুণের প্রতীক।

এ ব্যাখ্যা শুনে আমার মুখে কোনো কথা থাকল না। জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা এই মহাশক্তির চতুর্দিকে লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ ইত্যাদি কেন?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, এ তো অত্যন্ত সহজ জিনিস।

—কী রকম?

—মানুষের মধ্যে যখন শক্তির যথাযথ জাগরণ হয়, তখনই তার চতুর্দিকে জ্ঞান, বীর্য, বিদ্যা ও ঐশ্বর্য ফুটে উঠে। সেইজন্যই এই মূর্তিগুলির ব্যবস্থা।

জিজ্ঞাসা করলাম, আচ্ছা, শিব কেন পেছনে লুকিয়ে থাকেন?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, এটা হিন্দুদের কল্পনা। পুরুষ ছাড়া তারা প্রকৃতিকে কল্পনা করতে পারেন না বলেই এই ব্যবস্থা। শিব এখানে নির্গুণ-ব্রহ্মের প্রতীক হিসেবে বিরাজ করেন। সৃষ্টিক্রিয়া তো চিরন্তন নয়। সৃষ্টি হলেই তার লয় আছে। শক্তি মায়া হিসেবেও বর্ণিত। যদিও সত্ত্ব ও রজঃ গুণের আধিক্য হেতু জগৎকে তিনি ধ্বংস হতে দেন না, তবুও তম গুণের প্রাধান্য হেতু জীবকে তিনি সহজে মুক্তিও দেন না। যে সাধক বামাচারী সাধনার দ্বারা শক্তিকে জয় করে পরম নির্গুণ পুরুষে নিয়ে যেতে পারেন তিনি মাতৃঘাতী সন্তান। তিনিই রামপ্রসাদ, কালীকে খেয়ে ফেলেন। বিজয়া আর কিছুই নয়, মায়া-শক্তির বিসর্জন। মায়া-শক্তি বিসর্জিত হলেই নির্গুণ ব্রহ্মণ বা শিব স্বকীয় সত্তা লাভ করেন। এই মোহমুক্তিই হল পরম আনন্দের বিষয়। এই জন্যই দশমীতে বিসর্জনের পরে এত কোলাকুলির ব্যবস্থা।[১]

অবাক হয়ে বললাম, সত্যি, হিন্দু হয়ে আমরা এ-সব কিছুই জানি না।

ভদ্রলোক বললেন, তবে আমি যা বললাম এ তত্ত্ব হল আরোপিত তত্ত্ব। হিন্দুরা পরে আরোপ করেছেন। আদিতে চণ্ডী-কল্পনাতে শিব বা পরম পুরুষেরও স্থান ছিল না। চণ্ডী স্বয়ংই ব্রহ্মস্বরূপা। তাঁর থেকেই সৃষ্টি। তন্ত্রে শিব শ্রেষ্ঠ। চণ্ডীতে চণ্ডীই শ্রেষ্ঠ। সম্ভবত মহাযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে বৌদ্ধদের মধ্যে যে প্রজ্ঞাপারমিতা-তত্ত্বের উদ্ভব হয়েছিল, তার প্রভাবেই চণ্ডীর উদ্ভব। সেখানে বুদ্ধের চেয়ে প্রজ্ঞাশক্তিই প্রবলা। প্রজ্ঞা হল নিষ্ক্রিয়, শূন্যতা, সমস্ত কিছুর মূল উৎস। সক্রিয় শক্তি হল উপায়, যাকে বৌদ্ধরা 'করুণা' হিসেবে বর্ণনা করেছেন। বৌদ্ধদের প্রজ্ঞা বা স্ত্রীশক্তিই হল হিন্দুদের নির্গুণ ব্রহ্মণ স্বরূপ। আর পুরুষশক্তি হল প্রকৃতি রূপ। এই শূন্যরূপা প্রজ্ঞা থেকে পুরুষরূপ প্রকৃতির উদ্ভব। বৌদ্ধরা এই প্রজ্ঞা ও উপায়কে ইড়া ও পিঙ্গলা নাড়ির সঙ্গে তুলনা করেছেন। এই দুইকে একত্র করে অবধূতিকা বা সুষুম্না নাড়ি দিয়ে ঊর্ধ্বগতি করলে পরম শূন্যতায় যাওয়া যায়। বোধিচিত্ত এইভাবে সুষুম্না নাড়ি দিয়ে ঊর্ধ্বমুখে মহাশূন্যতার দিকে অগ্রসর হয়। এবং একে একে নির্মাণকায়া, ধর্মকায়া ও সম্ভোগকায়া পার হয়ে সহস্রারের মহাশূন্যতায় মিশে যায়। হিন্দুরা যেমন মূলাধার

---

১. বৈজ্ঞানিক ভাবে বিচার করলে দুর্গা হলেন ten dimensions, awaiting below the curled up 51 dimensions to come down to the level of 4 dimensional universe, as the river high up the mountain awaits to come to go to the sea.

থেকে আরম্ভ করেন, বৌদ্ধরা মণিপুর চক্র থেকে আরম্ভ করেন। মণিপুর চক্রে সম্ভোগকায়া। হিন্দুরা যেমন আজ্ঞাচক্র থেকে সহস্রারে যান, বৌদ্ধরা যান বিশুদ্ধ চক্র থেকে। পুরুষ এই ভাবে সহস্রারে গিয়ে শূন্যতা ও প্রজ্ঞার সঙ্গে একীভূত হলে পুরুষ ও শক্তির মিলন হয়। অর্থাৎ প্রকৃতি ও শূন্যতার মিলন হয়। একেই বৌদ্ধরা বলেন 'যুগনদ্ধ' অর্থাৎ তন্ত্রের মৈথুন। বৌদ্ধদের এই যে মহাশূন্যতা কল্পনা, তাই সম্ভবত চণ্ডীতত্ত্বের মূল প্রেরণা। চণ্ডীতে তাই দেবীকে সর্বোত্তম বলে গণ্য করা হয়েছে। তবে হিন্দুরা এই ধরনের চিন্তাধারাকে প্রশ্রয় না দিয়ে শিব কল্পনা করে নিয়েছেন। হিন্দু ধারণা মতে সমগ্র চণ্ডীকেই সুন্দর ভাবে ব্যাখ্যা করে নেওয়া যেতে পারে, জানেন?

—'কী রকম?' উৎসুকভাবে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকালাম।

তিনি বললেন, দেখুন, চণ্ডীতে প্রথম যে সৃষ্টি-তত্ত্বের বর্ণনা, তা সুন্দরভাবে হিন্দু যোগ-তত্ত্বের সঙ্গে মিলে যায়।

সাগ্রহে ভদ্রলোকের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, দেখুন চণ্ডীতে কারণ-সমুদ্র থেকে সৃষ্টি, এইরূপ বলা হয়েছে। প্রলয়কালে পৃথিবী (অর্থাৎ সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড) উৎসে ফিরে গেলে সচ্চিদানন্দের 'সৎ' রূপই শুধু বিরাজ করে। কিন্তু 'সৎ' রূপ চিরস্থায়ী নয়। তাতে অস্তিত্ব বোধের চৈতন্য আসে। তখন ইচ্ছাশক্তি জাগরিত হয় (আনন্দ অংশ)। ইচ্ছাই হল শক্তি। শক্তিকে হিন্দুতন্ত্রে সর্প হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। সেই শক্তি অনন্ত। সেইজন্য তিনি অনন্ত নাগ হিসেবে চিহ্নিত। সেই ইচ্ছার মধ্যে সৃষ্টির বীজ সুপ্ত থাকে। সৃষ্টির বীজই হলেন বিষ্ণু। তিনি গুণসাম্যে আত্মবিস্মৃত থাকেন অর্থাৎ যোগনিদ্রায় থাকেন। সাধক ধ্যানস্থ হলে যখন সমস্ত গুণাবলী নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে তখনই বোধহীন যোগনিদ্রায় তিনি আচ্ছন্ন হন। কিন্তু এই অবস্থা স্থায়ী নয়। ফলে গুণসাম্যে ক্ষোভ দেখা দেয়, সৃষ্টি আরম্ভ হয়। সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ নাদে।[১] পরে বিশুদ্ধ চক্রে এসে তাতে বোধযোগ্য আলোড়ন হয়। সেই আলোড়ন সম্প্রসারিত হতে হতে সৃষ্টির প্রথম উপাদান 'অণু'র জন্ম হয়। এই আণবিক স্তর হল মণিপুর চক্রে। সুতরাং আজ্ঞা চক্র ও বিশুদ্ধ চক্রের মাঝখান থেকে সৃষ্টির শিহরন (বিষ্ণুর কর্ণমূল থেকে মধুকৈটভের উদ্ভব) মণিপুর চক্রে মেঘরূপ ধারণ করে। এই আণবিক আকাশে অর্থাৎ সৃষ্টিশক্তির প্রতীক বিষ্ণুর নাভিতে অর্থাৎ মণিপুর চক্রে সৃষ্টির প্রথম প্রকাশ পদ্ম রূপে। তারই উপর বিষ্ণুর স্রষ্টাশক্তি ব্রহ্মা উপবিষ্ট থাকেন! এই চক্রে এসে সৃষ্ট জীবের তিন গুণের মধ্যে রজঃ ও তম গুণের আধিক্য দেখা দেয়। তখন মধু ও কৈটভ তম-গুণের জীব হিসেবে গুণসাম্য ধ্বংস করতে উদ্যত হয়। সেই সময় সৃষ্টি-শক্তির প্রতীক বিষ্ণুর যোগনিদ্রা ভঙ্গ হয়। তিনি তখন এই অসুরদ্বয়কে বধ করে সৃষ্টি রক্ষা করেন। এবং এই দুইকে বধ করে সৃষ্টির নানা পর্যায় তৈরি করেন। তম-

১. Sound of the first explosion in Big Bang.

গুণের আধিক্য সব চাইতে বেশি জড় বস্তুতে। কিন্তু এই শক্তি নিষ্ক্রিয় হলে আর জগৎ-ধ্বংসকারক হতে পারে না। বিষ্ণু মধু ও কৈটভকে হত্যা করে কারণ সলিলে প্রথম জড় জগৎ সৃষ্টি করেন।[১] এই জড় জগতের উপর জীবনের সৃষ্টি হয়। এরপর আবার মহিষাসুর[২] প্রবল হয়ে উঠলে তিনি তাকে ত্রিশূল[৩] দ্বারা সংযত করে সৃষ্টিতে সাম্য রাখেন। তারপর শুভ ও নিশুম্ভ কোনো এক সময় তামসিক গুণসম্পন্ন হয়ে সৃষ্টিতে ব্যাঘাত সৃষ্টি করলে মহাশক্তি জাগরিত হয়ে নিরালম্ব ক্ষেত্রে তাদের হত্যা করে সৃষ্টি রক্ষা করেন। এইভাবে জগতের সৃষ্টি ও স্থিতি চলে। চণ্ডীতে এইভাবে সৃষ্টি-রহস্যের বর্ণনা করা হয়েছে।

অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি এতসব জানলেন কী করে?

তিনি একথার কোনো জবাব না দিয়ে বললেন, আপনিও একসময় জানবেন। এখন শুনুন, আর একটি মূর্তির কথা আপনাকে বলছি।

—কোন্ মূর্তি?

—রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি।

—'বলুন'। আগ্রহে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তিও হল পুরুষ এবং প্রকৃতির কথা। যা শিবলিঙ্গ তাই পুরুষ এবং প্রকৃতি। তবে শিবলিঙ্গের চেয়ে আরও একটু স্পষ্ট হল রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তি। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মাণের 'সৎ' অংশে যখন অস্তিত্ব বোধরূপ চৈতন্য হয় তখন নিজেকে নিজে উপভোগ করার ইচ্ছা জাগে। উপভোগ করার ইচ্ছা আসে আনন্দ লাভ করার জন্য। এই যে 'সৎ' রূপ সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মাণের অংশ, এই অংশে সত্ত্ব, রজঃ ও তম এই তিন গুণের বিক্ষোভ হলে সেই পরম অস্তিত্বের চৈতন্যে আলোড়ন হয়। শাক্ত তন্ত্রে এই অংশকে বলা হয়েছে 'নাদ'। শাক্ত তন্ত্রে বা শৈব তন্ত্রে নাদ পর্যায়ে পরম পুরুষের সঙ্গে একাত্মভাবে শক্তির উদয় হয়। বৈষ্ণব মতেও তাই। ইচ্ছা বা ভালবাসার জন্য ইচ্ছার অভিঘাতে পরমপুরুষে যে তিনটি গুণক্ষোভ হয়, সেই তিনটি গুণক্ষোভ হয় বলে পরমপুরুষ ত্রিভঙ্গ হন। তাঁর সঙ্গে একাত্মভাবে প্রকৃতি শ্রীরাধিকারূপে প্রকাশমানা।[৪] পরমপুরুষের হাতে বাঁশি থাকার কারণ,

---

১. মধু কৈটভ behaviour of the particles in sub-atomic level. এদের ছন্দের মধ্যে ধরাই হল মধু-কৈটভ বধ। তখনই Rhythmic স্থূল জগৎ তৈরি হয়।

২. Excessive kinetic energy which is centrifugal in nature and brings about disorder in the universe.

৩. ত্রিশূল সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিন গুণের প্রতীক।

৪. এই ত্রিভঙ্গ হল তিন গুণ—সত্ত্ব, রজ ও তম। বৈদিক তাও প্রতীকেও এই তিনগুণের প্রতি ইঙ্গিত আছে। বিজ্ঞানের ভাষায় এই তিনগুণ হল Three fundamental particles of the universe.

ভালবাসার প্রয়োজনে তাঁর মধ্যে ইচ্ছার অভিঘাত হলে এক ধরনের নাদ হয়। সাধারণত এই নাদ অশ্রুত। তবে সাধক যখন ষট্‌চক্র ভেদকালে আজ্ঞা চক্রে যান, তখন সেখানে তিনি স্বতোৎসারিত ওঁ-কার নাদ শুনতে পান। এই নাদ অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও মধুর। পুরুষের মধ্যে ইচ্ছার অভিঘাত হলেই এই নাদ হয়। সেই জন্য শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাঁশি রয়েছে। এই বাঁশির ষড়রন্ধ্র মানবদেহরূপ বিশ্বের ষট্‌চক্র। এই যে একটা গুহ্য ভাব এই ভাবকেই ভারতীয় শিল্পীরা রাধা কৃষ্ণের যুগল মূর্তিতে রূপ দেখার দেবার চেষ্টা করেছেন।

কথা শেষ হলে ভদ্রলোকের মুখের দিকে আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকলাম। লেখাপড়া আমিও যে খুব একটা কম করেছি তা নয়। অ্যাকাডেমিক লেখাপড়ার বাইরেও লেখাপড়া করেছি, যেহেতু লেখক হবার জন্য আমার মধ্যে একটা আকুতি রয়েছে। ধর্মগ্রন্থও যে পড়িনি তা নয়। Philosophy-র প্রতি এমনিই আমার একটা দুর্বলতা আছে। সে জন্য পশ্চিমী মেটাফিজিক্স থেকে ভারতীয় দর্শন সবই পড়েছি। কিন্তু এমন গভীর ভাবে কোনো জিনিসের মধ্যে যেতে পারিনি। ভদ্রলোকের নিবিড় বোধশক্তি সত্যই আমাকে মুগ্ধ করে দিল যেন। বললাম, আমার অপরিসীম সৌভাগ্য যে, কোনারক এসে আপনার মত লোকের সাক্ষাৎ পেলাম। তা না হলে এ-সব দেখা হয়তো অর্থহীন হয়েই থাকত।

স্তুতিতে অনেকের মধ্যেই গর্বের ভাব ফুটে উঠে। কিন্তু ভদ্রলোকের মধ্যে তেমন কোনো ভাব দেখতে পেলাম না। বললেন, আমরা কেউ কাউকে কিছু জানাতে পারি না! যে পাত্র যেভাবে তৈরি হয় সে পাত্র সেই ভাবেই কাজে লাগে। ফুটো কলসীতে জল ধরে না। পাত্র সঠিক তৈরি হলে, লোকে তাকে প্রয়োজনে কিনে নিয়ে গিয়ে জল রাখে। সব কাঁচের পাত্রে গরম দুধ ধরে না। যে পাত্র যোগ্য নয় সে পাত্রে গরম দুধ ঢাললে তা ফেটে যায়। যে পাত্র উপযুক্ত সে পাত্রে দুধ ধরে। আমরা বলবার কেউ নই। আসলে বলার লোকের চাইতে শোনার লোকের মূল্য বেশি। আপনি শোনার উপযুক্ত হয়ে তৈরি হয়েছেন বলেই শুনছেন। না হলে শুনতে পেতেন না।

জিজ্ঞাসা করলাম, আমি যে উপযুক্ত তাই বা বলবে কে?

ভদ্রলোক হেসে বললেন, পাত্র চিনবার ক্ষমতা ভগবান আমাদের দিয়েছেন।

কৌতূহলী হয়ে ভদ্রলোকের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

ভদ্রলোক বললেন, জানেন, আপনার সময় হয়েছে বলেই মহাশক্তির ইচ্ছায় আপনার কাছে এসেছি।

—আমার সময়!

—হ্যাঁ।

—আমার কিসের সময়?

ভদ্রলোক বললেন, আপনি হচ্ছেন কাদায় পড়ে থাকা সোনা। নিজেকে চিনতে পারছেন না। আপনার মধ্যে অপরিসীম ক্ষমতা রয়েছে।

বেশ কৌতূহল বোধ করে ভদ্রলোকের দিকে তাকালাম।

ভদ্রলোক বললেন, পূর্বজন্মে আপনি তন্ত্র-সাধনায় বহুদুর এগিয়েছিলেন, এ জন্মে সেই সাধনাকে আরও এগিয়ে নিতে এসেছেন। তবে সময় হয়নি বলে আপনি নিজেকে চিনতে পারেন নি। এবার সময় হয়েছে।

—সময় হয়েছে!

—হ্যাঁ। আপনি বাড়ি ফিরে গিয়েই কতকগুলি অদ্ভুত ইচ্ছার বশবর্তী হবেন। সেই ইচ্ছাই ধীরে ধীরে আপনাকে ভিন্ন এক জগতে নিয়ে যাবে।

ভদ্রলোকের মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। তিনি কি বলছেন বুঝতে পারলাম না। ভদ্রলোকও আমার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন। তিনি কী দেখছিলেন যেন। বেশ খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা আপনি খুব রোমান্টিক, না?

লজ্জিতভাবে বললাম, কিছুটা তাই।

—জীবনে বহু মহিলার সঙ্গে আপনার পরিচয় হবে।

আমি কোনো জবাব দিলাম না।

—কিন্তু—

—কিন্তু?

—মহিলারা আপনার পক্ষে যন্ত্রণারই কারণ হবে, আর কিছু নয়।

—কেন?

—মহামায়ার এক অংশ হল নারী-প্রকৃতি। অপর অংশ পুরুষ-প্রকৃতি। নারী-প্রকৃতি মায়ায় আচ্ছন্ন করে সৃষ্টির মধ্যে জীবকে ডুবিয়ে রাখে। নইলে সৃষ্টি রক্ষা পেত না। কিন্তু কিছু কিছু লোক আছে যাদের মায়ায় আচ্ছন্ন করে রাখা যায় না। সবাই মায়ায় আচ্ছন্ন হলে পৃথিবীতে তম গুণের আধিক্য হত। কোনো একটি গুণের প্রচণ্ড আধিক্য হলেই গুণসাম্যের অভাব হয়ে সৃষ্টি ধ্বংস হয়ে যায়। সত্ত্বগুণের আধিক্য হলে সৃষ্টি কর্মহীন হবে, মোক্ষপ্রাপ্ত হবে, যে নিত্যলীলার প্রয়োজনে সচ্চিদানন্দের 'সৎ' অংশ সৃষ্টি রূপে আবির্ভূত হয়েছেন, তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। রজঃ গুণের একাধিপত্য হলে ক্ষাত্রকলহে পৃথিবী ধ্বংস হবে। তমগুণের আধিক্য হলে মহিষাসুর পৃথিবী নাশ করবে। এইজন্য প্রকৃতি সাম্যরক্ষার জন্য কিছু কিছু জীবের মধ্যে তমগুণ অধিক দিলেও, কিছু লোকের মধ্যে দেন রজঃগুণ। আবার কিছু লোকের মধ্যে দেন সত্ত্বগুণ। আপনার মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য আছে। কিন্তু একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত রজঃ ও তমগুণেরও প্রভাব থাকবে। তারপর সত্ত্বগুণ যখন প্রবল হবে, তখন রজঃ ও তমগুণ তাকে টেনে নিচে রাখতে চাইবে। কারণ পূর্ণ সত্ত্বগুণের প্রভাব হলে যে-কর্মের জন্য আপনার

জন্ম, সে কর্ম আপনি করতে পারবেন না। এই রজঃ ও তমগুণ আপনার মধ্যে দুটি ভাবে খেলা করবে—নাম ও যশের আকাঙ্ক্ষা এবং নারীপ্রীতি। ভালবাসার আকাঙ্ক্ষা থেকে হবে নারী-প্রীতি। নারীর সৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। পুরুষের মত পুরুষ হতে চাইবেন, খ্যাতিমান হতে চাইবেন। তার ফলে রজঃগুণ প্রবল হবে। কিন্তু সত্ত্বগুণ একাই রজঃ ও তমগুণ থেকে আপনার মধ্যে বেশি ক্ষমতাশালী। ফলে রজঃ ও তমগুণ সিদ্ধ হবে না। শেষপর্যন্ত সত্ত্বগুণই সফল হবে। তবে সেটা হবে পায়ে পাথরবাঁধা পায়রার আকাশে ওড়ার মত। কিছুদূর উঠে পাথরের ভারে আবার নামতে হবে, আবার উঠতে হবে। এই ভাবে একদিন পায়ে বাঁধা পাথরটা ছিঁড়ে পড়ে গেলে আকাশে উঠে যাবেন।' এইটুকু বলেই ভদ্রলোক আবার একদৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে কি দেখলেন। তারপর আপন মনেই একটু হাসলেন। বললেন, মহামায়ার কি অপূর্ব খেলা। যাকে ভালবাসেন তাকেই বেশি কষ্ট দেন। মহামায়া মাতৃঘাতী সন্তানকেই সব চেয়ে বেশি ভালবাসেন। কষ্ট দিয়ে তাকে মাতৃহননে উদ্যত করেন।

ভদ্রলোকের কথা শুনে আমার মুখে যেন কোনো বাক্য থাকল না। আমি শুধু অবাক হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। ভদ্রলোক বললেন, দেখুন, পৃথিবীটা মহামায়ার একটা প্রতীক মাত্র। কোনো জিনিস যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি এড়িয়ে উপরে উঠতে চায়, পৃথিবী তাকে বেশি করে টানে। তেমনি প্রকৃতিকে অতিক্রম করে কেউ যদি মোক্ষে পৌঁছাতে চায়, প্রকৃতিও তাকে নিজের মধ্যে আটকে রাখতে চেষ্টা করে। লোভ দেখায়, ভয় দেখায়, বিপর্যয়ের মধ্যে ফেলে। সাধক যখন এ-সব গ্রাহ্য না করে নিজের অভীষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যান, শেষপর্যন্ত মহামায়া হাল ছেড়ে দেন। সেই সাধকের কাছে মহামায়া তখন মৃত বলে প্রমাণিত হন। মহামায়া বা প্রকৃতি সাধকের অন্তরস্থ হয়ে যান। রামপ্রসাদের মত সাধক তখন কালীকে খেয়ে ফেলেন, অর্থাৎ মূলাধারস্থ ঘুমন্ত শক্তিকে আত্মস্থ করতে করতে আজ্ঞাচক্র ভেদ করে, মায়ার জগৎ অতিক্রম করে সহস্রারের মধ্যে মিশে যান। প্রকৃতির লীলা শেষ হয়। সেইজন্যই সাধককে মায়ের সঙ্গে সংগ্রাম করতে হয়, যে-সংগ্রামের কথা মনে রেখেই সাধক কবি রসিকচন্দ্র রায় বলেছেন, 'আয় মা সাধন সমরে। দেখি মা হারে কি পুত্র হারে।' এই সংগ্রাম আপনার জীবনে এসে গেছে। সংগ্রাম করতেই হবে। ক্ষতবিক্ষত হবেন। কিন্তু ভেঙে পড়বেন না যেন। কারণ প্রকৃতিতে সাম্য রক্ষার জন্য আপনাদের মত মানুষের মধ্যে সত্ত্বগুণের জাগরণ প্রয়োজন।

অবাক হয়ে ভদ্রলোকের কথা শুনছিলাম। তিনি থামলে বললাম, অনেক কথাই বললেন, কয়েকটি কথা আপনি যথার্থই বলেছেন। সত্যি আমার মন রোমান্টিক, নারীপ্রীতি আছে। সেজন্য বড় হবার বাসনাও আছে। কিন্তু আমার মধ্যে অন্য কোনো শক্তি সুপ্ত আছে, এ তো আমি...

ভদ্রলোক হেসে বললেন, একটা বীজ কি জানে যে, তার মধ্যে বিরাট মহীরূহ ঘুমিয়ে আছে? মাটিতে পড়লে, উপযুক্ত পরিবেশ পেয়ে তার আত্মস্থ শক্তি বিকশিত হতে থাকে। সময় মতো আপনার সেই আত্মশক্তির বিকাশ আপনিই দেখতে পাবেন।

বললাম, আচ্ছা, আমি তো আমার মধ্যে সেই শক্তির কোনো পরিচয় পাই না। আপনি পেলেন কি করে?

ভদ্রলোক বললেন, কোন্ বীজে জন্ম দেবার ক্ষমতা আছে, সেটা বীজ জানে না, কৃষক জানে।

সত্যি! কথাগুলো ভদ্রলোকের আশ্চর্য। তাঁকে বোধহয় কথায় কেউ কখনও হারাতে পারবে না। জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি তো আমার মধ্যে একটা অধ্যাত্ম শক্তি লক্ষ্য করেছেন। কিন্তু গুরু ছাড়া এই অধ্যাত্ম শক্তির বিকাশ হবে কি?

ভদ্রলোক বললেন, গুরু তো সবাই। গুরু কোনো বিশেষ একটি ব্যক্তি নন। একটি চড়ুই পাখিও আপনাকে অনেক শিক্ষা দিতে পারে, একটি পিঁপড়েও। তবে আসল গুরু সেই পরমাত্মন। সেই পরমাত্মনের দরজা খুলে দেবার জন্য পার্থিব একজন গুরু থাকেন বটে।

আমি বললাম, হ্যাঁ, সেই গুরু না হলে আমার অধ্যাত্ম শক্তি ফুটবে কি?

ভদ্রলোক হাসলেন। বললেন, গুরু হলেন কৃষক, মাঠ যখন চাষের যোগ্য হয়ে ওঠে তখন তিনি লাঙল নিয়ে মাঠের কাছে যান। সুতরাং জানবেন, সময় হলে গুরুই শিষ্যের কাছে যান, শিষ্যকে গুরুর কাছে যেতে হয় না। আপনার ভেতরকার প্রাণশক্তিই আপনার সাধক-জীবনের ক্ষেত্র তৈরি করবে। সময় মতো এসে গুরু বীজ ছড়াবেন। মূল গুরুর প্রয়োজন হয় অনেক পরে। আগে ছোট ছোট গুরুর হাত ধরে এগোতে হয়। এ হল জাহাজ নিয়ে সাগরে যাবার মত। বড় নদীতে সাধারণ চালকেরাই জাহাজ চালায়। যখন জাহাজ সাগরের জলে এসে পড়ে তখন ক্যাপ্টেন এসে হাল ধরে, নইলে জাহাজডুবি হতে পারে। এগিয়ে চলুন না, মোহনার মুখে অনন্ত সাগরের নীলজলরাশি চোখে পড়তেই দেখবেন, বলতে হবে না, দায়িত্ববোধ থেকে ক্যাপ্টেন নিজেই এসে হাল ধরেছেন। এগিয়ে যান।

সাধারণত এধরনের কথা শুনলে আগে হেসে উড়িয়ে দিতাম। কিন্তু ভদ্রলোকের মধ্যে কী এক জাদুক্ষমতা আছে কি জানে! প্রত্যেকটি কথাই যেন প্রতিটি রক্তবিন্দুর মধ্যে চমক সৃষ্টি করে। আমি যেন বেশ কিছুক্ষণের জন্য অভিভূত হয়ে গেলাম। ভদ্রলোকের কী একটা প্রবল আকষর্ণী ক্ষমতা আমাকে আটকে রাখতে লাগল। মনে হল, আরও আরও অনেক কথা বলি ভদ্রলোকের সঙ্গে। কী একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলাম। বাইরে থেকে ঠিক সেই সময় একটা বাসের হর্ন বারবার বেজে উঠতে লাগল।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, সময় হয়ে গেছে, আপনার বাস আপনাকে ডাকছে।

চম্‌কে ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকাতেই দেখি—ঠিক সেই নির্দিষ্ট সময়, যে সময় বাসওয়ালা আমাদের ফিরে যেতে বলেছিল। ফেরার পথে সে আমাদের উদয়গিরি, খণ্ডগিরি ও ভুবনেশ্বরের লিঙ্গরাজের মন্দির দেখিয়ে নেবে। সুতরাং তারও সময় ঘড়িতে বাঁধা। ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলবার ইচ্ছা থাকলেও বলতে পারলাম না। শুধু জিজ্ঞাসা করলাম, আপনিও তো ফিরবেন?

ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, না।

—প্রয়োজন হলে আপনাকে....। কথাটা শেষ করার আগেই বাসের হর্নটা প্রবল ভাবে বেজে উঠল। যেন ধম্‌কে উঠছে বাসটা। বোধহয় সবাই ফিরে গেছে একমাত্র আমি ছাড়া। সুতরাং ইচ্ছে না থাকলেও বাইরের দিকে পা-বাড়াবার জন্য তৈরি হলাম।

ভদ্রলোকের মুখে অদ্ভুত হাসি যান, ওরা অধৈর্য হয়ে উঠেছে। দ্রুত বাস লক্ষ্য করে পা-বাড়িয়ে দিলাম।

ছয়

'লেখাপড়া করে যে, গাড়িঘোড়া চড়ে সে।' ছোটবেলা থেকে একথা পড়ে পড়ে মুখস্থ করে এলেও কটা ছেলে লেখাপড়া করতে চায়? অথচ গাড়িঘোড়া সবাই চড়তে চায়। কোনারকে দেখা সেই অদ্ভুত ভদ্রলোক আমাকে অদ্ভুত কয়েকটি কথা বলেছিলেন। তিনি স্পষ্ট করে আমাকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, মোক্ষের দিকে আমার অভিযাত্রা অনিবার্য। তবে এ পথে চলতে গেলে কিছু বিপর্যয়ের সম্মুখীন হব, তাও বলে দিয়েছিলেন। লেখাপড়া করিয়ে ছেলের মত কষ্ট করে যদি লেখাপড়া করি অর্থাৎ সেই বিপর্যয়ের পথটা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করি তাহলে যে সেই অভিযাত্রা অনেকটা সহজ হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি? কিন্তু সেই লেখাপড়া কিছুতেই আমার করা হয়নি। সুতরাং তার খেসারতটাও অবশ্যই দিতে হল। তাও বলছি

ভদ্রলোক বলেছিলেন, আমার চরিত্র রোমান্টিক। নারীপ্রীতি আছে। বহু মহিলার সঙ্গে পরিচয় হবে। কিন্তু কোনো মহিলাকেই জীবনে লাভ করার সম্ভাবনা আমার নেই। এ কথাটাকে যথার্থই যদি গুরুত্ব দিয়ে গ্রহণ করতাম তাহলে বোধহয় অযথা আমাকে কতকগুলি আঘাত পেতে হত না। লক্ষ্যস্থলের দিকে দুটো পথ গেছে, একটা কাঁটায় ছাওয়া, আর একটা ধূসর কিন্তু মসৃণ। কাঁটায় ছাওয়া পথটি দেখতে সুন্দর, ধূসর পথটি দেখতে রুক্ষ। যাঁরা এ পথের অভিযাত্রী তাঁরা হয়তো বলে দিলেন, কাঁটায় যাওয়া পথে যেও না, পায়ে কাঁটা ফুটবে, কিন্তু নয়ন ভুলানো দৃশ্য এমন বিমুগ্ধ করে দিল যে, শেষপর্যন্ত কাঁটায় ছাওয়া পথেই পা বাড়ালাম।

এরও হয়তো একটা প্রয়োজনীয়তা আছে। কাঁটা যে যথার্থই কাঁটা সেটা বোঝার জন্য বোধহয় কাঁটার আঁচড় খাওয়ার প্রয়োজন আছে। আঁচড়টা খেলে যেমন কাঁটার

চরিত্র বোঝা যায়, তেমনই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব কণ্টক বন এড়িয়ে যাবার ইচ্ছা জাগে। সেই জন্যই বোধহয় বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা হল জীবনে।

পুরী থেকে ফিরে এসে অফিসে কাজ করছি। কাজ এগোচ্ছে ভালভাবেই তখন কে জানত যে, অদৃশ্যে নিয়তি হাসছে! একদিন ডিরেক্টর সাহেবের ঘর থেকে ডাক এল। বয় এসে বলল, স্যার আপনাকে ডেকেছেন একবার।

—হ্যাঁ?

—হ্যাঁ স্যার! আপনার হাত খালি থাকলে এখনি একবার যেতে বলেছেন।

ফাইল গুটিয়ে উঠে পড়লাম। টিফিনের টাইমও হয়ে এসেছিল। এগিয়ে গিয়ে সাহেবের দরজা ফাঁক করে উঁকি দিলাম : আমায় ডেকেছেন স্যার? কি একটা ডিক্টেশন দিচ্ছিলেন স্যার। একজন মহিলা শর্টহ্যান্ডে ডিক্টেশন নিচ্ছিলেন। আমার কণ্ঠস্বর শুনে মুখ তুলে বললেন, 'এই যে মৃগাঙ্ক, এস, এস।' ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে পাশের একটি চেয়ার টেনে নিয়ে বসলাম।

ডিরেক্টর সাহেব বললেন, এক মিনিট মৃগাঙ্ক, ডিক্টেশানটা দিয়ে নি। তিনি তাঁর বিশেষ ভঙ্গিতে ডিক্টেশনের বাকি অংশটুকু শেষ করলেন। ডিক্টেশন শেষ হলে আমার সঙ্গে লেডি টাইপিস্টের পরিচয় করিয়ে দিলেন, ইনি মিস দত্ত, আরতি দত্ত। আমাদের অফিসে নতুন জয়েন করেছেন।

মিস দত্তকে নমস্কার জানালাম। এবার ডিরেক্টর সাহেব মিস দত্তকে আমার পরিচয় দিলেন, আমাদের পাবলিসিটি ডিপার্টমেন্টে আছে, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য।

প্রতি নমস্কার পেলাম মিস দত্তের কাছ থেকে। ডিরেক্টর সাহেব আমার আর একটি পরিচয় দিলেন তাকে, ওর আর একটা বিশেষ কোয়ালিফিকেশন আছে মিস দত্ত। ভাল লিখতে পারে!

ডিরেক্টর সাহেবের টেবিলের উপর তখন আমার নতুন প্রকাশিত বইটি ছিল। কোনারক দেখে এসে—'মিথুন' নামে বইটি লিখেছিলাম। পার্থিব জৈব মিথুন থেকে অধ্যাত্ম তান্ত্রিক মিথুন, সব তত্ত্বই তাতে ব্যাখ্যা করেছিলাম আমি। বলা বাহুল্য কোনারক প্রাঙ্গণে যে অদ্ভুত ভদ্রলোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল তিনিই আমার এই মিথুনতত্ত্বের উপর লেখায় প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিলেন। গ্রন্থটি প্রবন্ধ আকারে না লিখে একটি 'উপন্যাস' আকারে লিখেছিলাম আমি। ফলে বেশ আকর্ষণীয় হয়েছিল। কিছুটা আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল বাজারে তখন। সেই বইটি টেবিল থেকে উঠিয়ে মিস দত্তকে দেখালেন ডিরেক্টর সাহেব।

একটা মিষ্টি হাসি ফুটে উঠল মিস দত্তের মুখে। সেই প্রথম তার মুখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম আমি। রঙ খুব ফরসা নয়। মুখখানা গোলগাল। তেল না দেওয়ার জন্য লালচে চুল। তাতে একটু রুক্ষ দেখালেও, সৌন্দর্যের খুব একটা হানি হয়নি। চোখ দুটো খুবই উজ্জ্বল, একটু গোল ধরনের। মীনাক্ষী বলা যেতে পারে। স্বাস্থ্যের

বাঁধুনি খুবই ভাল। সর্বসাকুল্যে সমস্ত দেহে একটা অদ্ভুত আকর্ষণীয় লাবণ্য। ঠিক এই ধরনের একটা লাবণ্য দেখেছিলাম কলেজ জীবনে মহুয়ার মধ্যে। বলতে দ্বিধা নেই; মহুয়া যদি আমার সঙ্গে ভাব করতে চাইত, আমি ওকে প্রশ্রয় দিতাম। অঞ্জনার মধ্যে নারীর পেলবতা ছিল, কিন্তু যে-কোনো কারণেই হোক তা আমাকে আকর্ষণ করতে পারেনি। ইলোরার চোখে সুদূর নক্ষত্রলোকের ইশারা আমাকে মুগ্ধ করেছিল।

এক একটা মানুষের মধ্যে তার দৈহিক সৌন্দর্যের ঊর্ধ্বেও কী যেন একটা থাকে। সেই 'কী একটা' এক এক জনকে আকর্ষণ করে। হয়তো চারিত্রিক সামঞ্জস্য কিংবা বৈপরীত্য। বৈপরীত্যও হয়তো মানুষকে টানতে পারে। একজন মানুষের নিজের মধ্যে যা নেই, অপরের মধ্যে তা দেখলে সে আকর্ষণ বোধ করতে পারে বৈকি। সে যাইহোক অর্থাৎ আকর্ষণের .কারণ যাইহোক, এক এক জনকে প্রথম দর্শনেই ভাল লাগে। এক এক জনকে লাগে না। মিস দত্তের মধ্যে এমন একটা ভাব ছিল, যেটা সহজেই আমার ভাল লেগেছিল। তিনি যখন ডিরেক্টর সাহেবের হাত থেকে বইটা নিয়ে একবার নেড়ে দেখলেন, তারপর সপ্রশংস দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, তখন আমার মনে হয়েছিল, এমনি কোনো এপ্রিসিয়েশনের জন্যই বুঝি আমার নেশা; হৃদয় মথিত করে একটা স্পন্দন উঠেছিল আমার। মিস দত্ত বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলেন। তার পর ডিরেক্টর সাহেব আমার দিকে তাকিয়েছিলেন, মৃগাঙ্ক বইটা খুবই ভাল লাগল। তুমি মিথুন তত্ত্বকে যেভাবে প্রকাশ করেছ, তাতে নতুন ভাবে জীবনের দিকে তাকাতে ইচ্ছে করে। আমার এক বন্ধু, থিওসোফিকাল সোসাইটি করে, বলেছিল, ভদ্রলোক নিশ্চয়ই তন্ত্র করেন। এ-সবও কর নাকি তুমি?

বললাম, না স্যার, তন্ত্র করব দূরস্থান, তন্ত্র সম্পর্কে ভাল করে এখনও লেখাপড়াই শুরু করিনি। কোনারক দেখবার পরই, তন্ত্র সম্পর্কে আমার আগ্রহ জন্মেছে। সুযোগ পেলে তন্ত্র সম্পর্কে একটু জানবার চেষ্টা করব। ডিরেক্টর সাহেব বললেন, আমার মিসেস তো তোমার বই পড়ে জোর তাগিদ লাগাচ্ছে আমাকে, চল আর একবার কোনারক ঘুরে আসি। তা—একদিন চল না—

—কোথায়? ডিরেক্টর সাহেবের মুখের দিকে তাকালাম।

—বাসন্তী একদিন তোমাকে নিয়ে যেতে বলেছিল।

কে বাসন্তী বুঝতে না পেরে ডিরেক্টর সাহেবের মুখের দিকে তাকিয়েছিলাম।

হেসে ডিরেক্টর সাহেব বলেছিলেন, আমার স্ত্রী। তোমার বই পড়ে very much pleased. বললেন, একদিন নিয়ে এস না ওকে! যাবে?

বললাম, নিশ্চয়ই যাব স্যার একদিন।

—শনিবার হাফ ডে। ঐ দিন যাওয়া যাবে, কি বল?

—আচ্ছা স্যার।

সেদিন অফিস থেকে ফেরার পথে বাস স্ট্যান্ডে এসে দাঁড়িয়েছি, দেখি মিস দত্তও

সেখানে বাসের জন্য অপেক্ষা করছেন। আমায় দেখে উজ্জ্বল দৃষ্টিতে তাকালেন। মুখে মধুর হাসি। বিনিময়ে আমিও হাসলাম।

মিস দত্ত বললেন, আজ আমার সৌভাগ্য।

—কেন?

—এখানে আপনার দেখা পাব ভাবতে পারিনি।

—কেন?

—জানেন, আপনার সব বই আমি পড়েছি। আমার এত ভাল লেগেছে যে—কী বলব! বিশেষ করে আপনার শেষ বইটা সম্পর্কে আমার বিশেষ কয়েকটি প্রশ্ন আছে।

বললাম, বেশ তো, বলুন না।

মিস দত্ত বললেন, রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে?

হেসে বললাম, বেশ তো, চলুন না একটা চায়ের দোকানে বসা যাক। আপনার কোনো তাড়া নেই তো?

মুখে স্নিগ্ধ হাসি ফুটিয়ে মিস দত্ত বললেন, না।

—তাহলে চলুন।

কাছাকাছিই একটা রেস্টুরেন্ট ছিল। দু'জনে মিলে সেখানে উঠে একটা কেবিনে গিয়ে বসলাম।

মিস দত্ত বললেন ঃ কোনারকের আর্ট সম্পর্কে আপনার লেখা পড়েই প্রথম বুঝলাম। প্রশ্নটি আমার মনে অনেকদিন ধরেই ছিল। জবাব পাইনি। ভাবতাম, মন্দিরের গায়ে এই কুৎসিত চিত্র কেন। সেজন্য বইটি খুব ভাল লেগেছে। কিন্তু—

চা আর কাটলেট এসে গেল। এক প্লেট মিস দত্তের দিকে এগিয়ে দিলাম। মিস দত্ত বললেন, আবার এসব করলেন কেন?

বললাম, পাঠক বা পাঠিকার মধ্যে আপনিই প্রথম যিনি আমাকে সরাসরি আমার লেখা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছেন। সুতরাং আজকে আমার আনন্দ রাখবার জায়গা নেই।

হেসে মিস দত্ত বললেন, আমারও নিশ্চয়ই তাহলে আনন্দ হবে, কারণ, আমিই প্রথম পাঠিকা হিসেবে আপনাকে জিজ্ঞাসা করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। জানেন—

—বলুন।

—একজন লেখককে সামনাসামনি দেখবার আমার ভারি কৌতূহল ছিল।

—তাহলে দেখলেন?

—হ্যাঁ।

—অথচ আমি তেমন বড় লেখক নই।

—কেন? আপনার সম্পর্কে পাঠকের এখন অন্যরকম ধারণা।

হেসে বললাম, শোনবার সুযোগ হয় না। আপনার মুখে প্রথম শুনলাম। তা

কীরকম দেখলেন লেখককে?

কাটলেটে কাঁটা চামচ লাগিয়ে মিস দত্ত বললেন, আপনার লেখা পড়ে আপনার সম্পর্কে আমি একটা ধারণা করে নিয়েছিলাম।

—কী ধারণা?

—আপনি প্রচণ্ড লেখাপড়া করিয়ে লোক।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম, অনুমান কিছুটা সত্য হলেও সবটা ঠিক নয়।

—কেন?

—মাঝে মাঝে আমি বই-টই পড়ি বটে, তেমন ভাবে পড়ি না।

প্রতিবাদ করে উঠলেন মিস দত্ত, হতেই পারে না। আপনি মিথ্যে বলছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, আমাকে মিথ্যেবাদী ভাববার কারণ?

মিস দত্ত বললেন, আপনি যদি লেখাপড়া না-ই করবেন তাহলে এত জানলেন কী করে?

বললাম, সে এক অদ্ভুত রহস্য আমার জীবনে।

কৌতূহলের দৃষ্টি তুলে মিস দত্ত আমার দিকে তাকালেন।

বললাম, এক অদ্ভুত ভদ্রলোকের সঙ্গে কোনারকে আমার পরিচয় হয়েছিল। কোনারক সম্পর্কে যা কিছু তথ্য তিনিই আমাকে শুনিয়েছিলেন। অবশ্য আমিও যে ভারতীয় শিল্প সম্পর্কে একেবারে পড়িনি তা নয়। অনেক বই-ই পড়েছি। কিন্তু তাঁর মত এমন গভীরভাবে বুঝতে পারিনি। এর কারণ—

মিস দত্ত আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

বললাম, ভদ্রলোক যে শুধু পড়াশুনা করেছেন, তা নয়। তাঁর জীবনের আরও একটি দিকও আছে।

বেশ 'জমাট বেঁধে বসা' যাকে বলে, মিস দত্ত সেই ভাবে বসলেন। তারপর আমার দিকে তাকালেন সে দিকটি কী?

বললাম, ভদ্রলোক একজন সাধক।

—কী রকম?

—তন্ত্র-সাধক।

—সেকি! তন্ত্র-সাধকের লাল কাপড় পরা নেই!

—তান্ত্রিক সম্পর্কে আমারও আপনারই মত ধারণা ছিল। ভদ্রলোক সেই ধারণা ভেঙে দিয়েছেন। আমার বই পড়ে নিশ্চয়ই বুঝেছেন যে, তন্ত্র এক ধরনের উন্নত বিজ্ঞান?

—হ্যাঁ।

—শুধু বিজ্ঞান নয়, পরাবিজ্ঞান। তাঁর কথাগুলোই প্রকৃতপক্ষে আমার 'মিথুন' বইটিতে আমি উল্লেখ করেছি। অদ্ভুত ক্ষমতাশালী লোক। তিনি আমাকে কী বলেছিলেন, জানেন?

—কি? মিস দত্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

বললাম, ভদ্রলোক বলেছিলেন—ভারতীয় তন্ত্র-তত্ত্বের অনেক কিছুই নাকি একদিন আমার কাছে উদ্ঘাটিত হবে।

—কি করে?

—আমার নাকি পূর্বজন্মের একটা সাধনা ছিল এ লাইনে।

—আপনি পূর্বজন্মে বিশ্বাস করেন?

বললাম, হিন্দু বলে সহজাত বিশ্বাস থেকে জন্মান্তরে বিশ্বাস করি। কিন্তু বিচার-বিশ্লেষণ করতে গেলে কোনো হদিশ পাই না। আপনি পূর্বজন্ম বিশ্বাস করেন?

মিস দত্ত বললেন, জানেন, আমি এ নিয়ে কখনও খুব একটা মাথা ঘামাইনি। তবে একটি ঘটনা আমাকে চমকে দিয়েছে।

—কী?

—আমার মাসির ছোট মেয়েটি যেই কথা বলতে শিখল, সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভুত কথা বলতে লাগল।

কৌতূহলী হয়ে মিস দত্তের মুখের দিকে তাকালাম কি কথা?

—বলতে লাগল, এ বাড়ি আমার নয়। আমার বাড়ির সামনে বড় একটা পুকুর ছিল। বাড়িতে আমার বড় বড় দুটো কুকুর ছিল, সে সব কই?

—তাজ্জব তো!

—কোথায় বাড়ি ছিল, কীরকম বাড়ি, এ-সব বলতে পেরেছে?

—না। তাহলে তো ভেরিফাই করে দেখা যেত।

—ওর এসব কথা শুনে আপনার কী মনে হয়েছে?

—হয়তো মেয়েটি জাতিস্মর। অথচ আমার নিজের কিন্তু এসব পূর্ব-জন্মটন্ম সম্পর্কে তেমন আস্থা নেই। মানতে হয় মানি। ঠিক ঠাহর পাইনে। তবে ভাগ্য বলে একটা জিনিস আছে বলে আমার মনে হয়।

—কেন? মিস দত্তের মুখের দিকে তাকালাম।

মিস দত্তও আমার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বললেন, পরে বলব। এবার আপনি বলুন, ঐ ভদ্রলোক আপনাকে আর কী বলেছিলেন?

বললাম, সে অত্যন্ত মর্মন্তুদ ও ভয়াবহ।

—কী রকম?

একটু ইতস্তত করতে লাগলাম।

মিস দত্ত বললেন, বলতে কোনো বাধা আছে?

—না।

—বলুন।

বললাম, ভদ্রলোক আমাকে বলেছিলেন, আপনার চরিত্রের মধ্যে একটা

রোমান্টিকতা আছে।

মৃদু হাসলেন মিস দত্ত। চোখ দুটো একটু নামিয়ে নিলেন, তারপর বললেন, উনি ঠিকই বলেছেন।

হৃদ্‌পিণ্ড থেকে এক ঝলক রক্ত বোধহয় আমার মুখে উঠে এল।

মিস দত্তের মুখে আমার সপক্ষে এধরনের কথার অনুমোদন পেয়ে বেশ ভাল লাগল। বললাম, আপনারও তাই মনে হয়?

মিস দত্ত আবার আমার মুখের দিকে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, জানেন, আপনাকে আমি যখন ডিরেক্টর সাহেবের ঘরে প্রথম দেখলাম, দেখেই আমার মনে হয়েছিল, আপনি একটু আলাদা ধরনের লোক!

হেসে তাকালাম মিস দত্তের দিকে, কী রকম?

—আপনার মধ্যে একটা কিছু আছে।

—কী সেটা?

—সেটা তো একটু পরেই প্রমাণ পেলাম আপনার বই দেখে। ও কথা থাক, তারপর বলুন, ভদ্রলোক আপনাকে আর কী বলেছিলেন?

—বলেছিলেন...

মিস দত্ত আমার দিকে তাকিয়ে থাকলেন।

—বলেছিলেন, আপনার জীবনে বহু নারীর আবির্ভাব হবে।

মিস দত্ত চোখ নামিয়ে নিলেন।

—কিন্তু...

মিস দত্ত আবার আমার দিকে তাকালেন!

—কিন্তু মেয়েরাই নাকি আমার পক্ষে যন্ত্রণার কারণ হবে।

—কেন?

—এই আমার ভাগ্যে লেখা।

মিস দত্ত আমার দিকে তাকালেন কিছু যদি না মনে করেন তাহলে একটা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করব?

—বলুন?

—আপনার কি কোনো মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়নি? কোনো মেয়ে আপনাকে ভালবাসেনি?

বললাম, আমার সঙ্গে মেয়েদের প্রথম পরিচয় কলেজে যখন পড়াতে যাই, তখন।

—আপনি কলেজে পড়াতেন?

—হ্যাঁ। জানেন সেখানে একটি মেয়ে আমাকে ভালবেসেছিল। কিন্তু তার প্রতি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা আমার কখনও দেখা দেয়নি। অথচ মেয়েটি এমন করল যে—

—কী?

মিস দত্তকে মহুয়া আর অঞ্জনা যে আমাকে নিয়ে দামোদরে বেড়াতে গিয়েছিল সেই কাহিনি বললাম। এবং তার প্রতিক্রিয়া কি হয়েছিল তাও জানালাম।

মিস দত্ত জিজ্ঞাসা করলেন, মেয়েটি আর আপনার সঙ্গে দেখা করেনি?

—হ্যাঁ। কলকাতায় এসে দেখা করেছিল। কিন্তু আমি তাকে বারণ করে দিয়েছি।

মিস দত্ত কোনো কথা বললেন না, চুপ করে থাকলেন।

আমি বললাম, আমার ধারণা ছিল—নরনারীর মধ্যে ঘনিষ্ঠতা হয় চারিত্রিক একটা সামঞ্জস্যের জন্যে। একতরফা কারো কাউকে ভাল লাগে না। ভাল লাগাটা দু'তরফা ব্যাপার। কিন্তু অঞ্জনার ব্যবহারে আমার দীর্ঘ দিনের এ বিশ্বাসটা যেন ভেঙে গেছে।

মিস দত্ত বললেন, অঞ্জনার অল্প বয়েস বলেই এ ভুল হয়েছিল। সে থাক, এবার বলুন।

—আর কী বলব?

—ভদ্রলোক আর কিছু বলেননি?

—হ্যাঁ। বলেছিলেন, যত মেয়ের সঙ্গেই আপনার পরিচয় হোক না কেন, আপনি কাউকে পাবেন না।

—কেন?

—আমার ভাগ্য নাকি নির্দিষ্ট হয়ে আছে অধ্যাত্ম-সাধনার পথে যাবার জন্য।

—আপনি এ সবে বিশ্বাস করেন?

বললাম, মন বিশ্বাস করতে চায় না। দেখুন, এই পৃথিবীতে আমার আর কেউই নেই। আমি পরের কাছে মানুষ। আপন জনের জন্য নিশ্চয়ই আমার মধ্যে একটা আকুতি ছিল। কিন্তু ভদ্রলোকের কথা শুনে মনটা এমন হয়ে গেছে যে—

যেন মুখে একটা সহানুভূতির ছবি এঁকে মিস দত্ত আমার দিকে তাকালেন। বললেন, এ-সব বিশ্বাস করবেন না।

—কিন্তু একটি ঘটনা তো জীবনে ঘটেই গেল।

মিস দত্ত বললেন, তাতে আপনার তো বিন্দুমাত্র দোষ নেই।

একটু উদাসীন হয়ে গেলাম। বললাম, কি জানি! ভদ্রলোক কিন্তু বারবার আমাকে বলে দিয়েছেন, আমি যেন বিয়ে না করি। বিয়ে করলেও নাকি আমার সংসার-জীবন হবে না।

যেন প্রচণ্ড প্রতিবাদ করে উঠলেন মিস দত্ত, বাজে কথা। ভদ্রলোক আর কী বললেন, তাই বলুন!

বললাম, আর কিছু বলেননি। বাস এসে গেলে ভুবনেশ্বরের দিকে এগিয়ে যাই, আর কথা বলা হয়নি। হ্যাঁ, আমার বইটি সম্পর্কে আর আপনার কী জিজ্ঞাসা করার ছিল বলুন তো?

মিস দত্ত বললেন, আপনি মিথুন তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হিন্দু যোগীদের

ষট্‌চক্রের উল্লেখ করে এমন কতকগুলো কথা বলেছেন, এমন কতকগুলো সূক্ষ্ম জগতের বর্ণনা দিয়েছেন, যে-গুলোকে রহস্যময় বলা যেতে পারে। এ বর্ণনা আপনি দিলেন কি করে?

বললাম, তন্ত্রের মৈথুন তত্ত্ব পড়তে গিয়ে ষট্‌চক্রের বিভিন্ন জগৎ সম্পর্কে কোন্ একটা বইয়ে যেন বর্ণনা পড়েছিলাম। তারই ভিত্তিতে ঐ জগতের বর্ণনা দিই। লেখবার সময় যেন চোখের উপর সেই জগতের ছবিগুলো ভেসে উঠেছিল। অনুমান ও অনুভব থেকেই ও-সব লেখা। ব্যক্তিগতভাবে এ ব্যাপারে আমার কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

অনেকক্ষণ বোধহয় কথা বলছিলাম। ব্যস্ত কেবিনটাকে অধিকার করে বসে-ছিলাম। তাই এক সময় বয়টা এসে হাজির হল। তার হাতে একটা ট্রে। ট্রের উপর একটি বিল। সঙ্গে কাচের প্লেটে কিছু মৌরি। বুঝতে বাকি থাকল না যে, রেস্তোরাঁর মালিক নোটিস পাঠিয়েছেন 'অনেক সময় হয়ে গেল। কুইট নাও।' ফলে দাম এবং টিপ্‌স দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম।

বাসে কিছুকাল আমরা একদিকেই যাব। তারপর পথ ভাগ হবে। মাঝপথে নেমে আমি যাব ডান দিকে বেহালায়। মিস দত্ত যাবেন, বাঁয়ে বেঁকে টালিগঞ্জ। টালিগঞ্জগামী একটি বাসে উঠলাম। মিস দত্তও উঠলেন। মাঝ পথে আমি নামলাম। হাতে ঢেউ খেলিয়ে মিস দত্ত আমাকে বিদায় জানালেন, আমিও। বাস চলে গেলে স্মৃতি রোমন্থন করতে লাগলাম।

আমার স্বপ্নের সঙ্গে মিস দত্তের কোথায় যেন অদ্ভুত একটা মিল আছে। যদিও মহিলাদের মত কোমল উনি নন, তবুও কোথায় যেন একটা স্বপ্নজড়ানো। কোথায় যেন মিষ্টি একটু ছোঁয়া। বন্দরে যে শক্ত লোহার পিলারে জাহাজ নোঙর ফেলে, স্বপ্নের চৌহদ্দি ছাড়িয়ে তার দু'চোখের তারায় কোথায় যেন সেই রকম একটা দৃঢ় আশ্বাস। জানি না এই ধরনের চোখকেই কবি জীবনানন্দ দাশ 'পাখির নীড়ের মত চোখ' বলে বর্ণনা করেছেন কি না! আমার সমস্ত চেতনার মধ্যে ফাল্গুনের একটা গন্ধ ছড়িয়ে দিয়েছেন যেন মিস দত্ত। বারবার তার চোখের দৃষ্টি, বলবার ভঙ্গি, কথা বলার সময় গালের টোল, এইসব মনে পড়তে লাগল। কোনারকের সেই ভদ্রলোক আমায় বারবার বলেছিলেন, মেয়েদের এড়িয়ে চলতে, তাদের নিয়ে স্বপ্ন না দেখতে, কিন্তু সেকথা কিছুতেই আমার মনে এল না। ক্রমশ একটা স্নিগ্ধ লাবণ্যের কল্পনায় আমি যেন ডুবে যেতে লাগলাম।

অদ্ভুত নতুন একটা প্রেরণা পেলাম যেন জীবনে। ভালবাসার জন্য একটা রোমান্টিক আমেজ আমার রক্তের সঙ্গে বোধহয় জড়ানো আছে। ছোটবেলা থেকেই এ-ধরনের একটা কল্পনা করতাম। কিন্তু কোনো মহিলার সঙ্গে ভালবাসার কথা বলার সৌভাগ্য জীবনে আমার ঘটেনি। কলেজে অধ্যাপনা করতে গিয়ে যা ঘটেছিল— তা আমার অনভিপ্রেত। যাকে নিয়ে ঘটেছিল তাকে নিয়ে কোনো রকম স্বপ্নের

আলপনা মনে আঁকবার আমার বিন্দুমাত্র ইচ্ছেও ছিল না। আজও আঁকিনি। শুধু ইলোরার চোখে আমি সুদূর নক্ষত্রলোকের ইশারা দেখেছিলাম। ও যদি কাছে আসত হয়তো আমার হৃদয় বিস্ফোরিত হয়ে আগ্নেয়গিরির লাভা উদ্গীরণ করতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। তার আগেই কলেজের চাকুরি ছেড়ে দিয়ে নতুন চাকুরিতে ঢুকে পড়ি। আমি জীবনে প্রথম যে জ্যোতিষীকে হাত দেখিয়েছিলাম তিনি আমাকে বলেছিলেন যে, জীবন একটা রেকর্ড মাত্র। দীর্ঘ একটা রেকর্ড। যা ঘটনার ঘটে আছে। যে গান হবার তা হয়ে আছে। জীবনের বিভিন্ন অবস্থা হল বিভিন্ন পিন্। সেই পিন্ রেকর্ডের উপর এসে পড়লে রেকর্ডটা বাজে। আমার সমগ্র জীবন-রেকর্ডটাতে কী গান গাওয়া হয়ে আছে কে জানে! একটি পিন জীবনের প্রথম প্রহরে রেকর্ডটাকে বাজাতে গিয়ে খসে পড়ে গেছে। পিনটা বোধহয় ভোঁতা ছিল। বড় বেসুরো বেজে উঠেছিল রেকর্ডটা। সে পিন আর নেই। ভাবতে পারি না রেকর্ডের যে অংশে আমার মিষ্টিমধুর গানের সমাবেশ ঘটেছে সেখানে আবার কি ধরনের পিন এসে জুটবে। মিস দত্ত হয়তো সেই নতুন পিন হয়ে এসেছেন। এবার বেসুরো নয়, সুসমঞ্জস্য সুরে একটা মিষ্টি মধুর গান হয়তো বাজবে।

এখন আর মিস দত্ত নয়, আরতি বলেই ডাকি তাকে। কথায় কথায় মিস দত্তই একদিন বলেছিলেন, আমাকে আরতি বলেই ডাকবেন মৃগাঙ্কদা।

হেসে তাকিয়েছিলাম তার দিকে, তোমার আপত্তি হবে না?

—কেন হবে?

—তবে তুমিও আমাকে 'আনন্দ' বলে ডেকো?

অবাক হয়ে আরতি আমার মুখের দিকে তাকিয়েছিল। অর্থাৎ হঠাৎ 'আনন্দ' নামে আমাকে কেন সে ডাকবে তাই ভেবেছিল হয় তো। আমার স্বীকৃত নাম তো 'আনন্দ' নয়, মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য।

আরতির ইতস্তত ভাব দেখে বলেছিলাম, বাড়িতে আমার ডাক নাম আনন্দ। কি, তোমার আপত্তি আছে?

একটু ঘেমে উঠেছিল আরতি। সিল্কের রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছেছিল। আমি এক দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়েছিলাম। সিদ্ধান্ত নিতে আরতির দেরি হচ্ছিল। ভারতীয় মেয়েদের বুঝি এমনই হয়। বললাম, তোমার মন বোধহয় সায় দিচ্ছে না?

আরক্তিম হয়ে উঠে ও বলেছিল, কেন দেবে না।

—তাহলে আমি তোমার কাছে আজ থেকে 'আনন্দ'?

ঘাড় কাত করে ও সম্মতি জানিয়েছিল।

—আজ থেকে আমরা তাহলে বন্ধু?

ও আবার ঘাড় কাত করেছিল।

মানব জীবন চূড়ান্ত রকমের ব্যর্থ—যদি একটি হৃদয়ের সঙ্গে সম আর একটি

হৃদয়ের সংযোগ না হয়। আমার মধ্যে সেইজন্য একটি অসম্পূর্ণতা বোধহয় এযাবৎকাল হাহাকার করে বেড়াচ্ছিল। মনে হল, সেই মরুভূমির উপর প্রথম বারিবর্ষণ হল।

আমার বহুকালের সাধ ছিল, একটি উন্নত হৃদয়ের সঙ্গে যোগ হবে, যে আমারই মত চিন্তা করবে, ভাববে। আরতির মধ্যে সেই সহমর্মিতার আমি সন্ধান পেলাম। যথেষ্ট লেখাপড়া করেছে মেয়েটি। অনেক কিছুর খবর রাখে। দুর্ভাগ্যক্রমে লেখাপড়া শেষ করতে পারেনি। ইংরেজিতে এম. এ. পড়তে পড়তে চাকুরি নিতে হয়। বাবা হঠাৎ অ্যাকসিডেন্টে মারা যান। সংসারের মধ্যে বড় ঐ আরতিই। মা, এক ছোট ভাই ও দুটি ছোট ছোট বোন নিয়ে সংসার। যখন বিপর্যয়ের ঘূর্ণাবর্তে সংসার ভেসে যাবার উপক্রম, ঠিক তখনই এই চাকুরিটা জুটে যায়।

আরতির একটা practical sense আছে। ওর মনের একদিকে রয়েছে একটা গল্পের কুঠুরি, আর একদিকে কঠিন বাস্তবের প্রতি সতর্ক চেতনা। সেই জন্য লেখাপড়া করতে করতেই শর্টহ্যান্ডটা শিখে নিয়েছিল ও। বিপর্যয়ের মুখে ঐ বিদ্যাটাই ওর কাজে লাগে। চাকুরিটা পেয়ে যায়।

সংসার চালাতে বসে পরিশ্রমই করতে হয় ওকে। প্রাইভেট কোম্পানিতে মাইনে খুব একটা খারাপ না হলেও, আরো চাই। বাড়ি ভাড়া দিয়ে, সংসারের খাইখরচা মিটিয়ে, ভাই বোনেদের লেখাপড়া শেখাতে হয়। খরচ অনেক। অফিস থেকে ফিরে গিয়ে সন্ধ্যায় দুটো টিউশনিও করে ও। তারই ফাঁকে কি করে যে এতসব জেনে নিয়েছে সে, কে বলবে।

সাহিত্য ও শিল্পের নানা খবরই ও রাখে। ফরাসি কবিদের মধ্যে বোদলেয়ার থেকে বোনেফয় পর্যন্ত নাম জানে ও। ইংরেজ কবিদের মধ্যে এলিয়ট থেকে অডেন অবধি আধুনিকদের ও ভাল করেই পড়েছে। ইয়েটস্-এর উপরও ভাল দখল। লরেন্স ডুরেলের 'Key To Modern Poetry' থেকে মাইকেল হামবুর্গারের 'The Truth of Poetry' অবধি পড়া। কন্টিনেন্টাল উপন্যাস-সাহিত্য সম্পর্কে ওর বেশি আগ্রহ। Existentialism-এর ভক্ত। কাফ্‌কা, কাম্যু, 'সাত্র'র ওর প্রিয় লেখক। কাফ্‌কার The Trial, The Castle, কাম্যুর 'Outsider' ও 'The Plague' সার্ত্রের-এর 'Les Chemin' অবধি পড়া। Existentialist দার্শনিকদের সম্পর্কেও খোঁজখবর রাখে, যেমন, কিয়ার্কেগার্ড, হাইডগার, জেসপার্স ইত্যাদি। নতুন একটি বইয়ের নাম করল— Existentialism–John Mcqurrie, যা আমিও পড়িনি। শিল্প সম্পর্কেও যথেষ্ট আগ্রহ। মাতিস, সেজান থেকে পিকাসো এবং আমেরিকান পোলক পর্যন্ত পড়াশোনা। বাংলার পাঁচ কবি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল—জীবনানন্দ, সুধীন দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে ও বুদ্ধদেব বসু। এর পরেও আধুনিকদের সম্পর্কে আগ্রহ আছে। যে কবিতা আমাদের অনেকের কাছেই দুর্বোধ্য ও তার ব্যাখ্যা করতে পারে। এ হেন বিদুষী

মেয়ে যখন আমার লেখার প্রশংসা করল তখন সে এপ্রিসিয়েশন যেন তুলনাহীন। আমি কখনও ভাবতে পারিনি এমন একটি মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হবে। আমার জীবনের রেকর্ডে যে মধুর একটা সঙ্গীতের ইঙ্গিত পাচ্ছি, তা যদি নির্বিরোধ বেজে যেতে পারত! মাঝে মাঝে কোনারকের সেই আশ্চর্য ভদ্রলোকটির কথা মনে পড়লে কেমন দমে যাই। অদ্ভুত একটা চিত্রকল্প আমার চোখের উপর ভেসে ওঠে—একদিকে একটি নির্মম মরুভূমি, আর একদিকে স্নিগ্ধ সরোবর। নির্মম মরুভূমি যেন শ্মশানের মত হাসছে আমার দিকে তাকিয়ে। যেন বলছে, আমাকে এড়িয়ে যাবার তোমার উপায় নেই। স্নিগ্ধ সায়রের জল টলটল করছে। মনে হয় সেখানে ঝাঁপিয়ে পড়ি। কিন্তু এগিয়ে যেতেই কেমন একটা শঙ্কা আমাকে তাড়না করে। আরতি যেন সেই স্নিগ্ধ সায়র। কিন্তু সেখানে আমার অবগাহন করা হবে না! আমার নিয়তির লেখা যে সেই রকমই। হঠাৎ মনে হয়, দরকার নেই, ফিরে আসি। কিন্তু জীবনের হাতছানি যাদুকরের সম্মোহনী ক্ষমতার চাইতেও বোধহয় বেশি। আবার মন্ত্রমুগ্ধের মত এগিয়ে যাই। কোনোদিন আমার হয়তো আগেই ছুটির অবকাশ জুটে যায়। কিন্তু অফিস ছেড়ে বেরোই না। আরতির জন্য অপেক্ষা করি। কোনোদিন হয়তো ডিরেক্টর সাহেব বেরিয়ে পড়লে আরতিও চলে যেতে পারে। কিন্তু ও যায় না। বাস স্ট্যান্ড পর্যন্ত গিয়ে একত্রে দাঁড়াই। সারাদিন অনেক চা খাওয়া হলেও সেই রেস্টুরেন্টটাতে বসে চা খাই। তারপর একই বাসে উঠি। অর্ধপথে আমি নেমে যাই। আরতি চলে যায়। আমি জানি এ নিয়ে অফিসে অনেক কথা উঠেছে। কথাটা আরতিকে একটু খোঁচা দিয়েছিল, কারণ ও মূলত সেন্টিমেন্টাল মেয়ে। আমাকেও খোঁচা না দিয়েছে তা নয়। তবু কী একটা অদৃশ্য প্রেরণা যেন আবার আমাদের দ্বিধা-দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করছে। জীবনের রেকর্ড তো প্লেন হতে পারে না, তাহলে বাজবে কি করে? জীবনের সর্বক্ষেত্রে ঘাত সংঘাত থাকবেই, তবেই না জীবন! অন্ধকার না থাকলে আলোর মূল্য বোঝা যায় না। যন্ত্রণা না থাকলে সুখের কোনো মূল্য নেই। ভালবাসা যদি অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলে তবে সেটা বুঝি জোলো হয়ে পড়ে। মানুষ স্বর্গের কল্পনা করে বটে, কিন্তু বাধাবন্ধনহীন অফুরন্ত আনন্দে কোনো দিনই আনন্দের যথার্থ মূল্য পাওয়া যেতে পারে না। বৈচিত্র্যই তো জীবনের মশলা। প্রেমের মধ্যে একটু বিঘ্ন না হলে তার গতি ফুটে ওঠে না। নদীর চলার পথে বাধা পড়লে তার বেগ আরও বেশি হয়। আমার আর আরতির মধ্যে অদ্ভুত একটা অন্তরঙ্গতা এগিয়ে চলেছে।

এগিয়ে চলেছি। ভালই চলেছি। হঠাৎ এরই মধ্যে একদিন ডিরেক্টর সাহেব আমাকে ডাকলেন। ঘরে যেতে বললেন, মৃগাঙ্ক, গেট রেডি।

অবাক হয়ে বললাম, কীসের রেডি স্যার?

ডিরেক্টর সাব শুভঙ্কর মিত্র বললেন, আমার মিসেস তোমাকে আজ জোর তলব করেছেন।

—হঠাৎ?

—আমার মেয়ে আসছে আমেরিকা থেকে। Fine Arts নিয়ে Calcutta ইউনিভারসিটি থেকে পাশ করে আমেরিকা যায়। সেখানে রিসার্চ সমাপ্ত করেছে। একটি আমেরিকান ছেলেকেই বিয়ে করেছে। ঐ আমার একমাত্র মেয়ে। তা আজকের আন্তর্জাতিকতার হিসেবে দেশ-বিদেশের গণ্ডি বা জাতের গণ্ডি বিচার করলে চলবে কেন, বল?

বললাম নিশ্চয়ই স্যার।

—মিলি মানে আমার মেয়ে আসছে কলিঙ্গ আর্ট সম্পর্কে সরেজমিনে তদন্ত করতে। তোমার মিথুন তত্ত্ব সম্পর্কে নিউ লাইট ফোকাস করতে চায়। আমার মিসেসের ধারণা, তোমার বইটি ওর খুব কাজে লাগবে। কিন্তু তাঁর আরও ধারণা যে, বইটির মধ্যে সর্বস্ব তুমি উজাড় করে দাওনি। অনেক, আরও অনেক কিছু তোমার কাছে আছে। তোমার সঙ্গে আলোচনা করে সে-সব তিনি জেনে নিতে চান। উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, মেয়ে-জামাইয়ের কাছে ক্রেডিট নেওয়া। তোমার নিশ্চয়ই আজ সময়ের অভাব হবে না?

একটি বিকেল এখন একটি মহামূল্যবান অপরাহ্ণ আমার কাছে। এই অপরাহ্ণটির জন্য হয়তো একটি সাম্রাজ্যই ছেড়ে দিতে পারি। কিন্তু শুভঙ্কর মিত্র এ অফিসে আমার সব চাইতে বড় বন্ধু। এখানে আমার চাকুরি পাবার পেছনে তাঁর সহানুভূতিই সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিয়েছিল। সুতরাং 'না' করতে পারলাম না। কিন্তু মনের মধ্যে কেমন একটা হাহাকার মুষড়ে উঠল।

ডিরেক্টর বললেন, তোমার কাজ নিশ্চয়ই শেষ হয়েছে? বোস। আমি এক্ষুণি উঠব। একত্রই যাব।

কাজ আমার ছিল না সত্যি। কিন্তু তবু একটা কাজের অজুহাত কয়েক মিনিটের জন্য আমাকে তৈরি করে নিতে হল। আরতিকে অন্তত না জানিয়ে আমি যেতে পারব না। সুতরাং বললাম, কাজ তেমন নেই স্যার। তবে টেবিলের উপর ইম্পর্টেন্ট একটা ফাইল রয়েছে। সেটাকে যথাস্থানে রেখে আমি এক্ষুণি আসছি স্যার।

—এসো। দেরি কোরো না যেন।

—না।

একটা অজুহাত সৃষ্টি করে নিজের ঘরে এলাম। কোনো কাজ নেই তবু নিজের টেবিলের কাছে একটু দাঁড়ালাম। তারপর ঘর থেকে বেরিয়ে আরতির কাছে এলাম। কি একটা ইমপর্ট্যান্ট জিনিস টাইপ করছিল আরতি তখন। হঠাৎ আমাকে দেখে কেমন হক্‌চকিয়ে গেল। তার সেই অনবদ্য চোখ দুটি তুলে আমার দিকে তাকাল। বললাম, আরতি, আমি একটু ডিরেক্টর সাহেবের সঙ্গে যাচ্ছি।

—কোথায়? আরতি হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে তাকাল।

বললাম, ওঁর বাড়িতে।

—আচ্ছা।

—আজ সঙ্গে যেতে পারলাম না।

—ঠিক আছে।

—আসি।

ও ঘাড় নাড়ল। আমি ডিরেক্টর সাহেবের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলাম।

গড়িয়াহাটে নিজস্ব আধুনিক ডিজাইনের বাড়ি ডিরেক্টর সাহেবের। কলিং বেল টিপতে দারোয়ান এসে গেট খুলে দিল। মিত্র সাহেব আমাকে নিয়ে উপরে উঠতে লাগলেন। বাড়ি-ঘরের নমুনা এবং আদব-কায়দা দেখে সত্যিই আমি বিরাট এক অস্বস্তি বোধ করলাম। এ ধরনের পরিবেশের কথা জীবনে কখনও কল্পনা করিনি। শহরজীবনে বাধ্য হয়ে থাকছি বটে, কিন্তু আমার জীবন গড়ে উঠেছে ছায়াঢাকা বাংলার একটি আদর্শ পল্লীর মধ্যে। সেখানকার বাংলার মধ্যবিত্ত জীবনের ধারা আমার রক্তের মধ্যে আজও বয়ে চলেছে। শহরের এই ধরনের জীবনের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে নেওয়া সত্যিই কষ্টকর। মিত্র সাহেব বহুবার বিলেতে গিয়েছেন জানি। কিন্তু তাঁর চেহারা ও ব্যবহারের মধ্যে সাহেবিয়ানা তত নেই। বাংলার কোমল প্রাণের উত্তরাধিকার আছে। সেইজন্য মিত্র সাহেবকে দেখে তাঁর বাড়ির পরিবেশের কথা আমি আগে কল্পনা করতে পারিনি।

বৈঠকখানা ঘরে এনে মিত্র সাহেব আমাকে বসালেন, 'বোস মৃগাঙ্ক, মিসেসকে খবর দিচ্ছি।' তিনি উপরে চলে গেলেন। আমি বৈঠকখানা ঘরের সাজসজ্জা দেখতে লাগলাম। দামি সোফাসেট। দেয়ালের ধারে সুন্দর কয়টি শেল্‌ফ। শেল্‌ফে অধিকাংশই ইংরেজি কালেকশন। আপ-টু-ডেট জার্নাল। দেয়ালে আধুনিক শিল্পীদের আঁকা কয়েকটি ফ্রেস্‌কো। মনোরম রঙ। তবে কিছুটা অসঙ্গতিও আছে। কোনারকের অনুকরণে পাথরে খোদাই করা কয়েকটি নারী মূর্তি আছে। আবার ভেনাসের নগ্ন মূর্তিও আছে। তারই পাশে অমিতাভ বুদ্ধের ব্রোঞ্জ মূর্তি। সমস্ত দেখে শুনে গৃহকর্ত্রীর মনোভাব বা রুচি সম্পর্কে একটা অনুমান করে নেবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

মিত্র সাহেবের বুঝি আর বছর খানেক চাকুরি আছে। সুতরাং তাঁর বয়েস যথেষ্টই হয়েছে অনুমান করতে বাধা নেই। মিডিয়াম হাইটের লোক মিত্র সাহেব। মাথার পেছনটাতে বেশ টাক পড়ে গেছে। সামনেও বিরল কেশ। সেই বিরল কেশে তিনি কলপ করেন। তবে স্বাস্থ্যের বাঁধুনি বেশ আঁটসাটো আছে। যৌবনে তিনি সুস্বাস্থ্যের অধিকারী ছিলেন সন্দেহ নেই। তবে সুন্দর দর্শন ছিলেন বলা যায় না। বরং বয়েসের ভাবে অনেকটা সৌম্যদর্শন হওয়াতে এখন ভালই লাগে। আরও ভাল লাগে এই কারণে যে, মানুষটির মধ্যে তেমন অহংকার নেই। ওর মেয়ে আমেরিকা থেকে আসছে। একজন আমেরিকানকে বিবাহ করেছে, সুতরাং মিত্র সাহেবের গৃহিণীর একটা

ছবি মিত্র সাহেবের পাশে রেখে কল্পনা করবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

কিছুকাল পরে মিত্র সাহেব এলেন পায়জামা-পাঞ্জাবি পরে। আরাম করে সোফায় বসতে বসতে বললেন, 'উনি আসছেন। একটা ট্রাঙ্ককল এসেছে কোথা থেকে যেন।'

অফিসে উনি আমার বস হলেও, বাড়িতে দেখলাম মিত্র সাহেব আমাকে গেস্ট হিসেবে গ্রহণ করেছেন। দামি একটা সিগারেট বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, নাও।

লজ্জিত হয়ে বললাম, না স্যার।

মিত্র সাহেব হাসতে-হাসতে বললেন, এখানে কোনো সঙ্কোচের কারণ নেই! এখন আমি তোমার বস নই।

বললাম, না স্যার। আমি ধূমপান করি না।

মিত্র সাহেব বললেন, strange! একালের ছেলে হয়ে পানদোষ মুক্ত! ড্রিঙ্ক করার অভ্যাস আছে তো?

—না স্যার।

মিত্র সাহেব হাসতে-হাসতে বললেন, সে কি হে! তাহলে লেখক হলে কী করে! শুনেছি একালের কোনো লেখকই ড্রিঙ্ক না করলে কলম ধরতে পারেন না। তোমাদের আধুনিক একজন ঔপন্যাসিক শুনি ড্রিঙ্ক করে খুব বেসামাল হয়ে থাকেন। পেপারের কল্যাণে নামডাক খুবই। আঁতেল-এর পোজ করেন। দু'টো বই পড়েছিলাম। খিস্তি খেউড়ের উপরে মনে হয়নি। ডেপ্‌থ নেই।

বুঝলাম মিত্র সাহেব কার কথা বলতে চাচ্ছেন। তবে আধুনিক বাংলা সাহিত্য যে উনি পড়েন, এরকম আমার ধারণা ছিল না। সাধারণত ধরনের কাজের লোকেরা সাহিত্য পড়বার অবকাশ পান না। বুক শেল্‌ফে জেমস জয়েসের ইউলিসেস, ইয়েটস্‌ ও এলিয়টের কাব্য সংকলন। আঁদ্রে ব্রেতোঁর সুররিয়ালিজমের ইতিহাস, রাধাকৃষ্ণনের ভারতীয় দর্শন ইত্যাদি দেখে আমার ধারণা হয়েছিল যে—শো-কেসে লোককে ধোঁকা দেবার জন্যই এসব রাখা। কিন্তু মিত্র সাহেবের কথা শুনে মনে হল, এ-সবের খোঁজ-খবর তিনি রাখেন। নইলে আধুনিক বহু প্রচলিত একটি বাংলা দৈনিক ও সাপ্তাহিকের পৃষ্ঠপোষকতা-পুষ্ট একটি লেখকের লেখাকে তিনি এক কথায় এমন করে খিস্তিখেউর বলে উড়িয়ে দিতে পারতেন না। বললাম, আপনার বুকশেল্‌ফে মূল্যবান সব সংগ্রহ দেখছি।

মিত্র সাহেব বললেন, ঐ আমার একটা হবি।

—জেমস জয়েসের ইউলিসেস পড়েছেন?

—পড়েছি, ওর বন্ধু জিলবার্টের সহায়তা নিয়ে। ভেরি ডিফিকালট বুক। তুমি পড়েছ?

বললাম, হ্যাঁ।

—কী বুঝেছ বইটি পড়ে বলো দিকিন্‌?

বললাম, মূলত লজ অব অ্যাসোসিয়েশনের উপর লেখা।

মিত্র সাহেব বললেন, আমারও ঠিক তাই মনে হয়েছে।

আমি বললাম, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এর একটা অদ্ভুত বক্তব্য আছে।

কৌতূহলী হয়ে মিত্র সাহেব আমার দিকে তাকালেন, কি?

—এর চিন্তাধারাটা ভারতীয় উপনিষদের সমগোত্রীয়।

মিত্র সাহেব যেন কৌতূহলে জাঁকিয়ে বসলেন, কী রকম?

বললাম, একটা বিরাট ভল্যুমের বই। পড়তে পড়তে খেই হারিয়ে ফেলতে হয়। ভাষা নিয়েও অনেক experiment আছে। শেষপর্যন্ত অনেক কষ্টে বইটি যখন শেষ করা যায় তখন মনে হয়....

মিত্র সাহেব আর একটা সিগারেট ধরালেন। তাঁর দুই চোখে গভীর কৌতূহল লক্ষ্য করলাম আমি, বল।

বললাম, শেষ পর্যন্ত বিরাট এই উপন্যাসটি শেষ করে মনে হয় যেখান থেকে আরম্ভ করেছিলাম, সেখানেই আছি। এক চুলও এগোয় নি।

—ঠিক বলেছ তো! সত্যিই তাই। কিন্তু এর সঙ্গে উপনিষদের....

বললাম, ভারতীয় কল্পনাতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা একটা মায়াসদৃশ। Vast expanse. কিন্তু গভীর ভাবে বিচার করলে দেখা যায় এই expansion-টা মোটেই expansion নয়। যেখানে ছিল, জগৎ সেখানেই আছে, অথচ একে গতিশীল ও সম্প্রসারিত মনে হচ্ছে। ঐ উপন্যাসটি ঠিক সেই কথাই বলতে চাচ্ছে। অনেক ঘোরাফেরার পর মনে হচ্ছে কোথাও যাইনি, যেখানে ছিলাম সেখানেই আছি। অথচ মনে হল ঘুরে এসেছি।

মিত্র সাহেব প্রায় যেন লাফিয়ে উঠলেন, চমৎকার তো! এ আইডিয়া তুমি কোথায় পেলে?

বললাম, সম্ভবত লরেন্স ডুরেলের 'কি টু মডার্ন পোয়েট্রির' "স্পেস টাইম অ্যান্ড পোয়েট্রি" অংশে অথবা মুর্দার (Murdoch) 'সার্ত্রর' গ্রন্থে অথবা মাইকেল হামবুর্গারের 'দি ট্রুথ অব্ পোয়েট্রি'-তে।

মিত্র সাহেব বললেন, জানো মৃগাঙ্ক, এইজন্য তোমাকে আমার এত ভাল লেগেছে। সত্যি, সব কিছু দেখবার মধ্যে তোমার একটা অরিজিনালিটি আছে।

বললাম, অথচ স্যার দেখুন, বাংলা সাহিত্যের জগতে আমি এখনও কোনো—

মিত্র সাহেব হাসলেন, বললেন, আধুনিক জীবনটার রহস্যই তো এই। এখানে এখন গুণের কদর নেই। তোষামুদে বাটপারের জগৎ। সর্বক্ষেত্রেই তাই। এই জন্যই দুনিয়ার সর্বত্র আজ সর্বক্ষেত্রে, রাজনীতি থেকে সাহিত্যে, মেডিওকার ট্যালেন্টের প্রাধান্য। শেকসপিয়র, রবীন্দ্রনাথ, টলস্টয় চোখে পড়ে না! চার্চিল, রুজভেল্ট, স্ট্যালিন, লেনিন বা গান্ধীও দেখা যায় না। যথার্থই এটা iron-age, তেতে দিলে

মুহূর্তে তেতে উঠে। তাপ সরিয়ে নিলেই ঠাণ্ডা মেরে যায়। পেপারের কল্যাণে আজ যে উঠছে কাল সে পড়ে যাচ্ছে। যেন উনানের উপর দুধের কড়াই। যতদিন উনান থেকে আগুন উঠছে, ফুটছে। আগুন সরিয়ে নিলেই বক্‌বকানি ফোঁসফোঁসানি বন্ধ। এ ধরনের পেপার অরিয়েন্টেড লেখক হয়ে লাভ নেই। পেপার ছাড়াই তো তোমার নাম কম হয়নি। তুমিই বরং টিকে থাকবে।

কথা বলতে বলতেই গরম কাটলেট আর কফি এল। খানসামা গোছের একটি লোক খাবার সরবরাহ করে গেল। খাবার খেতে খেতেই মিত্র সাহেব প্রশ্ন করলেন, আচ্ছা মৃগাঙ্গ, সুররিয়ালিজম সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?

বললাম, সুররিয়ালিজম-এর ভিত্তি ফ্রয়েডীর তত্ত্ব। Pascal-এর রহস্যময় অর্ন্তদর্শন। অবচেতন মন একটি মানুষের সত্যিকারের চেতনা প্রকাশ করে বলে ধারণা। তবে একথা সত্য নয়, কারণ ফ্রয়েড abnormal mind নিয়ে deal করেছেন। মনের মধ্যে ডুব দিতে গিয়ে অধিবস্তুবাদীরা কিন্তু শেষপর্যন্ত মনের অন্ধকারের মধ্যেই ডুবে যাচ্ছে। যদিও তা থেকে কিছুটা উদ্ধারের চেষ্টা করেছেন য়ুঙ্। ওদের মনের ভেতর ডুব দিতে হচ্ছে মদ খেয়ে। চেতন মনটাকে ওরা আর কোনোভাবেই নিষ্ক্রিয় করতে পারছে না। ভারতবর্ষও কিন্তু 'আত্মানং বিদ্ধি' বলে মনের মধ্যেই ডুব দিতে বলেছে। কিন্তু ওদের ডুব দেওয়া আর ভারতের মনের মধ্যে ডুব দেওয়ার পার্থক্য আছে।

—'কী রকম?' কাট্‌লেটের এক টুকরো মুখে দিয়ে মিত্র সাহেব আমার তাকিয়ে থাকলেন।

বললাম, ফ্রয়েড যেখানে abnormal মন নিয়ে deal করেছেন, য়ুঙ্ collective unconcious ভারতীয়েরা সেখানে supernormal মন নিয়ে deal করেছেন। ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্ববিদেরা মনের মধ্যে ডুব দিয়ে স্বপ্নে মনের যে অবস্থা সেই অবস্থা খোঁজেন। কিন্তু ভারতীয়েরা মনের মধ্যে ডুব দিয়ে বাইরে চলে আসেন।

—কী রকম?

—তন্ত্র বলে, ভারতীয়েরা মনের মধ্যে ডুব দিয়ে মূলাধার আশ্রয় করেন, তারপর প্রাণবায়ুর সাহায্যে মূলাধারস্থ ঘুমন্ত শক্তিকে ঊর্ধ্বে সহস্রারের দিকে টেনে তোলেন। নাভিতে মণিপুর চক্র ভেদ করতেই মন হাঁকপাক শুরু করে দেয়। অনাহত চক্রে উঠলে মন অসাড় হয়ে পড়ে, Carl Sagan-এর ধারণা অনুযায়ী ডাইমেনশন বৃদ্ধি পেয়ে মানুষের ভেতর বাইরে চলে আসে। ক্ষুদ্রদেহের মধ্যে মানুষ অসীমত্ব অনুভব করে। বিশুদ্ধ চক্র ও অনাহত চক্রে উঠলেই মনের আর প্রায় পাত্তাই থাকে না। মন তখন মহাবিশ্বের কেন্দ্রের দিকে ধেয়ে যায়। সুতরাং ভারতীয়দের মনে ডুব দেওয়া হল বাইরে ছড়িয়ে পড়া।

মিত্র সাহেব বললেন, সত্যি তোমার ব্যাখ্যা একটু অভিনব। তবে তন্ত্র সম্পর্কে আমার তেমন অভিজ্ঞতা নেই। তেমন পড়িনিও।

মিত্র সাহেব কথা শেষ করতে না করতেই দরজার পর্দা কেঁপে উঠল। আমি তাকিয়ে দেখলাম একজন মহিলাকে। দীর্ঘদেহ, শক্ত গড়ন। রঙ? কী ধরনের তা বর্ণনা করতে পারব না। বাসন্তী রঙ বললেই ভাল মানায়। সমগ্র দেহেও যেন বসন্তের হিল্লোল। দুই চোখের মণিতে বসন্তের গন্ধ। বয়স যেন সীমানা দিয়ে এই মহিলাকে বাঁধতে পারেনি। সমস্ত কিছু ছাপিয়ে সমগ্র দেহে ফুটে উঠেছে পূর্ণ এক বসন্ত। পিকাসোর সেই বসন্ত নৃত্যের ছবির মত। কোনো মহিলাকে দেখে হঠাৎ বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠবে আমি ভাবতে পারিনি। কিন্তু আমার উঠেছিল।

পর্দা সরিয়ে ভেতরে ঢুকলেন মিসেস মিত্র। দুই কর যুক্ত করে নমস্কার জানালেন আমাকে। মিত্র সাহেব ডাকলেন, এস বাসন্তী। এই তোমার লেখক।

সত্যি, নামের সঙ্গে দেহের অপূর্ব সামঞ্জস্য! এমন ভাবা যায় না! অদ্ভুত দুই উত্তপ্ত চোখের দৃষ্টি ফেলে, আমাকে দেখতে দেখতে সিটে এসে বসলেন মিসেস মিত্র। আমি কেমন যেন সঙ্কোচ বোধ করতে লাগলাম।

মিসেস মিত্র বললেন, আপনার বই পড়লাম।

মিত্র সাহেব বললেন, ওকে 'তুমি' বলেই ডাকতে পার। আমি তো 'তুমি' বলেই ডাকি।

সেই আশ্চর্য দৃষ্টি ফেলে আবার আমার দিকে তাকালেন তিনি ক্ষুণ্ণ হবে না তো?

বললাম, কেন। খুব ভাল লাগবে।

অদ্ভুত তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে পারেন মিসেস মিত্র। যেন শাণিত দুটি তরবারি। সেই দৃষ্টিতে আর একবার তিনি আমাকে দেখে নিলেন, তারপর বললেন, তোমার বই পড়লাম।

আগ্রহে মিসেস মিত্রের দিকে তাকালাম। এমন একটি মহিলা আমার লেখা সম্পর্কে কী মন্তব্য করেন তা শোনার জন্য তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। বহুদূর এক নক্ষত্রলোকের রহস্যময় ইশারা যেন তাঁর চোখের মধ্যে। মিসেস মিত্র বললেন, মৈথুন তত্ত্ব সম্পর্কে তুমি এ-সব পেলে কোথায়? আর্টের প্রতি বরাবরই আমার একটা দুর্বলতা আছে। বহু বইও পড়েছি। কিন্তু এ ধরনের কোনো বর্ণনা আগে পড়িনি। হাইনরিস জিমারের The Art of Indian Asia বইটি আমি পড়েছি। ভাল বই। তাতে মিথুনকে সৌভাগ্যের প্রতীক বলে বর্ণনা করলেও—তুমি যে ধরনের ব্যাখ্যা দিয়েছ সে ব্যাখ্যা নেই। এসব তুমি পেলে কোথায়?

বললাম, আশ্চর্যভাবে কোনারকে এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। ভদ্রলোক বোধহয় সাধকটাধক কেউ হবেন। তন্ত্রের উপর অগাধ দখল দেখলাম। তন্ত্রমতেই মিথুন তত্ত্বের এই অপূর্ব ব্যাখ্যা করেছেন তিনি।

মিসেস মিত্র বললেন, তোমার লেখা পড়ে আমার মনে হয়েছে ভারতীয় আর্ট সম্পর্কে

আমাদের চিন্তাধারা পরিবর্তন করার প্রয়োজন আছে। আমাদের কিছু কিছু দেবদেবীর মূর্তি আছে যেগুলো আপাতদৃষ্টিতে কুৎসিত। কিন্তু তার অন্তরালবর্তী ভাব যদি স্পষ্ট হয়ে উঠে তাহলে বোধহয় কুৎসিত অত্যন্ত সুন্দর হয়ে উঠবে।

বললাম, তা ঠিকই। Art-এর মূল্য তার বাহ্যিক সৌন্দর্যে নয়, তার ভাব প্রকাশের ব্যঞ্জনায়। সেদিক থেকে ইউরোপীয় ভেনাসের ছবির চাইতে আমাদের মা কালীর মূর্তি অনেক বেশি মূল্যবান।

মিসেস মিত্র বললেন, আমিও এ কথাটাকেই জিজ্ঞাসা করতে চাচ্ছিলাম। দুটো মূর্তি আমাদের কাছে অত্যন্ত দৃষ্টিকটু লাগে, শিবলিঙ্গ ও মা কালীর মূর্তি। এ মূর্তি দুটোর ব্যাখ্যা করতে পার?

কোনারকের প্রাঙ্গণে সেই ভদ্রলোক আমাকে হিন্দু দেবদেবীর মূর্তি ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে যে কথা বলেছিলেন মিসেস মিত্রকে সেই ব্যাখ্যা শোনালাম। আরও একটু নতুন কথা শোনালাম মা কালীর চার হাত সম্পর্কে Big Bang-এর সময় symmetry breaking-এর চারটি শক্তি strong nuclear force, weak nuclear force, electromagnetic force ও gravity-র কথা বর্ণনা করে।

মনে হয় মিসেস মিত্র মুগ্ধ হলেন। বললেন, ভাল হল। সময়মত ভারতীয় এই শিল্প সম্পর্কে জানবার সৌভাগ্য হল। আমার মেয়ে আসছে আমেরিকা থেকে। ভারতীয় ফাইন আর্টস সম্পর্কে কিছু তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যাবে। ওর হাজব্যান্ড আমেরিকান। চিকাগো ইউনিভার্সিটিতে আছে। ভারতবর্ষের দেবদেবীর মূর্তি সম্পর্কে ভারি আগ্রহ। এর উপর একটা বই লিখতে চায়। সেই জন্যই ভারতে আসছে। যদিও ভারতবর্ষের বহু ধর্মীয় মিশন আমেরিকাতে আছে, বহু যোগাশ্রম খোলা হয়েছে, ভারতবর্ষের এই দেবদেবী সম্পর্কে তেমন কোনো সুবক্তব্য এঁরা আমেরিকানদের কাছে রাখতে পারেননি। যে ভারতীয়রা আমেরিকাতে যায়, তারা নিজেদের দেশ সম্পর্কে খুবই অনভিজ্ঞ।

ভারতীয়দের দেবীমূর্তিগুলো সম্পর্কে আমার খুব জানার ইচ্ছে ছিল, এ-জন্য কয়েকজন সন্ন্যাসী টাইপের গুরুর সঙ্গেও দেখা করেছিলাম। দেখলাম layman-এর চাইতে তাঁরা বেশি কিছু জানেন না। বেদ-বেদান্ত-উপনিষদ, গীতা চণ্ডী আওড়াতে পারেন কিন্তু কোনো কিছুই ব্যাখ্যা করতে পারেন না। মিলি লিখেছে, আমেরিকার ভারতীয় যোগীরা যে যোগ শেখান তা এক ধরনের Physical exercise মাত্র। আর্টিফিসিয়ালি মনকে আটকে রাখবার নিয়ম। যোগের যে একটা অধ্যাত্ম ব্যাখ্যা আছে, সেটা তাঁরা দিতে পারেন না।

শুভঙ্কর মিত্র স্ত্রীর দিকে তাকালেন। বললেন, আমার মনে হয় যোগ সম্পর্কেও মৃগাঙ্কের যথেস্ট ধারণা আছে।

বহুদূরলোকের জ্বলন্ত দুটো নক্ষত্রের মত চোখ নিয়ে মিসেস মিত্র আমার দিকে

তাকালেন। নক্ষত্রের কম্পনের মত অদ্ভুত এক আলোর কম্পন সেখানে। যেন দুটো আগুনে-প্রজাপতি পাখা নাড়ছে। তিনি বললেন, আছে নাকি?

লজ্জিত হয়ে বললাম, তেমন নেই। প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতা নেই।

শুভঙ্কর মিত্র আমার দিকে তাকালেন, তাহলে তুমি সুররিয়ালিজম-এর ভিত্তি হিসেবে ফ্রয়েডীয় ড্রিম্‌থট ও ভারতীয় 'আত্মানং বিদ্ধি' তত্ত্ব আলোচনা করলে কি করে?

মিসেস মিত্রের দুই চোখে যেন ফাল্গুন পাখা মেলে দিল : সুররিয়ালিজম সম্পর্কে তোমার নিজস্ব কোনো ধারণা আছে নাকি?

শুভঙ্কর মিত্র বললেন, প্রচণ্ড ধারণা। শুধু ধারণা নয়, অভিনব ধারণা। আমি হলপ করে বলতে পারি তুমি অন্য কোনো বইয়ে এ তত্ত্ব পাওনি। তাছাড়া James Joyce-এর 'ইউলিসেস' সম্পর্কে যে আশ্চর্য ব্যাখ্যা দিল তাও কখনও শোননি।

—Is it! চোখ থেকে যেন দুই টুকরো সোনার আলো ছুঁড়ে দিলেন তিনি আমার দিকে : 'বলো তো শুনি?'

সুতরাং মিত্র সাহেবের কাছে ফ্রয়েডীয় abnormalism ও ভারতীয় supernormalism-এর ভিত্তিতে, পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব ও আত্মানং বিদ্ধির যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলাম, আমি নতুন করে মিসেস মিত্রকে তাই শোনালাম। ভারতীয় চিন্তার ভিত্তিতে জেমস জয়েসের ইউলিসেসেরও ব্যাখ্যা দিলাম।

মিসেস মিত্র খুশি হলেন। বললেন, সত্যি তোমার দেখবার ভঙ্গিটা একটু আলাদা।

আমি বললাম, জানেন, পিকাসোর analytical cubismও ভারতীয় দার্শনিক তত্ত্বের ভিত্তিতে।

—Strange! এমন কথা আগে শুনিনি তো? বল তো শুনি!

বললাম, পিকাসো analytical cubism-এ একটা দেহের নানা দিক একবারে আমাদের চোখের উপর তুলে দিয়েছেন। উদ্দেশ্য, একটা দেহ সম্পর্কে পূর্ণাঙ্গ ভিউ তুলে ধরা। Science-এর ভাষায় যাকে বলা হয় multidimensionl view। অবশ্য আন্তঃক্ষেত্রে ছিন্নবিচ্ছিন্ন মানুষকেও তিনি দেখাবার চেষ্টা করেছেন।

—এর অর্থ?

—কোনো দর্শনীয় জিনিসকে যদি multidimensional view-তে না দেখা যায় তাহলে তার সত্যরূপ জানা যায় না। আর মাল্টিডাইমেনশনাল ভিউ নিতে গেলে সম্ভবত কোনো জিনিসের বস্তুগত অস্তিত্বই আর থাকে না। পরম ব্রহ্মের মত নির্গুণ ও নিরাকার হয়ে যায়। যদিও analytic cubism-এ three dimensional একটা view আছে, কার্যত multidimensional view ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। পিকাসোর Guernica ছবিটা যদিও একটা ভয়াবহতার ছবি ফুটিয়েছে তবুও ছবিটাকে খুব ভাল করে বুঝতে গেলে, এক দৃষ্টিতে ছবিটার দিকে তাকিয়ে থাকলে ছবিটাই

অদৃশ্য হয়ে যেতে চায়। ফিউচারিস্ট শিল্পী মারিনেত্তির বক্তব্যই বোধহয় লক্ষ্য ঃ 'এ-যাবৎ চিত্রকরেরা ছবি রেখেছেন চোখের সামনে। এবার দর্শককেই বসিয়ে দেওয়া হবে ছবির মধ্যে।' পিকাসোর ছবি প্রসঙ্গে Lawrence Durrell-এর বক্তব্যটাও অনুধাবনযোগ্য, যেমন Key to Modern Poetry গ্রন্থে Beyond The Ego এই অধ্যায়ে পিকাসো প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বলেছেন, We understand man better when we see the whole in each of his parts, and we get nearer to a conception of the universe when we look upon him as part of a whole. এই অংশের মধ্যে সর্বব্যাপ্ততা ও সার্বিক অস্তিত্বের মধ্যে অংশের উপস্থিতি আমরা আরো ভাল করে বুঝতে পারব যদি physics-এর superstring থিয়োরি ভাল করে বুঝি। জগতের সর্বত্র একমাত্রার একটি অস্তিত্ব আছে বীণার তারের মত। তারের কোথাও ঝঙ্কার উঠলে তা ঢেউ খেলে সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। এই ঢেউগুলি ভিন্ন ভিন্ন crest ও trough-এতে ফুটে উঠলেও তারা মূল তার থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এখানে অংশের মধ্যে সর্বব্যাপ্ততা ও সার্বিকতার মধ্যে অংশ রয়েছে।

আমার বক্তব্য শুনে মিসেস মিত্র এক দৃষ্টিতে খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন, কোনো কথা বললেন না। শুভঙ্কর মিত্র বললেন, কেমন শুনলে?

মিসেস মিত্রের চোখ দিয়ে যেন ফাল্গুনের স্নিগ্ধ দখিন সমীরণ বইছে। খানিকক্ষণ সেই স্নিগ্ধ হাওয়া আমার দিকে ঠেলে দিয়ে বললেন, অনেকক্ষণ বকবক করিয়েছি তোমাকে দিয়ে। বোস, নিজের হাতে এবার কফি করে আনছি।

আমি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বললাম, না, এবার উঠব।

—কোথায় যাবে তুমি?

—বেহালা।

মিসেস মিত্র বললেন, আমি যাব তারাতলা মোড় পর্যন্ত। আমার মাসির বাড়ি ওখানে। মিলি আসছে এ খবরটা দেবার জন্যই যাব। আমার সঙ্গেই যাবে। আর এককাপ কফি হয়ে যাক। তোমরা লেখক মানুষ, কফি আর সিগারেটে তো আপত্তি থাকার কথা নয়।

মিত্র সাহেব বললেন, সিগারেট তো ও খায়ই না। কফির কাপেও আগ্রহের অভাব দেখছি। ড্রিঙ্কের নাম শুনলে সাত হাত দূরে সরে যায়।

দুই চোখে অপার কৌতুকের ভঙ্গি করে মিসেস মিত্র আমার দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, 'আমার হাতের কফি নিশ্চয়ই অপছন্দ করবে না?

তিনি উঠে গেলেন। আমি নিজের বুকের মধ্যে তোলপাড় সৃষ্টি করে সেই দৃষ্টির অর্থ ভেদ করবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

কফি শেষ হলে মিসেস মিত্রের সঙ্গে বেরোলাম। মিত্র সাহেব অফিস থেকে ফিরে

বড় একটা বেরোন না। দুনিয়া বিস্মৃত হয়ে তিনি বইয়ের জগতে ডুবে থাকেন। ফিয়াট কারে মিসেস মিত্র আমাকে প্রায় পাশেই বসালেন। ড্রাইভার গাড়ি চালাতে লাগল। মিসেস মিত্রের সমস্ত শরীর থেকে যেন অদ্ভুত একটা তাপ তরুণ ফাল্গুনের গোলাপি আভার মত ছড়িয়ে পড়েছে। ব্যাখ্যাতীত একটা গন্ধ যেন। আমার রোমান্টিব চেতনার সঙ্গে কোথায় যেন মিসেস মিত্রের বড় রকমের একটা মিল আছে। আমি কেমন বিহ্বল বোধ করতে লাগলাম।

মিসেস মিত্র বললেন, আবার কবে আসছ মৃগাঙ্ক?

বললাম, যখন বলবেন।

মিসেস মিত্র বললেন, যদি বলি রোজই।

আমি চুপ করে থাকলাম।

—আগামী রোববার তোমার কি কোনো প্রোগ্রাম আছে?

—কোনো প্রোগ্রাম নেই।

—তাহলে চলে এস না আমাদের এখানে।

—কেন?

—আমি মিউজিয়ামে যাব। প্রাচীন ভারতীয় কয়েকটি মূর্তি বিচার করে দেখব।

বললাম, আমি কিন্তু ফাইন আর্টসের লোক নেই। Modern হিস্টরি নিয়ে এম. এ. পাশ করেছি। ফাইন আর্টসের জগতে প্রবেশ করতে গেলে অনধিকার প্রবেশ করতে হবে।

মিসেস মিত্র বললেন, আমি সমালোচক হিসেবে তোমার মন্তব্য চাই না। Enough of academic criticism. এতে প্রাণ থাকে না। সৃজনী শক্তির স্পর্শও থাকে না। তোমার মধ্যে একটা অদ্ভুত সৃজনী ক্ষমতা আছে। এ-জন্য তোমার দেখবার দৃষ্টি আলাদা। রামকৃষ্ণ কালচারাল ইন্সটিটিউট-এ ডঃ শশীভূষণ দাশগুপ্ত বেদান্তের উপর কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বক্তৃতাগুলি গ্রন্থকারে বেরিয়েছে। এতে পাণ্ডিত্য আছে বটে, তবে কোথায় যেন অন্তরের স্পর্শের একটা অভাব আছে। সেই ক্ষেত্রে বিপিনচন্দ্র পালের 'Soul of India' বইখানি আমাকে মুগ্ধ করেছে। শিল্প সাহিত্যের ব্যাপারটা অ্যাকাডেমিক ফর্মে হয় না। এসব পুঁথিপুস্তকের মাধ্যমে কারো মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া যায় না। 'বাগীশ্বরী প্রবন্ধাবলীতে' অবনীঠাকুরের একটি মন্তব্য আছে শিল্পের রস আস্বাদন সম্পর্কে মৌমাছির একটি চাক রয়েছে, ভীমরুলেরও একটি চাক রয়েছে। মৌমাছি ও ভীমরুল দুই-ই বাইরে আছে। কি করে বোঝা যাবে যে, কোন্‌টি মৌমাছির চাক আর কোন্‌টি ভীমরুলের চাক? এগিয়ে গিয়ে নখ ঢুকিয়ে দিলেই বোঝা যাবে। যেটাতে মধু আছে সেটা মৌমাছির চাক, যেটাতে নেই সেটা ভীমরুলের চাক। শিল্প সাহিত্য তো বাইরে থেকে বিচারের জিনিস নয়। জন্মগত অধিকারের বিষয়। সৃজনী শক্তি থাকা চাই। দর্শনের গ্রন্থ তো অনেক পণ্ডিত ব্যক্তিই লিখেছেন। তবু 'রামকৃষ্ণ

কথামৃত' বা 'রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গে' পরমহংসদেবের মন্তব্যের সমকক্ষ কেউ হতে পারেননি কেন? সেটা একটা জন্মগত বোধের জন্য। তোমার মধ্যে সেই জন্মগত বোধ আছে।

কথা বলতে বলতে গাড়ি এসে থামল নিউ আলিপুর মোড়ে। মিসেস মিত্র বললেন, তোমার বাড়ি কতদূর? এগিয়ে দিয়ে আসব?

বললাম, না।

—আসছি তাহলে?

—আসুন।

—তুমি আবার আসছ তো?

—যাব।

—বাই, বাই, মিসেস মিত্রের গাড়ি ঘুরে গেল। আমি ভাবতে লাগলাম, শুধু ভাবতেই লাগলাম। কোনো সাধু-সন্ন্যাসী, অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন লোক, কারো কথাই মনে থাকল না। এমনকি আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য আরতির কথাও ভুলে গেলাম।

সাত

পরদিন অফিস ফেরতা আবার বসলাম আরতিকে নিয়ে সেই রেস্টুরেন্টে। আরতি বলল, আনন্দ, কেমন কাটল কাল তোমার, বল। মিসেস মিত্রের জোর তলব?

বললাম, জানো, আমাদের মিত্র সাহেবের মত মিসেস মিত্রও ওয়েল রেড লেডি। তোমারই মত ভদ্রমহিলারও একটা অরিজিন্যাল দৃষ্টিভঙ্গি আছে।

—তোমাকে জোর তলব করার কারণ?

—ওঁর মেয়ে আসছে আমেরিকা থেকে। আমেরিকান এক সাহেবকেই বিয়ে করেছে। ভারতীয় ভাস্কর্যের উপর বোধহয় কিছু একটা লিখতে চায়। ওর হাজব্যান্ডও হিন্দুদের দেবদেবী সম্পর্কে জানতে খুব আগ্রহী। আমার বইটাতে মিসেস মিত্র অনেক নতুন ইঙ্গিত পেয়েছেন। সেইজন্য এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে কথা বলতে আগ্রহী ছিলেন।

—ব্যবহারে উন্নাসিকতা নেই?

—সে রকমই ভয় করেছিলাম। কিন্তু দেখলাম, সে রকম কিছু নেই। মিত্র সাহেবেরই মত খুব করডিয়াল। আমাকে নিজেই কারে করে তারাতলা মোড় পর্যন্ত পৌঁছে দিলেন। একটা জিনিস ভারি আশ্চর্য লাগল—

—কী? আরতি আমার দিকে তাকাল।

মিত্র সাহেবের তো অনেক বয়স, কিন্তু মিসেস মিত্রকে দেখে বয়স অনুমান করার

উপায় নেই।

—দেখতে?

বললাম, এক কথায় ভাল। আর্টিস্টের দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করতে গেলে হয়তো নানা ত্রুটি চোখে পড়বে কিন্তু সব ছাপিয়ে অদ্ভুত একটা প্রাণশক্তি আছে।

অদ্ভুত একটা intuition আরতির। বলল, আবার তোমাকে যেতে বলেছে নিশ্চয়ই?

অবাক হয়ে তাকালাম আরতির দিকে, কী করে বুঝলে?

আরতি বলল, বুঝি।

—হয়তো ভদ্রতার খাতিরেই যেতে বলেছেন।

হেসে আরতি বলল, না।

—না মানে?

—আন্তরিক ভাবেই বলেছেন।

—তুমি কী করে বুঝলে?

—তুমি দেখো।

বললাম, ঠাট্টা করছ?

—ঠাট্টা করব কেন? তুমি দেখো, আমি ঠিকই বলেছি।

আরতির দিকে একটু তাকিয়ে দেখলাম। মনে মনে ওকে একটু বিচার করে দেখবার চেষ্টা করলাম। আরতির রঙ শ্যামলা হলে কী হবে, সমগ্র দেহে অদ্ভুত এক শিল্পের ছাপ। যেন একখণ্ড জীবন্ত ভারতীয় ভাস্কর্য। কিন্তু মনের মধ্যে অদ্ভুত এক রহস্যময়তা। কখনও শিল্পের অনাবিল সৌন্দর্য ফুটে ওঠে ওর ব্যবহারে, সহজ শিল্পের মত একটা মধুর অন্তরঙ্গতা প্রকাশ পায়। কখনও ও অত্যন্ত খেয়ালি হয়ে ওঠে। তখন ওকে ঠিক বোঝা যায় না। মেয়েদের সম্পর্কে যে শাস্ত্রবচন আছে 'দেবা ন জানন্তি' আরতি অনেকটা তাই। হয়তো এই রহস্যময়তাই মেয়েদের আকর্ষণ। অত্যন্ত সহজ যদি ওরা হত, অত্যন্ত সহজে যদি ওদের জানা যেত, তাহলে হয়তো পুরুষের কাছে মূল্য কমে যেত। দু' একদিন ওর আন্তরিকতা দেখে মনে হয় আমার জীবনের সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে ওকে বেঁধে নেওয়া যেতে পারে। কিন্তু কখনও কখনও এমন গম্ভীর হয়ে যায়, এমন একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি হানে আমার দিকে যে, মনে মনে আঘাত পাই। এগিয়ে যেতে সাহস পাই না। মনে হয়, ও আমাকে একেবারেই পছন্দ করে না।

অফিস থেকে বেরোনো অবধিও আরতির মধ্যে অন্তরঙ্গতার অভাব ছিল না। রেস্টুরেন্টে ঢোকা অবধিও ও যেন ছিল আমার কাছে অত্যন্ত স্বচ্ছ। কিন্তু হঠাৎ মিসেস মিত্র প্রসঙ্গে কথা উঠবার পরই কেমন যেন হেঁয়ালি হয়ে উঠেছে। দেখলাম, তাড়াতাড়ি চা খাওয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াল। অন্যান্য দিন চা খাওয়া শেষ হবার

পরও ও একটু বসে, কথা বলে। প্রয়োজন হলে আরও দু' কাপ চা অর্ডার দিতে বলে। কিন্তু অকস্মাৎ কথা বন্ধ করে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। কোনো কথা বলল না। জিজ্ঞাসা করলাম, কোনো তাড়া আছে আরতি?

আরতি বলল, রোজ রোজ দেরি হচ্ছে। বাড়ি ফিরে ছোট ভাই বোনোদের লেখাপড়া একটু দেখাতে হয়। ওরা খুব suffer করছে।

উঠে দাঁড়িয়ে কেবিন ছেড়ে সটান বেরিয়ে গেল ও। আমি পয়সা মিটিয়ে দিয়ে দ্রুত হেঁটে ওর পেছনে পেছনে এলাম। কিন্তু আরতি তবু চুপ করে থাকল। পাশাপাশি দাঁড়িয়ে রইলাম। কিন্তু ও কোনো কথা বলল না। অকস্মাৎ আরতির মনের আকাশে এই মেঘরোদ্দুরের খেলা কেন, আমি কিছুতেই বিচার করতে পারলাম না। একই বাসে উঠলাম। ওর টিকিটটাও কেটে দিলাম। কিন্তু ও কোনো কথা বলল না। ওর টিকিটটা ওর হাতে দিয়ে তারাতলা নেমে গেলাম, আসি।

ও ছোট্ট করে ঘাড় কাত করল শুধু, আর কিছু নয়।

বাস থেকে নেমে আর কোনো বাসে চাপলাম না, আপন মনে হাঁটতে লাগলাম। ভেবেছিলাম মিসেস মিত্রের সঙ্গে আমার আলোচনার ডিটেল ওকে বলব। আরতি আমার বক্তব্যকে এপ্রিসিয়েট করবে। সাধারণত এ-সব ব্যাপারে ওর এপ্রিসিয়েশন অত্যন্ত সুন্দর। কিন্তু সবটাই যেন কেমন উল্টে গেল। মানুষের পরিকল্পনা মত সব কিছু চলে না। এই জন্যই বোধহয় বলা হয়েছে, Man proposes God disposes. মিসেস মিত্র আমার মধ্যে যে বসন্তের উন্মাদনা সৃষ্টি করেছিলেন তাও যেন উবে গেল। ফাল্গুনের আকাশের পরিবর্তে শ্রাবণের একটা ঘনমেঘ জমাট বেঁধে উঠল বুকের মধ্যে।

পরদিন অফিসে এসে ভাবলাম, আজ আর আরতির খোঁজও করব না, দেখাও করব না। কিন্তু কী একটা অদৃশ্য সুতোর টান যেন আছে ওর হাতে, ঠিক আমার কেবিনে ঢোকার আগে ওর সিটে একবার উঁকি দিয়ে গেলামই ভাল?

আজ আরতির মুখ যেন হাসি-হাসি। ঘাড় কাত করে কুশল সংবাদ জানাল।

টিফিন পিরিয়ডে ওর টেবিলের সামনে এসে খবর নিয়ে গেলাম, আজ খুব তাড়া আছে?

ও হেসে বলল, না।

—তাহলে একসঙ্গে যাব?

দুটি উজ্জ্বল চোখ নাড়ল ও।

ফেরার পথে আবার পেলাম সেই আরতিকে, যে একটা নতুন লেখকের পক্ষে দারুণ প্রেরণার উৎস, যে একজন লেখকের কলমে সৃষ্টির উচ্ছ্বাস এনে দিতে পারে। হঠাৎ খুশিতে এবং ভাল লাগায় মনটা ভরে উঠল। মুহূর্তের মধ্যে সব কিছুকেই আবার ভাল লাগল। আবার মনে পড়ে গেল নক্ষত্রের ইশারা দেওয়া মিসেস মিত্রের চোখ দুটি। আগামী কাল রোববার। মিসেস মিত্রের সঙ্গে যাবার কথা মিউজিয়ামে।

বুকের মাঝখানটা মুষড়ে উদ্বেল হয়ে উঠল যেন।

পরদিন নির্দিষ্ট সময়ে মিত্র সাহেবের বাড়ি গেলাম। মিত্র সাহেব বাড়ি ছিলেন না। মিসেস মিত্র বললেন, বোর্ড অব ডিরেক্টরস-এর জরুরী মিটিং আছে। সত্যি, জীবনে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিদের গৃহসুখ বলতে বোধহয় কিছুই নেই।

মিসেস মিত্র তৈরি হয়েই ছিলেন। যেতেই বললেন, চলো।

বললাম, একেবারে রেডি!

—অনেকক্ষণ রেডি হয়েছিলাম। ঘড়ি দেখছিলাম। তুমি খাওয়া-দাওয়া সেরে এসেছ তো?

—হ্যাঁ।

—চলো, তাহলে।

মিসেস মিত্রের সঙ্গে গাড়িতে গিয়ে উঠলাম।

কলকাতার জাদুঘরে ভারতীয় ভাস্কর্য-শিল্পের উল্লেখযোগ্য নমুনা কমই আছে। যা আছে তার ব্যাখ্যাও অনেকেরই জানা নেই। বোঝা গেল মিসেস মিত্র বহুবার এ জাদুঘরে এসেছেন। মিসেস মিত্র নিজেই এ সবের ব্যাখ্যা করলেন। নতুন কোনো ব্যাখ্যা আমার জানা আছে কি না জিজ্ঞাসা করলেন। দু'একটার আমি নতুন ব্যাখ্যা দিলাম। মুসলিম আর্ট সম্পর্কে দু' একটা নতুন কথা বললাম। হিন্দু চিন্তাধারার সঙ্গে এর কোথায় একটা নিকট সম্পর্ক আছে তাও বোঝালাম। মিসেস মিত্র নোট করে নিলেন। এরপর একসময় আমাকে নিয়ে তিনি লনে বসলেন। ফ্লাস্ক থেকে গরম কফি খাওয়ালেন। মিসেস মিত্রের সমস্ত দেহে যেন সেই ফাঁকে আমি যৌবনের একটা উত্তাপ লক্ষ্য করতে পারলাম।

মিসেস মিত্র হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করলেন, আচ্ছা মৃগাঙ্ক তুমি ঈশ্বরে বিশ্বাস কর?

বললাম, রক্তের স্রোতে পূর্বপুরুষের বিশ্বাসের সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসের একটা ধারা বয়ে এসেছে। সেইজন্য করি। কিন্তু অনেক সময়ই ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমার সন্দেহ হয়।

—কেন?

—ঈশ্বর যদি থাকবেন, তাহলে সমগ্র পৃথিবীতে অন্যায়ের এত প্রাধান্য কেন? দুষ্কৃতকারীরাই কেন সুখে আছে?

মিসেস মিত্র বললেন, সৃষ্টির নিয়ম অনুসারেই এটা হয়। একসময় ধর্ম প্রবল হয়, ধর্মের মধ্যে সত্ত্ব গুণের প্রাধান্য থাকে। ধীরে ধীরে আবার রজঃ ও তম গুণ প্রবল হয়ে উঠে। ধর্মের গ্লানি দেখা দেয়। ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য আবার ঈশ্বর অবতার রূপে আসেন। শুধুমাত্র যদি সত্ত্ব গুণের প্রভাব বেশি হত পৃথিবীতে তা হলে ঘাত

সংঘাত কিছুই থাকত না। জগৎ অর্থ যা চলে। ঘাত-প্রতিঘাতে কোনো বৈচিত্র্য দেখা না দিলে জগতের গতি ফুটত না। আমি যদি বলি ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই এমন হয়?

আশ্চর্য হয়ে তাকালাম মিসেস মিত্রের দিকে। পশ্চিমী শিক্ষায় তিনি শিক্ষিতা বলে আমার ধারণা ছিল। কিন্তু ভারতীয় চিন্তাধারা সম্পর্কেও তিনি ওয়াকিবহাল এটা ভাবতে পারিনি।

মিসেস মিত্র বললেন, অনেক সময়ই আমরা পৃথিবীর অনেক ঘটনাকে ঈশ্বরের অবিচার বলে মনে করি। কিন্তু তা সত্য নয়।

—কী রকম?

মিসেস মিত্র বললেন, জানো, একসময় ডিরোজিও ঈশ্বরের অস্তিত্বে অবিশ্বাস করে নানা আর্গুমেন্ট দিয়ে ছাত্রদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন। একটি উদাহরণ দিতেন খুব। ঈশ্বরের বিচার যে সুস্থ নয়, তার প্রমাণ, একটি গাছের বহু ফুল অকারণে ঝরে পড়ে। এ ফুলগুলি থাকলে বহু ফল হতে পারত। কিন্তু ডিরোজিও জানতেন না যে, ফুলের মধ্যে দু'ধরনের ফুল আছে—পুরুষ ফুল আর নারী ফুল। প্রজাপতি ও ভ্রমর পুরুষ ফুলের বুকে বসে তার রেণু পায়ে মেখে নিয়ে নারী ফুলের গর্ভকেশরে বসে। পুরুষ ফুলের বীজরূপ রেণুর সঙ্গে নারী ফুলের গর্ভরেণুর মিলন হয়ে ফল হয়। পুরুষ ফুলের আর কোনো প্রয়োজনীয়তা থাকে না। সেই কারণেই সে ঝরে পড়ে।

মিসেস মিত্রের ব্যাখ্যা শুনে আমি রীতিমত চমকে গেলাম। তার দুই রহস্যময় চোখের দিকে আবার আমি তাকালাম। এত আলোর দীপ্তিতে ভরা চোখ, অথচ এত রহস্যময় যে কী বলব! আরতির হঠাৎ খেয়ালও বোধহয় এ রহস্যের কাছে কিছু নয়।

মিসেস মিত্র আরও সুন্দর করে বোঝালেন আমাকে ইকোলজি ব্যাখ্যা করে। বললেন, দেখো, বনে বাঘ হরিণ ধরে খায়। ব্যাপারটা দুঃখজনক। কিন্তু বাঘে যদি হরিণ না খেত, হরিণের সংখ্যা এত বেড়ে যেত যে, মাঠ-ময়দান হরিণে ভরে যেত। হরিণের খাবার মত তৃণের অভাবও ঘটত। খাবার অভাবেই হরিণেরা মারা পড়ত। বাঘে খায় বলে balance থাকে। এক্ষেত্রেও অদ্ভুত খেলা দেখো : হরিণ বেড়ে গেলে বাঘে খেতে আরম্ভ করে। হরিণ খেয়ে খেয়ে বাঘের সংখ্যা বেড়ে যায়। হরিণের সংখ্যা কমে যায়। হরিণের সংখ্যা কমে গেলে বাঘের খাদ্যের অভাব ঘটে। বাঘ মরতে থাকে। বাঘের সংখ্যা কমে যায়। আবার হরিণের সংখ্যা বাড়তে থাকে। এইভাবে ঘাত-সংঘাতে জীবন একটা balance-এর মধ্যে চলে। ধর্ম ও অধর্ম, দুই-ই বাঘ ও হরিণের মত অনেকটা। খুব বেশি কেউ বাড়তে পারে না। চিনের তাও বৃত্ত দেখেছ তো? মাঝখানে ত্রিভঙ্গ দিয়ে ভাগ করা। বিভক্ত রেখাটি অনেকটা S-এর মত দেখতে—অর্থাৎ আমাদের গুণক্ষোভের মত—সত্ত্ব, রজ ও তম গুণের বিক্ষোভের মত। একদিকে তার ইয়াং অপরদিকে ইন। একটি প্রকৃতি, অপরটি পুরুষ।

একটি জগৎ সৃষ্টি করে, একটি তাকে গ্রাস করে। কিন্তু কোনোটাই নির্দিষ্ট একটি দূরত্বের বেশি যেতে পারে না। কারণ, তাহলে সৃষ্টি সম্ভব হত না। ফলে নির্দিষ্ট দূরত্বে যাওয়া মাত্রই একটি অপরটিকে টেনে ধরে সাম্য রক্ষা করে। কারো খুব বেশি রকম বৃদ্ধি হলে জগৎ চলে না। সত্ত্ব গুণই যদি একমাত্র গুণ হয়, সমস্ত সংসার সন্ন্যাসী হবে, সংসার বৈরাগী হবে, সৃষ্টি ধ্বংস হবে। রজঃ গুণ প্রবল হলে ক্ষাত্রতেজে যুদ্ধবিগ্রহই একমাত্র পরিণতি হবে। ফলে জগৎ ধ্বংস হবে। তম গুণের আধিক্য হলে বর্তমানের মত ধর্মের গ্লানি হবে। এক একসময় এক একটা বাড়ে। সৃষ্টির ক্ষেত্রে এইভাবে ইকোলজি কাজ করে। এ না হলে জগৎ চলত না। সুতরাং এ-জন্যে ঈশ্বরের উপর দোষারোপ করে লাভ নেই।

অভিভূত ভক্তের মত আমি মিসেস মিত্রের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। তাঁর হিরের টুকরোর মত জ্বলজ্বলে চোখে যেন হাসির ছটা ফুটে বেরোচ্ছে। বললাম, আপনি আমাকে বিদ্রুপ করছেন?

মিসেস মিত্রের গালে টোল খেল। দুই গোলে সূক্ষ্ম গোলাপি আভা। বললেন, কেন?

—আপনি এত জানেন, অথচ আমার কাছে না জানার ভান করছেন?

মিসেস মিত্র বললেন, আমি হয়তো একটা জিনিস জানি, তুমি আর একটা। এ জগতে কোনো একটা মানুষই পরিপূর্ণ নয়। সবার কাছ থেকেই সবার কিছু শিক্ষণীয় আছে।

উচ্ছ্বাসে ভেঙে পড়ে বললাম, জানেন, আপনার মত এমন highly cultured মহিলা আমি জীবনে দেখিনি। আমাদের অফিসের টাইপিস্ট আরতি দত্তেরও বেশ টেস্ট আছে। অনেক পড়াশোনাও আছে। কিন্তু আপনার মত এমন ডেপ্‌থ নেই।

মিসেস মিত্র হঠাৎ বোধহয় দৃষ্টিটা একটু ধারালো করে আমার দিকে তাকালেন আরতির সঙ্গে তোমার বোধহয় খুব ভাব?

—ভাব মানে, আরতিও আপনার মত শিল্প-সাহিত্য খুব ভালবাসে।

কী একটু আমার দিকে তাকিয়ে দেখলেন মিসেস মিত্র। তারপর প্রসঙ্গটা আর তুললেন না। হঠাৎ বললেন, আমার একটা প্রশ্নের জবাব দিতে পার মৃগাঙ্ক?

তাঁর চোখের দিকে তাকালাম, কী?

—একটা মানুষকে আর একটা মানুষের হঠাৎ ভাল লেগে যায় কেন? সবাইকে আবার ভাল লাগে না কেন?

বললাম, এ প্রশ্নটা আমারও, জানেন। কখনও কখনও মনে হয় দুটো মানুষের চারিত্রিক সামঞ্জস্য আছে বলে একে অপরকে ভালবাসে। আবার মনে হয়, তাই বা হবে কেন? একজনের মধ্যে যা আছে অপরের মধ্যে সে তা পেতে চাইবে কেন? বরং দুটো বিপরীত চরিত্রের মানুষই একে অপরকে পছন্দ করে। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে বিচার করলে এ ধরনের বক্তব্যের সপক্ষে কোনো সমর্থন পাওয়া যায় না। তখন

হিন্দুদের মতই ভাবতে ইচ্ছে করে যে, এ-সব পূর্বজন্মের পরিচয়ের ফলেই হয়।

—পূর্বজন্ম, আত্মা, এ-সব তুমি মানো?

প্রত্যক্ষ কোনো অভিজ্ঞতা নেই আমার। সুতরাং স্বীকারও করতে পারি না, অস্বীকারও করতে পারি না।

মিসেস মিত্র বললেন, কিন্তু এসব আছে জানো।

জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালাম, কি করে আপনি বুঝলেন?

মিসেস মিত্র বললেন, একজন তান্ত্রিক সাধকের সঙ্গে আমাদের পারিবারিক পরিচয় আছে। তোমাদের মিত্র সাহেব প্রায়ই সেখানে যান। আমিও যাই। আমাদের ভবিষ্যতের কথা আগে থাকতেই উনি বলে দেন। ফলেও। মিলি যে একজন আমেরিকান ছেলেকে বিয়ে করবে এ-কথা তিনি আগেই বলে দিয়েছিলেন। ছেলেটির বর্ণনাও দিয়েছিলেন। ঠিক তাই হল—ছেলেটির ফোটোর সঙ্গে ওঁর বর্ণনা মিলে গেল। তোমাদের ডিরেক্টর সাহেবের পদোন্নতির কথাও উনি আগেই বলে দিয়েছিলেন। কিছুদিন আগে আমাকে বলেছিলেন—

—কী?

হঠাৎ দেখলাম কেমন একটা উদাসীন ভাব মিসেস মিত্রের মধ্যে। আপন মনে কিছুকাল শূন্যের দিকে তাকিয়ে থাকলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, থাক।

—'বলতে আপত্তি আছে?' আমি প্রশ্ন করলাম।

উনি নিজের নখগুলির উপর খানিকক্ষণ কি তাকিয়ে দেখলেন, তারপর বললেন, শুনলে তুমি বিশ্বাস করবে?

—কেন করব না?

উনি বলেছিলেন, অল্পদিনের মধ্যেই এমন একটি লোকের সঙ্গে আমার পরিচয় হবে, যে পৃথিবীতে একদিন একজন বিখ্যাত ব্যক্তি হবে। প্রচুর প্রাণশক্তিতে নাকি ভরপুরে হবে সে!

কৌতূহলে জিজ্ঞাসা করলাম, এমন কারো সঙ্গে আপনার পরিচয় হয়েছে?

মিসেস মিত্র হাসলেন। তারপর বললেন, জানো, তারপর প্রতি রাতেই আমি একজনকে স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

—কাকে?

মিসেস মিত্র সে-কথার কোনো জবাব না দিয়ে বললেন, তারপরেই মিস্টার মিত্র অফিস থেকে তোমার বইখানা নিয়ে এলেন। বইয়ের পেছনে লেখক পরিচিতিতে তোমার ফোটো ছিল।

—হ্যাঁ!

মিসেস মিত্র বললেন, সেই জন্যই আমি মিস্টার মিত্রকে বারবার তোমাকে আমাদের ওখানে নিয়ে যেতে বলেছিলাম। তুমি একদিন সত্যি খুব বড় হবে মৃগাঙ্ক।

—আপনি কী করে বুঝলেন?

ফাল্গুন যেন গোলাপের পাপড়ির মত টাট্‌কা হয়ে ফুটে উঠেছে মিসেস মিত্রের মুখে। বললেন, এখনও তুমি বুঝতে পারছ না?

—না তো!

—আমি যে তোমাকেই দেখেছি!

আশ্চর্য হয়ে আমি মিসেস মিত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। মিসেস মিত্রের সমস্ত অন্তরাত্মা থেকে যেন একটা পরিচয়ের গন্ধ ছুটে আসছে। যেন কোন্ এক স্মরণাতীত কালে মহাশূন্যের কোনো এক কেন্দ্রে অকস্মাৎ তীব্র বেগে ইচ্ছার বিস্ফোরণের মুখেই একদা জন্ম হয়েছিল আমাদের। জন্ম-জন্মান্তরের পরিচয়ের ইতিহাস সঞ্চিত আছে আমাদের পেছনে। সেই সঞ্চিত ইতিহাস জন্মান্তরের নতুন দেহের অন্তরাল থেকে ফুটে উঠতে চাইছে। তাই প্রথম দর্শনেই এমন আশ্চর্য ভাবে আমাকে চমকে দিয়েছিলেন মিসেস মিত্র। পরিচয়ের এমন একটা নিবিড় গন্ধ ফুটে উঠছিল তাঁর মধ্য থেকে যে, আমি বিমুগ্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলাম তাঁর দুই চোখের দিকে। কোন্ সুদূরলোক থেকে যেন পরিচয়ের গন্ধ ভেসে আসছে। আমি তাকিয়ে থাকলাম। অনেক, অনেকক্ষণ নিষ্পলক দৃষ্টিতে দু'জনেই তাকিয়ে থাকলাম দু'জনের চোখের দিকে। কোথাও, পূর্বজন্মে হয়তো আমাদের পরিচয় ছিল। সেই ইতিহাসকে হয়তো স্মরণের মধ্যে টেনে আনবার চেষ্টা করলাম। মিসেস মিত্রের দুই চোখের মণির মধ্য দিয়ে যেন মহাশূন্যের এক সীমাহীন ব্যাপ্তি মাঝে মাঝে উঁকি দিচ্ছে। কখনও কখনও লাভাস্রোতের মত মহাশূন্যে আগুনের তরল বিস্ফোরণ হচ্ছে। সৃষ্টির আদি প্রহর কেঁপে উঠছে হয়তো। কখনও কখনও নীল মহাশূন্য লাবণ্য বিস্তার করছে। আদি অন্তহীন এক সৃষ্টির ইতিহাস যেন। কোনো কূলকিনারা পাওয়া যায় না, থই পাওয়া যায় না। জগতের সমস্ত লিখিত ঘটনার উর্ধ্বেও একটা অলিখিত ইতিহাস আছে। চিরাচরিত নিয়মের বাইরেও কোথায় যেন একটা নিয়ম আছে। জগতে কেন যে কখন কোনো ঘটনা ঘটে এর জবাব বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টাও দিতে পারবেন কিনা কে বলবে! আমার সেই জ্যোতিষী আমাকে বলেছিলেন যে, জীবনটা একটা প্রাক্তনের সংস্কার দিয়ে তৈরি করা রেকর্ড মাত্র। সময়ের পিন এক এক পর্যায়ে সেই রেকর্ডের এক এক অংশের উপর দিয়ে চলে যায়। যখন যে অংশের উপর দিয়ে চলে যায় তখন সেই অংশের সঙ্গীতটুকু বেজে উঠে। আমাদের কাছে আশ্চর্য মনে হয়; কিন্তু ঘটনা ঘটেই আছে।

কে জানত যে, জীবনের এই অধ্যায়ে এমন বিচিত্র একটি কাহিনির সঙ্গীত রচিত হয়ে আছে! আমি কল্পনা করিনি, আমি ভাবিনি, তবু তো ঘটে গেল। কোন্ পুতুল-নাচানেওয়ালা খেলোয়াড় যে এমন খেলা খেলায়! সে হয়তো ভাবে পুতুলের প্রাণ নেই। কিন্তু পুতুলের যে প্রাণ আছে!

আট

নিজের মনের উপর মানুষের নিজের কোনো অধিকার নেই। অন্তত সাধারণ মানুষের নেই। আর নেই বলেই জীবনে নানা বিচিত্র সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় মানুষকে। আমার মনের যথার্থ আকাঙ্ক্ষা কি, আমি যেন নিজেই বুঝতে পারছি না। অফিসে যখন আসি তখন একটা স্নিগ্ধ নীল আকাশের মত আরতিকে বড় ভাল লাগে। ওর গভীর সহানুভূতি আর প্রেরণা আমাকে যেন জীবনের ক্ষেত্রে একটা নতুন আকর্ষণ দেয়। কিন্তু কখনও কখনও গোলাপের পাপড়ির মত মিসেস মিত্রের মুখখানা যখন মনে পড়ে, তাঁর দুই চোখের তারায় যখন বসন্তের চিত্র স্মরণ করি তখন যেন অদ্ভুত আর একটা প্রাণশক্তি আমাকে উজ্জীবিত করে। নিয়মকানুন, বয়স, সমাজবন্ধন কিছুই যেন সীমারেখার বাঁধন দিয়ে ধরে রাখতে পারে না। মায়াবি রাবণের অভিনয়ে সীতা যেমন লক্ষ্মণের গণ্ডি অতিক্রম করে বাইরে গিয়েছিলেন, তেমনই দুর্বিনীত মন সমস্ত অনুশাসন অতিক্রম করে বেরিয়ে পড়তে চায়। এক হৃদয়ে দ্বৈতের এমন বিচিত্র লীলা আমাকেই যেন কেমন অভিভূত করে দিচ্ছে। মনের যে আসল আকাঙ্ক্ষা কী, আমি অনেক সময় নিজেই বুঝতে পারি না। দু'-জনের প্রতি একই সময় এমন অদ্ভুত দুর্বলতা গড়ে উঠতে পারে কী করে! সমস্ত মানুষের মনেই কি এমন দ্বৈতের বিচিত্র লীলা আছে? যদি থাকে, কেন? এর কারণ কী এই যে, মানুষের মূল লক্ষ্য পরিপূর্ণতা? কোনো একক মানুষের মধ্যে এই পূর্ণতা নেই বলে, বিচিত্রের মধ্যে পূর্ণের এক একটি অংশ দেখে সেই জন্য বিভিন্নের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে? আরতির মধ্যে একদিকে আছে নারীত্বের কমনীয় দিক, আর একদিকে আধুনিক মানসিকতা। কিন্তু যৌবনের উদ্দাম, বেহিসেবী উচ্ছৃঙ্খলতা নেই। মিসেস মিত্রের মধ্যে আধুনিকতা আরতির আধুনিকতার মতই দীপ্তিময়ী বরং আর একটু বেশি। কিন্তু যৌবনের উদ্দামতা যেন দামাল।

কত বয়েস মিসেস মিত্রের, এক একবার চিন্তা করি। যে বয়সে অধিকাংশ বঙ্গরমণীই ভগ্নস্বাস্থ্য স্ফীতবপু গৃহিণী, সেই বয়সে মিসেস মিত্রের মধ্যে যৌবনের উদ্দামতা যেন একটি তন্বী রমণীর উদ্দামতার চাইতেও অনেক বেশি। এর কারণ কি এই যে, তাঁর জীবনের মূল খাতে প্রাচীন নদীর তলদেশের মত পলিমাটির আস্তরণ ঘন, পুরু এবং উঁচু? আবার তরুণ একটা নদীর মত হওয়া কোনোদিনই সম্ভব নয়? অথচ যদি কখনও বৃষ্টির ঢল নামে, সে রেশ সামলাতে পারে না? দামোদরের মত কূল ছাপিয়ে বন্যা সৃষ্টি করে? হয়তো বা তাই। সেই জন্য অদ্ভুত এক দুর্বার প্রাণ-স্রোত দেখা দিয়েছে তাঁর মধ্যে। আর সেই প্রাণস্রোতের টান এত প্রবল যে, আমি সেই আবর্তের মধ্যে পড়ে দিশেহারা হয়ে পড়ছি। কোনো কিছু আঁকড়ে ধরার সময়

পর্যন্ত পাচ্ছি না।

মিসেস মিত্রের স্বপ্ন কি সত্যি? তাঁর জ্যোতিষীর রিডিং কি সত্যি? তা যদি হয়, তাহলে বলতেই হবে যে, অদ্ভুত এক নিয়তিই এমন করে আমাদের টানে। আমাকেও টানছে, মিসেস মিত্রকেও। সম্ভব-অসম্ভবের বিচার করবার ক্ষমতা তাঁরও নেই, আমিও হারিয়ে ফেলেছি। আরতিও হয়তো নিয়তির সেই বিচিত্র বিধানেই আমার জীবনে এসে জুটেছে, এবং আমিও তার জীবনে এসে জুটেছি। নিয়তির এই মহা বিচিত্রের স্রোত কোথায় যে নিয়ে আমাদের ফেলবে, কে জানে!

আরতির সঙ্গে মাঝে মাঝেই ফিরি বটে, কিন্তু রোজই এখন আর ফেরার আমার সৌভাগ্য হয় না। মাঝে মাঝেই মিসেস মিত্র গাড়ি নিয়ে ছুটির মুখে অফিসে এসে হাজির হন। স্বয়ং মিত্র সাহেবকে ড্রাইভ করে বাড়ি নিয়ে যান। আমি হয়তো পরিকল্পনা করেছি আরতির সঙ্গে ফিরব, হঠাৎ মিসেস মিত্র প্রস্তাব দেন, চলো আমাদের সঙ্গে। উপায় থাকে না। যেতেই হয়।

একদিন আরতি আমাকে রেস্টুরেন্টে কফি খেতে খেতে বলল, জানো, মিসেস মিত্রের তোমাকে খুব পছন্দ হয়ে গেছে।

মিসেস মিত্র যখন চোখের সামনে এসে দাঁড়ান তখন কাচপোকার মুখে শুঁয়ো পোকার মত আমি যেন কেমন বিহ্বল হয়ে যাই। কেউ যদি তাঁর নাম করে, তাহলেও বুকের ভেতর কেমন অনুরণিত হয়ে উঠে। এমনকি আরতির মুখে সে নামটা শুনলেও বুকের কোন্ অংশে যেন একটা ফাল্গুনের নৃত্য অনুভব করি। আরতির মুখে মিসেস মিত্রের কথা শুনে সেইরকম একটা আলোড়ন আমি নিজের মধ্যে অনুভব করলাম। কিন্তু সেই ভাবটা চেপে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম,—মানে? আরতি চোখে এক ঝলক বিদ্যুৎ খেলিয়ে বলল, তোমাকে পছন্দ হয়েছে!

আরতির চোখের দিকে তাকালাম। তার চোখে সচরাচর এমন একটা বিদ্যুৎ খেলে না। আমার মনের মধ্যে তখন বোধহয় একটা গোপন আকাঙ্ক্ষা লাফাচ্ছে 'পছন্দ হয়েছে' বলতে আরতি কি বলতে চায়? আমাকে ভাল লেগেছে বা ভালবেসেছে? মিসেস মিত্রের ব্যবহার, কথা, জাদুঘরের লনে নিবিড় চোখের দৃষ্টি, যে-কোনো ব্যক্তিকে স্পষ্ট বলে দিতে পারে যে, এ দৃষ্টি আকর্ষণের, প্রেমের, ভালবাসার। তবুও, যে যার কাছ থেকে ভালবাসা কামনা করে তার ভালবাসার স্বরূপ যথার্থ হদিশ করতে পারে না। যদি পারত ভালবাসার তবে হয়তো কোনো মূল্যই থাকত না। থাকে না বলেই ভালবাসা প্রবল হবার সুযোগ পায়। তাই স্পষ্ট ভাবে আরতির কাছ থেকে জানতে চাইলাম 'পছন্দ হয়েছে' বলতে সে কি বোঝাতে চাইছে।

আরতি এবার স্পষ্ট করে বলল, তোমাকে মিসেস মিত্র ভালবেসে ফেলেছেন।

আশ্চর্য হবার ভান করে বললাম, সে কী করে সম্ভব!

—কেন নয়?

—তাঁর বয়স, তাঁর সম্মান, সমাজ, স্ট্যাটাস—তার কোনোটাই তো এ ধরনের উদ্ভট চিন্তাকে প্রশ্রয় দেবে না।

আরতি বলল : Love knows no law.

আমি স্পষ্টভাবে আরতির চোখের দিকে তাকালাম এবার। মিসেস মিত্রের মত আরতির অত সৌন্দর্য নেই, কিন্তু অদ্ভুত ধরনের একটা কঠোর ব্যক্তিত্ব আছে। সেই ব্যক্তিত্বে তার কাছে যখন আমি থাকি সে আমাকে আচ্ছন্ন করে। সেই জন্য আরতির কাছে যখন থাকি আরতিই আমাকে বেশি টানে।

আরতিকে বললাম, Love knows no law কথাটি যদি সত্যি হয়, তাহলে বলব তুমি আমাকে ভালবাসতে পারনি!

আরতি দুই চোখে প্রশ্ন তুলে আমার দিকে তাকাল।

আমি বললাম, তোমার ভালবাসা কখনও উদ্দাম হতে পারছে না। আইনের অনুশাসন ভেঙে কখনও বেরিয়ে আসতে পারছে না।

আরতি ব্যাখ্যার অতীত দৃষ্টি তুলে অনেকক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইল, কোনো কথা বলল না।

জিজ্ঞাসা করলাম, কই কিছু বললে না তো?

আরতি উঠে দাঁড়াল, বলল, চলো।

আরতির মধ্যে এ ধরনের ব্যবহার একটা অদ্ভুত প্রহেলিকায় আচ্ছন্ন। আমি এর কোনো অর্থ ভেদ করতে পারি না!

দু'দিন পরে হঠাৎ একটি ঘটনায় মনে বেশ আঘাত পেলাম। যথারীতি অফিসে এসেছি। আমার নিজের কেবিনে যাবার মুখে রোজ যেমন একবার আরতির টেবিলের কাছ দিয়ে যাই, তেমনি গেলাম। রোজ যেমন তাকে জিজ্ঞেস করি, কেমন আছ, জিজ্ঞাসা করলাম। কিন্তু রোজ যেমন আরতি উজ্জ্বল দুটি চোখ তুলে হাসে, তেমন হাসল না। কথার কোনো প্রত্যুত্তর করল না। টেবিলে ঝুঁকে পড়ে কী একটা যেন দেখছিল, দেখতেই লাগল। অর্থাৎ ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাকে এড়িয়ে গেল, বা আমাকে অপমান করল।

মনটা দারুণ খারাপ হয়ে গেল। সারাদিন ভালভাবে কাজ পর্যন্ত করতে পারলাম না। মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা খচ্ খচ্ করে বিঁধতে লাগল। একটা জেদ চেপে গেল, এর কারণ আমাকে জানতেই হবে। কিন্তু অফিস শেষে দেখলাম, আরতি নেই। আমার বুঝতে অসুবিধা হল না যে, ইচ্ছাকৃত ভাবেই সে আমাকে এড়িয়ে গেছে।

নিজের মনের মধ্যে একটা অভিমান জাগল। ভিখারির মত ভালবাসার জন্য আমি হাত বাড়াব না। আর যেচে তার খোঁজও করব না। সে যদি এগিয়ে এসে কথা বলে, বলব। কিন্তু কী এক অদ্ভুত দুর্বলতা আরতির প্রতি আমার! পরদিন অফিসে এসে আমার কেবিনে যাবার মুখে ঠিক তার টেবিলের সামনে এসে দাঁড়ালাম।

জিজ্ঞাসা করলাম, ভাল আছ?

ভেবেছিলাম আরতি আজও উপেক্ষা করবে, কিন্তু না, তা করল না। মুখ তুলে তাকাল। কিন্তু সেই উজ্জ্বল হাসির দ্যুতি যেন তার চোখে নেই।

ও বলল, ভাল আছি।

জিজ্ঞাসা করলাম, কী হয়েছে তোমার?

ও বলল, কিছু না।

—কিছু একটা হয়েছে?

ও আস্তে করে বলল, ফেরার পথে বলব।

সারাদিন উদ্বেল আকাঙ্ক্ষার মধ্যে অফিসের কাজ করলাম—কী হয়েছে আরতির?

ফেরার পথে আমি বলার আগেই আরতি গিয়ে সেই রেস্টুরেন্টে ঢুকল। পেছনে পেছনে আমিও ঢুকলাম। দু'কাপ কফির অর্ডার দিয়ে বললাম, কী হয়েছে, বলো?

আরতি বলল, অদ্ভুত একটা চিঠি।

—চিঠি! কার?

—বেনামী।

—কী লিখেছে চিঠিটাতে?

আরতি তার ব্যাগ থেকে চিঠিটা বের করে আমার হাতে দিল। অজস্র ভুল বানানে ভর্তি চিঠি। হাতের লেখাও জঘন্য। খুবই অল্পশিক্ষিত কারো হাতের লেখা সন্দেহ নেই। চিঠিটা আরতিকেই লেখা, কিন্তু বক্তব্য সব আমারই বিরুদ্ধে। চিঠিটা এই রকম

মিস দত্ত,

আপনি আমাকে চেনেন না, কিন্তু আমি আপনাকে চিনি। অনেকদিন যাবতই লক্ষ্য করছিলাম, কিন্তু শেষপর্যন্ত না লিখে আর পারলাম না। আপনি মৃগাঙ্ক বাবুর সঙ্গে রোজই দেখি এক সঙ্গে ফেরেন, রেস্টুরেন্টে বসেন। চা-কফি খান, গল্পগুজব করতে করতে বেরিয়ে আসেন। কিন্তু আপনি কি ঐ লোকটির চেনেন? ওর চরিত্র সম্পর্কে খোঁজ-খবর রাখেন? ও আগে একটি কলেজে কাজ করত। বহু মেয়ের সর্বনাশ করে এসেছে। অঞ্জনা বলে একটি মেয়েকে প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার সর্বনাশ করেছে। মেয়েটি এখন পাগলের মত ঘুরছে। এখনও ও ওঁর কাছে আসে। আপনাদের বস মিত্র সাহেবের স্ত্রীরও ও সর্বনাশ করেছে। কলকাতা যাদুঘর, আর্ট গ্যালারি, রবীন্দ্র সদন এই সব জায়গায় বহুদিন তাকে মিসেস মিত্রের সঙ্গে দেখা গেছে। আপত্তিজনক ভাবেই দেখা গেছে। এর বহু সাক্ষীও আছে, আপনি চাইলে সাক্ষীও হাজির করতে পারি। বদমাস লোকটি আপনারও সর্বনাশ করতে উদ্যত হয়েছে দেখে বাধ্য হয়ে লিখলাম। এর সঙ্গ এড়িয়ে চললে আপনার মঙ্গলই হবে।

ইতি--

চিঠিটা পড়ে স্তব্ধ হয়ে গেলাম। চিঠিটার মূল বক্তব্য যার তিনি অশিক্ষিত নন স্পষ্ট বোঝা যায়। নিজেকে গোপন করার জন্য অশিক্ষিতপ্রায় কাউকে দিয়ে লিখিয়েছেন। যিনিই লিখুন না কেন, তিনি আমাকে খুব ভালভাবে চেনেন। আমার গতিবিধির উপর তার তীক্ষ্ণ নজর আছে। কিন্তু আশ্চর্য ভাবে অদ্ভুত মিথ্যে কথা লিখেছেন। লেখকের উদ্দেশ্য যে ভয়ানক ভাবে আমার ক্ষতি করা, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অথচ আমার সঙ্গে শত্রুতা আছে, এমন কারো কথা আমি মনে করতে পারলাম না। আরতিকে বললাম, চিঠিটা পড়ে তোমার কী মনে হয়?

আরতি বলল, আমাকে এরকম অনেক সঙ্কটের মুখে পড়তে হয়েছে। আমি এতে অভ্যস্ত আছি।

বললাম, আশ্চর্য! আমি তো কারো কোনো ক্ষতি করিনি।

আরতি বলল, চিঠিটার মূল লক্ষ্য তুমি নও, আমি।

আমি বললাম, তুমি এরপর থেকে আমার সঙ্গে মিশতে কোনো—

আরতি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আরও বেশি করে মিশব। আমার জেদ তুমি জানো না। চলো।

আমরা রেস্টুরেন্ট থেকে বেরিয়ে এলাম। মনটা আমার হাল্কা বোধহল।

কয়েকদিন আবার স্বস্তিভাবে একটু কাটল। আরতিকে যথাযথ হাসিখুশি দেখলাম। অদ্ভুত একটা সাহস সঞ্চয় করে ফেলেছে মনে হল। কারণ গলা উঁচিয়ে অফিসেই আমাকেই বলত, এক সঙ্গে ফিরব কিন্তু।

ওর সঙ্গে আমার এই অন্তরঙ্গতা অফিসের দৃষ্টি এড়ায়নি। একটু আধটু কানাঘুষো না চলেছে তাও নয়। সেই জন্য প্রথম প্রথম কিছুটা জড়তা বোধ করত আরতি। কয়েকদিন যাবৎ দেখলাম সে জড়তাটা সে একদম কাটিয়ে উঠেছে।

কিন্তু কোথায় অদৃশ্যে কী যে একটা রহস্যময় খেলা চলেছিল—আমি তার কোনো হদিশই করতে পারছিলাম না। হঠাৎ আমি নিজেই একদিন একটা উড়ো চিঠি পেলাম। কোনো একটি বিশেষ কেন্দ্র থেকেই ঘটনাটি ঘটছে বলে আমার মনে হল। কাঁচা হাতের লেখা একটি চিঠি। কিন্তু কোনো লেখাপড়া করা লোকের যে মুসাবিদা সে সম্পর্কে সন্দেহ নেই। তবে আরতির কাছে যে হাতের লেখায় চিঠি এসেছিল সেই হাতের লেখা এটি নয়। লেখা

ভট্টাচার্য,

তুমি কিন্তু সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছো। যদি যৌনক্ষুধাই এত প্রবল হয় তাহলে বিয়ে কর না কেন! সাবধান, পরের ঘরের দিকে হাত বাড়িয়েছ। আর বেশি দুর এগিও না। এর পরিণতি ভাল হবে না! মিসেস মিত্রের সঙ্গে তোমাকে যেন আর মেলামেশা করতে না দেখি। অফিসের মেয়েটাকে হয় বিয়ে করো নয়তো ছাড়ো। আমরা এতটা সহ্য করব না মনে রেখো। হুঁশিয়ারিটা ফাঁকা আওয়াজ বলে মনে কোরো না।

ইতি,

মনের মধ্যে এমন করে চাপ সৃষ্টি আগে কখনও হয়নি। কারা? কেনই বা আমার পেছনে লেগেছে? মিসেস মিত্রের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করার ইচ্ছে আমার নেই। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই মিসেস মিত্রের মধ্যে এমন কিছু আছে, যা আমার রোমান্টিক চেতনার সঙ্গে নিবিড় সম্পর্কে যুক্ত। তাঁর সান্নিধ্যে আমার রোমান্টিক চেতনা অদ্ভুত ভাবে অভিভূত হয়। কিন্তু আমি তো তাঁর অমর্যাদা বিন্দুমাত্র করিনি। বরং মিসেস মিত্র স্পষ্টভাবেই তাঁর দুর্বলতা দেখিয়েছেন। কিন্তু সভ্যতা, ভদ্রতা, সামাজিক রীতিনীতির কাঠামো উচ্ছৃঙ্খল উদ্দামতায় ভেঙে দেবার মত কোনো মানসিকতা কোনোদিনই আমার নেই। ভাল লাগে মিসেস মিত্রকে, বলতে দ্বিধা নেই। কখনও কখনও অদ্ভুতভাবে আমার হৃদয় তাঁর দুই চোখের দুটি নক্ষত্রকে দেখবার জন্য আকুল হয়ে উঠে, কিন্তু সেই আকুলতা দুষ্ট কল্পনায় প্রভাবিত হয়নি। ভিনাসের মূর্তিকে শিল্পের দৃষ্টিতেই ভাল লাগে। সে ভাল লাগায় অন্যায় কোথায়? মিসেস মিত্রকে যে আমি সেই দৃষ্টিতেই দেখি। তার বাইরে নয়। আরতিকে দেখি বন্ধু হিসেবে। সে যদি আমার সঙ্গী হতে চায় গ্রহণ করতে আমার দ্বিধা নেই। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মধ্যে দেহজ মিলনের প্রশ্নটাকেই বড় করে দেখি না। আত্মিক সম্পর্কই সেখানে যথার্থ বন্ধনের কারণ। আরতি আমার সঙ্গে এতদিন মিশছে, কিন্তু নিজের বিবেকের কাছেও কোনোদিন সে বলতে পারবে না যে, বিন্দুমাত্র কোনো অশোভন আচরণ তার সঙ্গে আমি করেছি। মানুষের আত্মার প্রতি মর্যাদা দেখাতে কখনও আমার কুণ্ঠা নেই। তবু, তবু আমার বিরুদ্ধে....। অঞ্জনা ও মহুয়াকে নিয়েও ঠিক এমনি ধরনের প্রশ্ন উঠেছিল, অথচ সে জন্যে আমি বিন্দুমাত্র দায়ী নই। বরং তাদের অসঙ্গত কল্পনাকে আমি কখনই প্রশ্রয় দিইনি। তাই চিঠিটা পড়ে মনটা কেমন মেঘাচ্ছন্ন আকাশের মত ভার হয়ে রইল। অফিসে ঢুকে নিজের কেবিনের দিকে যাবার পথে আরতির দিকে তাকাতেও ভুলে গেলাম। শুধু বারবার চিন্তা করতে লাগলাম অন্তরালবর্তী সেই রহস্যময় ব্যক্তিটি সম্পর্কে, যে অদ্ভুতভাবে, অকারণে, আমার হৃদয়ের উপর দিয়ে এমন নির্মম রথচক্র চালাচ্ছে।

অফিস ছুটি হয়ে গেলেও কেমন একটা বিষণ্ণভাব আমাকে চেপে রইল যেন। রোজকার মত তাড়াহুড়ো করে ওঠার তাগিদটাও যেন হারিয়ে ফেললাম।

হঠাৎ অবাক হলাম পুশিং ডোরটা সরে যেতে। তাকিয়ে দেখি, আরতি। এর আগে কোনোদিনের জন্যও সে আমার কেবিনের ছায়া মাড়ায়নি। আরতির দুই চোখে যেন অদ্ভুত একটা কৌতূহল জ্বলজ্বল করছে। সে আস্তে স্বরে ডাকল, আনন্দ।

—হ্যাঁ।

—যাবে না?

—চলো। ব্রিফ্‌কেসটা নিয়ে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ালাম। হঠাৎ অবসাদ যেন অনেকটা কেটে গেল। এই এমনি একটু আন্তরিকতা, এমনি একটু আহ্বানের জন্য

যেন আমার হৃদয় মন যুগ-যুগান্ত ধরে আকুল হয়ে অপেক্ষা করছে।

পথ চলতে চলতে আরতি বলল, কী হয়েছে তোমার?

বললাম, তোমারই মত অবস্থা।

আরতি বলল, চলো, রেস্টুরেন্টে বসে শোনা যাবে।

রেস্টুরেন্টের কর্নারের দিকে ছোট কেবিনটাতে বসলাম দু'জনে।

আরতি বলল, বলো।

ব্রিফ্‌কেসটা খুলে, চিঠিটা বের করে আরতির হাতে দিলাম।

আরতি দু'বার তিনবার করে পড়ল! তারপর জিজ্ঞাসা করল—তুমি কি সত্যি মিসেস মিত্রের সঙ্গে ঘুরে বেড়িয়েছ?

বললাম, না তো! একদিন মাত্র জাদুঘরে গিয়েছিলাম। সে তো কতকগুলো মূর্তি সম্পর্কে আমার অপিনিয়ন নেবার জন্যই আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন তিনি।

—আর কখনও যাওনি?

—ঈশ্বরের নামে দিব্যি করে বলতে পারি আরতি। আর যে কয়দিন গিয়েছি, সে তো মিত্র সাহেবের সঙ্গেই আমাকে গাড়ি করে নিয়ে গিয়েছে।

আরতি একটু ভাবল। তারপর বলল, আমার মনে হয়, মিসেস মিত্রের সঙ্গ তোমার এড়িয়ে চলাই ভালো।

—আমি তো যেচে কখনও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাইনি। উনি ডেকেছেন, তাই—

—ডাকলেও যাওয়া উচিত নয়।

—আফটার অল আমার বসের স্ত্রী তো, তাই—

—না, তবু তুমি যেও না আর।

আমি চুপ করে থাকলাম।

আরতি আমার দিকে তাকাল আমায় কথা দাও।

মিসেস মিত্রের বসন্তের রঙিন পাখামেলা চোখ দুটি মনে পড়ে গেল। আমার বুকের ভেতর হৃদপিণ্ডটা বুঝি মোচড় খেয়ে উঠল। আরতিকে কথা দিলাম, আর যাব না।

আরতি বলল, আমাকে যে-ই চিঠি দিক না কেন, সে তোমার এই চিঠির পেছনে নেই। আমার মনে হয়, মিত্র সাহেবের নিকটের কোনো লোকই তোমাকে এই চিঠি দিয়েছে। আমি বলছি আনন্দ, মিসেস মিত্রের তোমার প্রতি অদ্ভুত একটা দুর্বলতা আছে। সব মানুষ সংযম দিয়ে নিজের দুর্বলতাটাকে সংযত করতে পারে না। মিসেস মিত্রকে আমি যতটুকু দেখেছি, তাতে বুঝেছি, সংযম ওঁর একটু কম আছে। তোমাকে যথার্থই উনি ভালবেসে ফেলেছেন। যিনিই তোমাকে এ চিঠি লিখুন না কেন, তিনি বুঝেছেন যে, মিসেস মিত্রকে সংযত করা সম্ভব নয়। অগত্যা তোমাকেই ওয়ার্নিং দিতে বাধ্য হয়েছেন। এর পরেও যদি ওঁর সঙ্গে মেলামেশা করো, তোমার ক্ষতি

করে দিতে পারে। বড়লোকদের নোংরা কাজ করতেও বাধে না একথা মনে রেখো।

অসহায় দৃষ্টি তুলে আরতির দিকে তাকালাম, তুমি তো আমায় ভুল বুঝবে না আরতি?

আরতির চোখের তারায় এই যেন প্রথম দুটি জোনাকি দপদপ করে উঠল। সে হাসল। সরাসরি আমার প্রশ্নের জবাব দিল না। বলল, চলো।

দু'জনে উঠে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগিয়ে গেলাম।

অনেক রহস্য বোধহয় অদৃশ্যে আমার বিরুদ্ধে জাল বুনে চলেছিল। পরদিন অফিস ছুটির কিছু আগে মিত্র সাহেব আরতিকে কেন যেন নিজের ঘরে ডাকলেন। প্রচণ্ড কৌতূহলে আমি আরতির জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ও ফিরে এলে জিজ্ঞাসা করলাম, কী হল আরতি?

আরতি ঠোঁট উল্টাল। নিজের টেবিলের উপর থেকে ব্যাগটা তুলেনিল। তারপর বলল, তুমি চলে যাও আনন্দ। মিত্র সাহেবের সঙ্গে আমাকে যেতে হবে।

—কেন?

আরতি ফিস্‌ফিস্ করে বলল, বুঝতে পারছি না। পরে বলব।

আরতি চলে গেল। আমি একা একা বাসস্ট্যান্ডে এলাম।

সেই অপরাহ্ন থেকে সারাটা রাত আরতির কথা চিন্তা করলাম। পরদিন অফিসে তার সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত যেন শান্তি নেই। পরদিন একটু আগে আগেই অফিসে এলাম। এসে দেখি, আরতির টেবিল ফাঁকা। ভাবলাম, তখনও বোধহয় এসে পৌঁছায়নি। আরও দু'একবার বাইরে এসে ওর টেবিলটা দেখলাম। আরতি নেই। কী হল? মনে হল, মিত্র সাহেবকে গিয়ে একবার জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু কেন যেন মুখ ফুটে কিছুই জিজ্ঞাসা করতে পারলাম না। কারণ বোধহয় এই যে, আরতির প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে।

তার পরের দিনও আরতির দেখা নেই। পরের সপ্তাহে আরতির টেবিলে নতুন একজন টাইপিস্টকে দেখলাম! আমার বুকের ভেতরটা বেদনায় মুচড়ে উঠল। বুঝলাম, আরতি আর এ-অফিসে আসবে না। ভাবলাম, ওর বাড়িতে গিয়ে দেখা করব। কিন্তু বাড়ির ঠিকানা কখনও আমি তার কাছ থেকে নিইনি। অফিসে তার ঠিকানা খোঁজ করলাম, কিন্তু কি এক অজ্ঞাত কারণে অফিস আমাকে তার ঠিকানা দিল না।

নতুন সপ্তাহের গোড়ার দিকেই মিসেস মিত্রের একটি চিঠি পেলাম

মৃগাঙ্ক,

তোমার সঙ্গে আমার জরুরি দরকার। আগামী বৃহস্পতিবার জাদুঘরের গেটে থেকো, আমি যাব। লক্ষ্মীটি, অবশ্যই এসো কিন্তু। কতদিন তোমার সঙ্গে দেখা হয়নি। তোমাকে দেখবার জন্য মনটা আমার ছটফট করছে। অনেক কথা আছে। অফুরন্ত

ভালবাসা নিও। ইতি

তোমার বাসন্তী।

চিঠিটা পড়তে পড়তে আমার হাতদুটো কাঁপতে লাগল। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে, মিসেস মিত্রকে আমি পছন্দ করি, ভালবাসি। মিসেস মিত্র ও আরতি দুইয়ের মধ্যে যেন একই নারীর কয়েকটি বিভিন্ন গুণের সমাবেশ ঘটেছে। একের মধ্যে যা আছে অপরের মধ্যে তা নেই। তারা দুইয়ে যেন দুইয়েরই পরিপূরক। শরৎচন্দ্রের অচলার কাছে মহিম আর সুরেশ ছিল পূর্ণাঙ্গ পুরুষের দুটি রূপ। একদিকে পুরুষের ধৈর্য ও সংযম, আর একদিকে তারুণ্যের উদ্দামতা। এই সব কিছুর একত্র সমাবেশ না হলে একটি পুরুষ পূর্ণাঙ্গ পুরুষ হয় না, একটি নারীর কাছে আদর্শ প্রেমিক বলে বিবেচিত হতে পারে না। তাই অচলার জীবনে বিরাট এক ট্র্যাজেডি নেমে এসেছিল। কাউকেই সে মন থেকে চূড়ান্ত ভাবে ফেলে দিতে পারেনি, কাউকেই একক ভাবে পরিপূর্ণ বলে গ্রহণ করতে পারেনি। মিসেস মিত্র আর আরতি যেন একই ভাবে আমার জীবনে দুটি রমণীয় মূর্তি ধরে এসেছে।

আরতি নেই, মিসেস মিত্র আছেন। মনে হল, তাঁকে আশ্রয় করে আমার জীবনের এ বঞ্চনা আমি পূর্ণ করি। তাঁর গোলাপ ফুলের পাপড়ির মত মুখ, নক্ষত্রের ইঙ্গিত ভরা ফাল্গুনের চোখ, সব যেন আমাকে মুহূর্তের মধ্যে প্রচণ্ড আবেগে জড়িয়ে ধরল। মনে হল, যাব, যাব। মিসেস মিত্রকেও আমি আরতির মত হারাতে পারব না। একথা তো ঠিক, রমণী নারী মিসেস মিত্রই। চিরন্তন যৌবন যেন তাঁর অঙ্গে পাখা মেলে দিয়ে আছে। বয়স একটা প্রশ্ন নয়। দ্বিচারিত্বও সমস্যা নয়। মানুষের দেহটা একটা ব্যাপার নয়, ব্যাপার তার মন। মন যখন একটা পুরানো মানুষের কাছ থেকে সরে যায়, দেহটাও তখন নতুন হয়ে উঠে। দেহ তখন নতুন এক মানসিকতার মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ঠিক করলাম, যাব। কিন্তু সেই মুহূর্তেই মিসেস মিত্রকে নিয়ে লেখা উড়ো চিঠিটার কথা মনে পড়ল। মিইয়ে গেলাম। অন্তরালে যারাই থাকুক, তারা আমার উপর কড়া নজর রাখছে সন্দেহ নেই। মিসেস মিত্রের সঙ্গে একান্তে দেখা করা সম্ভব নয়। খবরটা ওরা পাবেই। আরতি আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল। বড়লোকের অসাধ্য কিছুই নেই। ওরা আমাকে খুনও করতে পারে। সুতরাং নিজেকে সংযত করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। বুকের মাঝখানটায় আমার কেমন যেন বার বার মুচ্‌ড়ে মুচ্‌ড়ে উঠতে লাগল।

তিনদিন পরে আর একটি চিঠি পেলাম মিসেস মিত্রের।

ডিয়ার মৃগাঙ্ক,

ডার্লিং কেন তুমি এলে না, আমি কতক্ষণ জাদুঘরের দুয়ারে তোমার জন্য অপেক্ষা করেছি। তুমি জানো না, তোমাকে আমি কতটা ভালবেসেছি। প্রথম দিনের সাক্ষাতেই তুমি আমার হৃদয় মন সব কেড়ে নিয়েছ। বিশ্বাস করো তুমি, তোমার মত আর

কাউকে দেখে কখনই অভিভূত হইনি আমি। আমার সংযমের বাঁধন ছিল অত্যন্ত দৃঢ়। এজন্য আমার চরিত্রের যথেষ্টই সুনাম ছিল। কিন্তু অকস্মাৎ তোমাকে দেখে আমার কি হল, আমি কিছুতেই নিজেকে সামলাতে পারলাম না। অনেক বোঝাবার চেষ্টা করেছি মনকে, পারিনি। মনে হচ্ছে, তোমাকে ছাড়া আমার জীবনটা ব্যর্থ। ডার্লিং আমি বুঝতে পেরেছি যে, তুমিও আমাকে ভালবেসেছ। ক্ষণস্থায়ী এ জীবনে এ-ব্যাপারে আমরা বঞ্চিত হব কেন? লোকনিন্দাতে কি এসে যায়? আকাঙ্ক্ষিতকে পাবার তুলনায় তা কিছুই নয়। ডার্লিং আগামী শুক্রবার তুমি আমার এখানে চলে এস। মিস্টার মিত্র সেদিন কলকাতার বাইরে থাকছেন। এসো কিন্তু, যদি না আসো তো আমি তোমার ওখানে যেতে বাধ্য হব। তোমাকে ছাড়া আমি বাঁচতে পারব না মৃগাঙ্ক। আমার চুম্বন নাও।

ইতি—
বাসন্তী।

আবার মনের মধ্যে আমার ঝড় উঠল। সমগ্র দেহমন বারবার যেন ভূমিকম্পে কেঁপে উঠতে লাগল। মিসেস মিত্রের মত আমিও যে তাঁকে চাই! তাঁর বাসন্তী তারুণ্যে জড়িয়ে আছে চিরকালের রমণী নারীর আকর্ষণ। চিরকালীন এক হেলেন যেন মিসেস মিত্র। পূর্বদেশীয় আফ্রোদাইতের প্রতিনিধি।

যথার্থই লিখেছেন মিসেস মিত্র। মিত্র সাহেব বৃহস্পতিবার বিকেলের ফ্লাইটেই অফিসের জরুরি কাজে দিল্লি যাবেন। শুক্রবার তিনি বাড়ি থাকবেন না। আমার হৃদয় মন যেন আকুলি-বিকুলি করতে লাগল। কিন্তু? আবার মুহূর্তের মধ্যেই যেন চুপ্‌সে গেলাম। একটি মহিলা যতই প্রেমতৃষাতুর হোক না কেন, এমন করে নিজের দুর্বলতা আগে প্রকাশ করবেন না। এ চিঠি কি সত্যি? আমাকে ধরবার জন্য একটা ষড়যন্ত্রের জাল পাতা হয়নি তো! আমার এবং মিসেস মিত্রের মধ্যে পারস্পরিক একটা সৎ আকর্ষণকে কেউ হয়তো সহ্য করতে পারছেন না। সব যেন মাথার মধ্যে গুলিয়ে গেল আমার। অসহায় ভাবে নিজের বুকের মধ্যে জ্বলতে লাগলাম শুধু।

নির্দিষ্ট দিন, শুক্রবার এল! নিজের বুকের মধ্যে তোলপাড় করতে লাগলাম। একবার মনে হল রিং করি মিসেস মিত্রকে, সত্যতা যাচাই করে নিই। কিন্তু সে সুযোগ হল না। সেইদিনই সকাল থেকে অফিস অঞ্চলের সব ফোন অচল হয়ে আছে। পিঞ্জরাবদ্ধ একটি সিংহের মত আমি ছটফট করতে লাগলাম। শেষপর্যন্ত যাওয়া হল না।

শনিবার দিনই। অদ্ভুত একটা চিঠি পেলাম বোর্ড অব ডিরেক্টরস্-এর। আমাকে তাঁদের সিউড়িতে খোলা নতুন অফিসে বদলি করে দেওয়া হয়েছে।

জীবনে ঘটনাপ্রবাহ একটা অদ্ভুত গতিতে চলে যেন; এক একজনের জীবনে এক একভাবে। কারো জীবনে সৌভাগ্য ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে খুশির জোয়ারে ভাসিয়ে

নেবার জন্য! কারো চতুর্দিক অন্ধকার করে দুর্ভাগ্য নামে আকাশ ভেঙে। কেন যে এমন হয় মানুষ তা বুঝতে পারে না। আবার কারো জীবনে সুখ-দুঃখ ছায়া-রোদ্দুরের খেলা খেলে মুহুর্মুহু। আমার জীবনের রেকর্ড যে নিয়তিই তৈরি করুক না কেন, তাঁর কৌতুকের বোধহয় সীমা নেই। এ ভাগ্যের আকাশ চিরকাল যেন মেঘাচ্ছন্ন। কোনো ফাঁকে রোদ্দুর একটু ঝিলিক দিয়ে উঠতেই নিভে যায়। সামান্য উৎসাহ বোধ করে তাকাতে না তাকাতেই মেঘ আবার আকাশ ছেয়ে ফেলে।

কলেজে চাকুরি পেয়েছিলাম অকস্মাৎ। আমার আজন্ম রোমান্টিক চেতনা সেখানে মুহূর্তের জন্য ঝিলিক দিয়ে উঠতে যেতেই আবার নিভে গেল। ঘটনাপ্রবাহ এমন ঘটল যে, চাকুরিই ছাড়তে হল আমাকে। আবার অকল্পনীয় ভাবে নতুন চাকুরি পেলাম। অদ্ভুত স্বপ্নেরা সব উঁকি দিচ্ছিল জীবনের পূর্ব দিগন্তে। কিন্তু উঁকি দিতে না দিতেই আবার মেঘে ছেয়ে গেল। জীবনের রেকর্ডে আবার কোন্ সঙ্গীত গীত হয়ে আছে কে জানে! আমাকে সিউড়িতে ট্রান্সফার করা মানে পরোক্ষভাবে চাকুরি ছেড়ে দিতে বলা। কী করব? আমি যেন দিশেহারা বোধ করতে লাগলাম।

মনে পড়ে গেল দামোদরের তীরে দেখা সেই পাগলা ধরনের লোকটির কথা। তাঁর কথার ইঙ্গিত ছিল এই যে, গৃহবলিভুক পারাবত হবার জন্য আমার জন্ম হয়নি। গৃহ আমার জন্য নয়ও। কোনারকের সেই রহস্যময় ভদ্রলোকটিও আমাকে একই ধরনের কথা বলেছিলেন। জীবনের প্রথম পর্বে বেহালার যে জ্যোতিষীকে আমি হাত দেখিয়েছিলাম, তিনিও আমাকে ঐ একই কথা বলেছিলেন। তাহলে? আমার জন্য কী অপেক্ষা করে আছে?

অফিস থেকে ফিরলাম যেন ভেঙে দুমড়ে যাওয়া একটি মানুষের মতন। গৃহ তো আমার কোনোদিনই নেই। আছে একটি ঘরের ছাতের নিচে রাত্রি কাটাবার মত একটু আচ্ছাদনের ব্যবস্থা। গৃহ কাকে বলে? যেখানে আছে নিবিড় আত্মীয়তার ছাপ, স্নেহ প্রেমের আবরণ, এক হৃদয়ের জন্য অপর হৃদয়ের আকূতি। আমার তা কোনোদিনই ছিল না। কোনোদিন যে হবেও না, তাও এখন স্পষ্ট। সুতরাং গৃহ আমার নেই, গৃহ আমার হবেও না। কর্মক্লান্ত দিনের শেষে আমার কোনো নীড় নেই।

সরাসরি সেই নির্দিষ্ট আস্তানায় আমি ফিরলাম না। জীবনের রেকর্ডে পরবর্তী সঙ্গীত কি গীত হয়ে আছে তারই একটা আঁচ পাবার জন্য আবার বেহালার সেই জ্যোতিষীর কাছে গেলাম।

ভিড় যথার্থই ছিল। কিন্তু আমার খবর পেয়ে জ্যোতিষী আমাকেই আগে ডেকে নিলেন। বললেন, কী খবর, কেমন আছেন?

হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, আপনিই জানেন। বলুন।

ম্যাগনিফাইয়িং গ্লাসটা তুলে নিয়ে সামান্য একটুক্ষণ হাতের রেখাগুলি দেখলেন জ্যোতিষী। তারপর আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, হাসছেন কেন?

তিনি বললেন, দু'জন মহিলা আপনাকে ভারি কষ্ট দিয়েছেন, এই তো?

—হ্যাঁ।

—এ-সব কষ্টের কথা মনে রাখবেন না। আপনার জীবন তো ওদের জন্য নয়।

—কিন্তু এমন হল কেন?

—মহামায়ার অপূর্ব ইচ্ছায়।

—এমন নিষ্ঠুর ইচ্ছা তাঁর হয় কেন?

জ্যোতিষী হেসে আমার দিকে তাকালেন, নিষ্ঠুর না দরদী, আপনি কি করে বুঝলেন?

বললাম, একে যদি স্নেহ বলেন, একে যদি দরদ বলেন, তাহলে অভিধানে দরদের অর্থ পাল্টাতে হবে।

জ্যোতিষী আর একবার গ্লাস উঠিয়ে নিয়ে আমার হাতটা দেখলেন। বললেন, একজন বিবাহিতা মহিলা, আর একজন অবিবাহিতা, এই তো?

—হ্যাঁ।

—দুই-ই বিদূষী?

—হ্যাঁ।

জ্যোতিষী বললেন, এই বিবাহিতা মহিলাটি যদি আপনার জীবনে না আসত তবে কী হত বলুন তো?

—কি?

—ঐ অবিবাহিতা মহিলাটির সঙ্গে আপনার বিবাহ হত।

—তাতে কি হত?

—ওর ব্যক্তিত্বে আপনি গৃহ-জীবনে বাঁধা পড়ে যেতেন।

—তাতে ক্ষতি হত কি?

—হ্যাঁ। আপনার ভেতরে যে মহামূল্যবান রত্ন রয়েছে, তার প্রকাশ কখনই হত না।

—কিন্তু, ও গেল কোথায়?

—ওকে চাকুরি থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

—কেন?

—ঐ বিবাহিতা মহিলাটির প্রভাবেই এমন করা হয়েছে। আপনি ওর সঙ্গে মিশছেন, উনি তা সহ্য করতে পারতেন না।

—আচ্ছা, ঐ বিবাহিতা মহিলাটি কি সত্যই আমাকে ভালবাসেন?

—হ্যাঁ।

—দুটো চিঠি পেয়েছিলাম, চিঠি দুটো কি ওঁর নিজেরই লেখা?

—হ্যাঁ।

আমি চুপ করে থাকলাম।

জ্যোতিষী বললেন, দুঃখে মুষ্ড়ে পড়বেন না, ভেঙে পড়বেন না। মহৎ ব্যক্তিদেরই মহৎ দুঃখ সইতে হয়। দুঃখ না পেলে পরম প্রাপ্তিও ঘটে না। রবীন্দ্রনাথের সেই গান মনে পড়ে না? 'দুঃখের বরষায় চক্ষের জল যেই নামল, বক্ষের দরজায় বন্ধুর রথ সেই থামল।' অলৌকিক আনন্দ যে অলৌকিক দুঃখের মধ্য দিয়েই আসে। সেই জন্যই কবিগুরু বলেছেন, 'লৌকিক আনন্দের ভার বিধাতা যাহারে দেন তাঁর বক্ষে বেদনা অপার।' ব্যাপারটা কি জানেন?

জ্যোতিষীর দিকে তাকালাম।

উনি বললেন, মজবুত ঘর তৈরি করতে হলে সিজনড বাঁশ বা কাঠের দরকার। মহামায়া আপনাকে 'সিজনড' করে নিচ্ছেন তাঁর নিজের কাজের জন্য। আপনাকে তিলে তিলে তৈরি করছেন আপনার মধ্যে তিনি অবতরণ করবেন বলে। বাজে কাচের পাত্রে যদি খুব গরম দুধ হঠাৎ ঢালা যায়, পাত্রটি ফেটে যায়। গরম দুধ ধরার জন্য পাত্রটিকে ঠিক সেইভাবেই তৈরি করে নিতে হয়। মহামায়া মহাশক্তি। বিদ্যুৎ যেমন শক্তি, তিনিও তেমনই শক্তি। বিদ্যুৎ একটি বল্‌ব-যন্ত্র না হলে আলো দিতে পারে না। মহামায়াও তেমনি কোনো যন্ত্র না পেলে কাজ করতে পারেন না। মানবদেহের মধ্যে যার উপর মহামায়া আশ্রয় করবেন তাঁর দেহকে নিষ্কলুষ হতে হয়। কামনা-বাসনাশূন্য হতে হয়। সেইজন্য যে-সাধককে মহামায়া আশ্রয় করেন, নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে তাঁকে তিনি আকাঙ্ক্ষারহিত করে দেন, যাতে তাঁর মধ্যে তিনি প্রকাশিত হতে পারেন। শক্তি-সাধকেরা শবসাধনা করেন, কেন, জানেন?

কৌতূহলী হয়ে জ্যোতিষীর মুখের দিকে তাকালাম, কেন?

—শব হল সবচেয়ে পবিত্র দেহ। মানুষের যত কিছু ক্লেদ, গ্লানি, সব তার মনে। মৃতদেহে মনের আশ্রয় নেই। কামনা-বাসনার সেখানে কোনো স্থান নেই। সেইজন্যই মহামায়া সেই শবাধারকে আশ্রয় করতে পারেন।

বললাম, জড় পদার্থের মধ্যেও তো প্রাণ নেই, মন নেই; তাহলে সেখানেও তো তিনি আশ্রয় নিতে পারেন?

জ্যোতিষী হাসলেন, বললেন, মহামায়া নেই কোথায়? সর্বত্রই আছেন। জড়ও তাঁর কুণ্ডলিনী-শক্তিতে ধৃত হয়ে আছে। পশু জগৎও তাতেই ধৃত হয়ে রয়েছে।

—কী রকম?

—যে শক্তি বস্তুজগৎকে ধরে রেখেছে তাকেই কুণ্ডলিনী-শক্তি বলা হয়। এই শক্তি যখন নিদ্রিত থাকে, সাপের মত গোল হয়ে থাকে। যখন জাগরিত হয় তখন প্যাঁচ খুলে সটান হয়। অণুকে ভাঙলে পরে, বিজ্ঞান বলছে, একটি ক্ষুদ্র-বৃত্তাকার সৌরজগৎ নিউক্লিয়াসের চারিদিকে খেলা করতে থাকে। যে শক্তি বস্তুকে এই বৃত্তাকার পরিধিতে ধরে রাখে তাই বৃত্তকা-শক্তি বা কুণ্ডলিনী-শক্তি। এই কুণ্ডলিনী-শক্তিকে

ঋজু ভঙ্গিতে চালনা করার শক্তি বিজ্ঞানেরও নেই। অ্যাটমিক এক্সপ্লোশন সব সময়ই গোলাকার পরিধি সৃষ্টি করে। সমগ্র বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডও গোলাকার। স্বয়ং আইনস্টাইন এই ধরনের অভিমত প্রকাশ করেছেন। সেই জন্য ইউনিভার্সকে আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে, ব্রহ্মাণ্ড, অর্থাৎ universe হল অণ্ডাকৃতি। তবে হংস-ডিম্বাকৃতি নয়, গোল ডিম্বাকৃতি।

এই গোলাকার শক্তিকে একমাত্র মানুষই ঋজু করতে পারে। মানুষের মধ্যেও এই কুণ্ডলিনী-শক্তি কুণ্ডলিকৃতা হয়ে ঘুমিয়ে আছে মূলাধারে। ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মানুষ তাকে ঋজু করে সুষুম্নার মধ্য দিয়ে সহস্রারের পথে পরিচালিত করতে পারে।

শক্তির এই যে ঋজু গতি, তা সব দেহে হতে পারে না। পবিত্র দেহে, সিজনড দেহেই তা হতে পারে। সেই দেহ আশ্রয় করে মহামায়া কাজ করেন। মহামায়া আশ্রয় ছাড়া কাজ করতে পারেন না, কথা বলতে পারেন না। সাধকের দেহকে আশ্রয় করে তিনি কাজ করেন, কথা বলেন। শবদেহ কামনা-বাসনাহীন বলে তাকে তিনি আশ্রয় করতে পারেন। তিনি নিজের ইচ্ছাতে আশ্রয় নেন না, সাধক তাঁর ইচ্ছাশক্তি দ্বারা মহাশক্তির কাছ থেকে যখন সুস্পষ্ট নির্দেশ শুনতে চান, তখন মহাশক্তি শবদেহ আশ্রয় করে তাঁর সঙ্গে কথা বলেন। শবসাধনার নিয়ম জানেন?

—না।

—শবসাধনা করতে হলে সাধক শবকে উপুড় করে ফেলে তার পিঠে শক্তি-যন্ত্র আঁকেন। তারপর মন্ত্রের সাহায্যে মহাশক্তিকে সেই দেহে আহ্বান করেন। ক্রিয়া স্তব্ধ হলে মহাশক্তি সেই শবদেহ আশ্রয় করেন। শবের মুখ ঘুরে যায়। সাধককে তিনি অভীষ্ট বর প্রার্থনা করতে বলেন।

কিন্তু এই শবসাধনাও নিকৃষ্ট সাধনা, বীরাচারী সাধনা। দৈবাচারীদের জন্য এ সাধনা নয়। মহামায়া সেই দৈবাচারী সাধকের দেহ নিজের মত করে তৈরি করে নিয়ে তাতে আশ্রয় নেন। তারপর সাধকের দেহের মধ্য দিয়েই নিজে খেলা করতে থাকেন। পরম পুরুষ শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ ছিলেন দৈবাচারী সাধক। আরও অনেক দৈবাচারী সাধক এই পৃথিবীতে এসেছিলেন, এখনও আছেন। আপনার মধ্যে দৈবাচারের লক্ষণ সুস্পষ্ট। মহামায়া কখনও আপনার মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবেন। সেইজন্য বিচিত্র পরিবেশের মধ্যে আপনাকে তিনি যন্ত্র হিসেবে তৈরি করে নেবেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, আমার মধ্যে যদি এমন বিচিত্র ক্ষমতা আছে আমি তা বুঝতে পারছি না কেন?

—এও মহামায়ার বিচিত্র ইচ্ছা।

—কী রকম?

—আপনি কে, আপনার মধ্যে কি শক্তি ঘুমন্ত রয়েছে, আপনি যদি জানেন, আপনি আর কাজ করবেন না। আপনাকে পূর্ণ আত্মজ্ঞান মহামায়া দেবেন না। একটা অপরিপূর্ণতা রেখে দেবেন। সেই অপূর্ণতা পূর্ণ করতে গিয়ে আপনি কাজ করবেন।

সেই কাজ মানবতার কল্যাণে আসবে। জীবনের শেষ পর্যায়ে কর্মনাশ হবে। তখন নিষ্ক্রিয় হবেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, এখন আমি কী করব?

জ্যোতিষী বললেন, কোন্ ব্যাপারে?

—আমাকে যে ট্রান্সফার করেছে, এ চাকুরি আমি নেব?

—নিতেও পারেন নাও নিতে পারেন। কর্মহীন আপনি হবেন না। মহামায়া আপনার মুখের গ্রাস কেড়ে নেবেন না। তাহলে আপনাকে দিয়ে কাজ হবে কী করে? যদি ছেড়ে দেন, অন্যকাজ জুটবে। যদি না ছাড়েন, সসম্মানে কাজ করবেন।

এত বিশৃঙ্খল ছিল আমার মন যে, কাজ ছেড়ে দেব বলেই ঠিক করেছিলাম। বললাম, ছেড়ে দেব ঠিক করেছি।

—দেবেন।

—আবার কবে চাকুরি পাব?

—সপ্তাহ খানিকের মধ্যেই।

—কী কাজ?

—যে কাজ আপনার মানায়, সে কাজই পাবেন।

—অর্থাৎ?

—আপনাকে প্রচুর লেখাপড়া করতে হবে। কারণ, আপনাকে লোকশিক্ষার ভূমিকা নিতে হবে। সুতরাং বুঝতেই পাচ্ছেন, যেখানে লেখাপড়ার-চর্চা আছে, সেখানেই আপনাকে যেতে হবে।

—অর্থাৎ অধ্যাপনা?

—হ্যাঁ।

আবার কোথায়, কী করে অধ্যাপনা জুটবে আমি ভাবতে পারলাম না। চুপ করে থাকলাম।

জ্যোতিষী বললেন, আপনাকে একটি কথা বলব?

—বলুন।

—আপনি একটু ধ্যান করুন।

—কী ধ্যান?

তিনি হেসে বললেন, যে ধ্যান থেকে আপনি শক্তির সন্ধান জানবেন, সেই ধ্যান।

—অর্থাৎ?

—বিন্দু ধ্যান।

—মানে?

—চোখ বুজে দুই ভুরুর মধ্য অঞ্চল বরাবর দিগন্তের দিকে তাকাবেন। দেখবেন অসংখ্য আলোর অণু-পরমাণু ভেসে বেড়াচ্ছে। তাদের মধ্যে একটিকে ধরবার চেষ্টা

করবেন। সমগ্র চিন্তা সেই একটিতেই নিবদ্ধ করবেন।

—কি হবে তাতে?

জ্যোতিষী হেসে বললেন, কী হবে আমি বলব না। আপনি বুঝবেন।

অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম। কোনো কথা বললাম না। জীবনের বিচিত্র রহস্য যেন আমাকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দিয়েছে। যাকে জানি না সেই নিরুদ্দেশের প্রতি যাত্রা শুরু করার কী মানে আছে-কে জানে! কিছু হেঁয়ালি লোক আছে দুনিয়াতে, তাঁদের কথার কোনো অর্থ আছে কি না তাই বা কে বলবে! জ্যোতিষীকে বললাম, আজ তাহলে উঠি?

উনি বললেন, উঠুন। আবার আসবেন।

—'আসব।'

আমি বেরিয়ে এলাম।

নয়

সন্ধ্যাবেলা একা বসে জীবনটাকে এই প্রথম আমি বিশ্লেষণ করে দেখবার চেষ্টা করলাম। অন্ধকারের আচ্ছাদনে আকাশপাতাল অসংখ্য কিছু ভাবতে লাগলাম। সত্যিই কি অতীন্দ্রিয় জগৎ বলতে কিছু আছে? সত্যিই কি নিয়তি বলে কিছু আছে? মনে হল, নাও থাকতে পারে। তবে, এ জীবনটাও তো সত্য নয়! এ পৃথিবীতে প্রাপ্তিতেই বা মানুষের সুখ কোথায়? ভোগেই বা মানুষের চূড়ান্ত পরিতৃপ্তি কোথায়? সুখী জীবন যাঁরা যাপন করছেন তাঁরাও তো পরিপূর্ণতার স্বাদ নিয়ে যেতে পারছেন না! শেষপর্যন্ত একটা অপরিপূর্ণতার ব্যর্থতা নিয়ে প্রত্যেককেই এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হচ্ছে। প্রেম, প্রণয় ভালবাসার খেলা তো একটা সাময়িক ইতিহাস মাত্র। জীবন ক্ষণস্থায়ী, যৌবন আরও ক্ষণস্থায়ী। বুদ্‌বুদের মত উঠছে আর মিলিয়ে যাচ্ছে। আমি যাদের আকাঙ্ক্ষা করেছি, পেলেই বা কি হত? সমস্ত বাসনা-কামনা আমার পরিতৃপ্ত হত কি? গৌতমবুদ্ধ জরা ও মৃত্যুর দৃশ্য দেখে অমন রাজসিক জীবনও মুহূর্তের মধ্যে ত্যাগ করে চিরন্তন সত্যের সন্ধানে গৃহ ছেড়ে পথে বেরিয়েছিলেন। যে মানুষের দূরদৃষ্টি আছে, সে জ্ঞান থেকে অনিত্য সংসারের চরিত্র বুঝে নিত্যের সন্ধান করে। যার দেখবার চোখ নেই সে সংসারের আবর্তে পড়ে হাবুডুবু খায়। রাজপুত্র থেকে ভিখারি, কেউ পৃথিবীতে যথার্থ অর্থে সুখী নয়। অর্থাৎ পরিতৃপ্ত নয়। জানি না অদৃশ্যে যথার্থই কোনো নিয়তি আছেন কিনা। জানি না কোনো মহাশক্তি আছেন কিনা। ভারতবর্ষে যুগ-যুগ ধরে একদল লোক সেই রহস্য সন্ধানে সাধনায় মগ্ন হয়েছেন, আজও হচ্ছেন। এই ভারতবর্ষে বৃহস্পতি লোকায়তদর্শন সৃষ্টি করেছেন, চার্বাক ভোগবাদ তৈরি করেছেন। অজিত কেশকম্বলিন ও মস্করি গোশাল-এর মত বস্তুবাদী দার্শনিকও এসেছেন। কিন্তু তাঁদের তত্ত্ব শেষপর্যন্ত দাঁড়াতে পারেনি। মানুষের হৃদয়কে

আচ্ছন্ন করেছেন বৈদিক ঋষিরা, উপনিষদকারেরা, শঙ্করের মত মায়াবাদীরা, শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ, তৈলঙ্গস্বামী, বামাক্ষেপার মত সাধকেরা। আধুনিক যুগে শ্রীঅরবিন্দের মত শিক্ষিত ব্যক্তিই বা কে ছিলেন? পশ্চিমী বস্তুবাদী দর্শনের সঙ্গেও তো তাঁর পরিচয় কম ছিল না! তিনিও তো শেষপর্যন্ত অধ্যাত্মসাধনার পথে নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন! 'Life Divine'-গ্রন্থে তিনিও তো ইন্দ্রিয়াতীত এক চিরন্তন আত্মার জগৎ সম্পর্কে বলেছেন, যে-আত্মাকে তিনি বার বার Luminous Self বা Luminous Soul বলে উল্লেখ করেছেন। কিছু একটা কোথাও আছে। সাধারণ মানুষের জ্ঞানের পরিধির বাইরে সেটা। বেহালার জ্যোতিষীটি কী বিদ্যাবলে একজন মানুষের জীবনের সব ঘটনা বলে দিতে পারেন? কী করে, কার সঙ্গে, কী ধরনের ব্যক্তির সঙ্গে কী ঘটনা ঘটছে, তিনি বলতে পারেন। আমরা তো পারি না! আছে, নিশ্চয়ই কোথাও কিছু একটা আছে। সবাই বলছেন, ভালবাসার জীবন আমার নয়, প্রেম-প্রণয়ের জীবন আমার নয়, গৃহজীবন আমার নয়। আমার জীবন-প্রারম্ভে যে দুটি ঘটনা ঘটে গেল, তা-তো অবিশ্বাস্যভাবে সেই দিকেই ইঙ্গিত দিচ্ছে! তবু আমি কেন মরীচিকার পেছনে ছুটতে পারিনি বলে ব্যথা পাচ্ছি? কেন তবে স্বর্ণমৃগ আকাঙ্ক্ষা করছি? ঠিক করলাম, দেখব, একবার পরীক্ষা করেই দেখব ওঁরা কী বলছেন।

সেই রাত্রেই খাওয়া-দাওয়ার পর জ্যোতিষীর কথামত একা বসলাম অন্ধকারের মধ্যে। চোখ বুজে দুই ভুরুর মধ্যখানে মনস্থির করে দিগন্তে মনোনিবেশ করে থাকলাম। বসেছিলাম পদ্মাসনে। খুব একটা দেরি করতে হল না। অন্ধকারে চোখ বুজলেও যেন অন্ধকার সামনে নেই। অসংখ্য উজ্জ্বল আণবিক কণা ঝিলমিল ঝিলমিল করছে। জ্যোতিষী আমাকে বলেছিলেন, এর মধ্যে একটি আলোকবিন্দুকে লক্ষ্য করে মনোনিবেশ করতে। আমি দুই ভুরুর মধ্যে বিশেষ একটি বিন্দুতে মনকে স্থির করবার চেষ্টা করলাম। আশ্চর্য! ধীরে ধীরে একটি বিশেষ বিন্দু যেন উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হতে লাগল। ঘন নীলদ্যুতি হয়ে সেই বিন্দু বড় হতে লাগল। ক্রমশ সেই নীল দ্যুতির মধ্যে একটা সবুজের আভা দেখা দিতে লাগল। বহুদূর থেকে সেই নীল দ্যুতিটা এগোতে লাগল। এগোতে এগোতে সিগারেটের ধোঁয়া যেমন একটা রিং তৈরি করে তেমনি একটা রিং তৈরি করল। সেই রিঙের মধ্যে ঘন অন্ধকার। কিন্তু সেই অন্ধকার যেন মুহূর্তের মধ্যে বিস্ফোরিত হয়ে তার গর্ভ থেকে আর একটি উজ্জ্বল বিন্দু বেরিয়ে এল। আবার সেই বিন্দু ছড়িয়ে পড়ল রিং তৈরি করে। তার মধ্য থেকে বেরিয়ে এল। অন্ধকার। আবার সেই অন্ধকারের বুক ভেদ করে বেরিয়ে এল আলোর বিন্দু। আবার রিং তৈরি হল। আবার রিং থেকে অন্ধকার। এইভাবে এক আশ্চর্য খেলা চলল। কী একটা অদ্ভুত আকর্ষণ আছে সেই আলোর। অদ্ভুত তার বিচিত্র খেলা। সহজে মনকে তার দিক থেকে ফিরতে দিতে চায় না।

কী যে গুরুত্ব এর, কি যে Significance, বুঝতে পারলাম না। কিন্তু দুঃখ ক্লান্ত-

বিপর্যস্ত মনকে এতে একটা বিশেষ আশ্রয়ের মধ্যে ঠেলে দেওয়া যায়, এটা বুঝতে পারলাম। অন্তত সেই কয় মুহূর্ত মন যেন জীবনের বিপর্যয়ের যন্ত্রণা ভুলে থাকতে পারে।

রোজ রাত্রিবেলা খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই যখন ঘুমোতে যায়, চারিদিক নিঝুম হয়ে পড়ে, তখন বসি। নিজের মনকে স্থির করবার চেষ্টা করি দুই ভুরুর মাঝ বরাবর দিগন্তে মন ফেলে দিয়ে।

সিউড়ির ব্রাঞ্চে আমি যাইনি। চাকুরি ছেড়ে দিয়েছি। ভাবছি কি করব, ইতিমধ্যে আমার এক বন্ধুর সঙ্গে দেখা। কলকাতার একটি নাইট কলেজে কাজ করে। সকাল থেকে দুপুর অবধি সেও ফ্রি, কাজ না থাকার জন্য আমিও ফ্রি। রাস্তার এক বইয়ের দোকানে আমি সকাল বেলাটা বসে বসে গল্প করি। একদিন সেই বন্ধুটি আমাকে দেখে বলল, আরে। মৃগাঙ্ক!

বললাম, হ্যাঁ।

—অফিসে যাসনি?

ওর দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

—তুই একটা ভাল ফার্মে কাজ করতিস না?

—হ্যাঁ।

—তবে এখানে বসে? week days-এ।

বললাম, চাকুরি নেই।

—সেকি!

—হ্যাঁ।

—কী করছিস তবে এখন?

—বেকার বসে।

—আগে তো অধ্যাপনা করেছিলি কয়দিন?

—হ্যাঁ।

—অধ্যাপনা করবি?

—পাব কোথায়?

—আমাদের কলেজে একজন হিস্টিরির লেকচারার নেবে। মডার্ন হিস্টিরির, তোর তো মডার্ন?

—হ্যাঁ।

—করবি চাকরি?

—পাব?

—আয় না আজ আমাদের কলেজে। প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব?

—যাব?

—আয়।

সেই সন্ধ্যাতেই ওর নাইট কলেজে প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। তখনও ইউনিভার্সিটি সার্ভিস কমিশন হয়নি। লোক নেওয়া কলেজ-অথরিটির উপর নির্ভর করে। প্রিন্সিপ্যালের যদি গভর্নিং বডির উপর প্রভাব থাকে, তবে তিনিই সর্বেসর্বা। প্রিন্সিপ্যাল বাংলা সাহিত্যের লোক। আমার বন্ধুটি আমাকে লেখক হিসেবে পরিচয় করিয়ে দিল। প্রিন্সিপ্যালের খুব খুশি হলেন। বললেন, আপনার 'মিথুন' বইটি পড়েছি। খুব ভাল লেগেছে। আপনার ঐতিহাসিক অ্যানালিসিস যেমন, অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যাও তেমনি। সত্যি কথা বলতে কি, ভারতীয় মন্দির-ভাস্কর্যে মিথুন তত্ত্ব এতদিনে আমার কাছে স্পষ্ট হল। কথা দিচ্ছি, আমি আপনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব। তবু, একটা interview-এর প্রশ্ন তো আছে! একটা অ্যাপ্লিকেশন পাঠিয়ে দেবেন।

পরদিনই অ্যাপ্লিকেশন পাঠালাম। Interview হল। আমিই নির্বাচিত হলাম। দিন পনেরো বেকার বসে থাকতে হল মাত্র। কাজ ঠিকই জুটে গেল। বেহালার সেই জ্যোতিষীটির দেখলাম ভবিষ্যৎদৃষ্টিতে সত্যিই ভুল নেই।

নতুন চাকরি পাবার পর একদিন আবার তাঁর কাছে গেলাম। উনি হেসে বললেন, আসুন, কেমন আছেন?

হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললাম, দেখুন।

গ্লাস দিয়ে হাতের রেখা দেখতেই তাঁর মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। হাসি-হাসি মুখে আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, জ্যোতি দেখছেন?

বললাম, নতুন চাকরি পেয়েছি।

উনি বললেন, ও নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই। জ্যোতি দেখছেন, সেটাই বড় কথা।

যা দেখছি ওঁকে বর্ণনা দিয়ে বললাম। তারপর জিজ্ঞাসা করলাম,—কিন্তু এ দেখে কী হবে?

উনি বললেন, কী হবে একটু অপেক্ষা করলেই বুঝতে পারবেন। যা করছেন, করে যান। মহাশক্তি আপনাকে অনেক কিছুই দেবেন। তবে একটা কাজ করবেন, এর জন্য শরীরটাকেও কিছু তৈরি করতে হয়। শরীর যত নিরোগ ও সুস্থ থাকবে ততই ধ্যান ভাল হবে। ততই অনেক জিনিস লক্ষ্য করতে পারবেন।

জ্যোতিষীর কাছ থেকে ফিরে আসার পথে যোগ-ব্যায়ামের একটা বই নিয়ে এলাম। এবং কতগুলো বিশেষ যোগ-ব্যায়াম আমার পক্ষে প্রয়োজন মনে করে তার অনুশীলন করবার চেষ্টা করলাম, যেমন, সর্বাঙ্গাসন, হলাসন, মৎস্যাসন, জানুশিরাসন, পশ্চিমোত্তান আসন, ভুজঙ্গাসন, শলভাসন, ধনুরাসন, অর্ধমৎস্যেন্দ্রাসন, ভদ্রাসন, শক্তিচালনী মুদ্রা এবং সকালবেলা শীর্ষাসন।

প্রথম প্রথম ভেবেছিলাম পারব কিনা। কিন্তু অনুশীলন করতে গিয়ে দেখলাম, কোনোটাই যেন কঠিন নয়। হলাসনে বেঁকে যাওয়া, জানুশিরাসনে মাথা হাঁটুতে ঠেকানো, পশ্চিমোত্তান আসনে জোড়া হাঁটুতে মাথা ঠেকানো, ধনুরাসন করা, ভদ্রাসন করা

কোনোটাই যেন কঠিন লাগল না। এমনকি অল্পদিনের মধ্যেই শীর্ষাসনও রপ্ত করে নিলাম।

দেখলাম, এতে সত্যিই ধ্যান ভাল হল। আলোর বৃত্ত দিনের পর দিন বড় হয়ে ফুটতে লাগল। মনে হতে লাগল, আলোর বৃত্তের মধ্য দিয়ে যে অন্ধকার জগৎ উঁকি দেয় তার মধ্য দিয়ে বহুদূরলোক থেকে একটা ইশারা আসে। মনকে সেই অন্ধকারের মধ্য দিয়ে উধাও করে দিতে চাই অনেক সময়। মনে হয়, যেন খুব দ্রুত ছুটে চলেছি কোনো এক অজ্ঞাত কেন্দ্রকে লক্ষ্য করে। অনেক সময় ভয় লাগে। মনে হয় কোথায় যেন হারিয়ে যাচ্ছি। মরে যেতে পারি। তাড়াতাড়ি চোখ মেলে তাকাই।

আরও একটা অদ্ভুত জিনিস লক্ষ্য করতে লাগলাম। আসনে বসে থাকলেও আমি যেন ডাইনে-বাঁয়ে দুলছি। যেন কোনো একটি কুব্জ পৃষ্ঠের উপর বসে আছি, তাই balance রাখতে পারছি না।

আবার এলাম আমার সেই জ্যোতিষীর কাছে। সব খুলে বলতে তিনি হাসলেন, বললেন, এ কিছুই নয়। তবু আপনি যা দেখছেন, যা বোধ করছেন, এ অবস্থায় আসতেই বহু লোকের সারা জীবন কেটে যায়।

—কেন, সবাই চোখ বুজলে বিন্দু দেখতে পায় না?

—না।

—আচ্ছা, আমার শরীর দোলে কেন?

জ্যোতিষী হেসে বললেন, একে বলে কুর্মাসন। তন্ত্রে কুর্মাসনকে একটি শ্রেষ্ঠ আসন বলা হয়েছে। যেন কুর্মপৃষ্ঠের উপর বসে সাধক সেখানে ধ্যান করেন। এই আসনে আর একটি জিনিস দরকার। কচ্ছপ যেমন হাত-পা পেটের মধ্যে গুটিয়ে নেয়, প্রবৃত্তিকেও তেমনি ভেতরে ঢুকিয়ে নিতে হয়—সে যাতে বহির্মুখী হতে না পারে। এ-সব আপনার কাছে কিছু নয়, আরও দেখবেন।

কী পাচ্ছি জানি না, এ দেখার মূল্য কি আছে জানি না, তবু এগিয়ে যেতে লাগলাম। জ্যোতির্বলয় যেন এখন ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ছে। সামনে একটা আকাশের মত দেখতে পাচ্ছি। অনেকটা জ্যোতিপূর্ণ মেঘকে যেন অন্ধকার আকাশের বুকে কোদালেমেঘের মউজের মত মনে হচ্ছে। একটা ক্ষীণ আলোর জ্যোতি দেখছি—বড় স্নিগ্ধ, বড় মধুর। অদ্ভুত লাগছে আরও একটা জিনিস দেখে, মাঝে-মাঝে যেন স্পষ্ট আমাকেই দেখছি, আমার দিকে পেছন ফিরে বসে আছি। পরে এ রহস্যের উত্তর পেয়েছি physics পড়ে।[১] ভয়ানক কৌতূহল হল। নিজেকে এমন করে দেখার

১. ...If we were living in a small hypersphere (more than three dimensional sphere) light could circulate completely around our universe. Then through our most powerful telescopes one would eventually see the back of his own head.–Beyond Einstein–M. Kaku and J. Trainer. p. 174.

অর্থ কি—জানবার জন্য আবার সেই জ্যোতিষীর কাছে গেলাম। বুঝতে আমার আর বাকি নেই যে, উনি বাইরে একজন জ্যোতিষী হলেও ভেতরে তন্ত্রসিদ্ধ সাধক।

ওঁর কাছে গিয়ে আমার এই নতুন দেখার অর্থ জিজ্ঞাসা করতে তিনি হাসলেন। বললেন, ধ্যান করছেন বটে, আসলে এ হল যোগ সাধনা। যোগীরা পরম সত্যকে বলেন পরমাত্মন। অর্থাৎ সোঽহং। অন্তরে ডুব দিলে অন্য কিছুই দেখা যায় না, নিজের স্বরূপকেই চেনা যায়। নিজের প্রতিমূর্তিদর্শন হল সে-দিকেরই একটা ইঙ্গিত।

শুধুমাত্র যে নিজের মূর্তিই দেখতে লাগলাম তা নয়, আরও সব নানা ধরনের মূর্তি দেখতে লাগলাম। আশ্চর্য সব জ্যান্ত মানুষ! কারা, কেন যে চোখের সামনে ভাসছে, তাই ভাবি![১]

কিন্তু এর চাইতেও আশ্চর্য জিনিস যেটা সেটা হল এই যে, সেই অন্ধকারটা যেন এখন আর তেমন ভাবে ফুটে উঠছে না। আমার নিজের ভেতরেই যেন অনন্ত এক আকাশ আছে। সেই আকাশটা চোখে পড়তে লাগল। লক্ষ্য করতে লাগলাম—কখনও কখনও অকস্মাৎ নক্ষত্রখচিত রাত্রির আকাশটাও যেন স্বাভাবিক দৃশ্য নিয়ে ফুটে উঠে। তারপরই আবার সব ঘন শ্বেত ধূম্রজাল হয়ে যায়। কিন্তু সমস্ত কিছুর মাঝখানে যেন সকল শক্তির উৎস হিসেবে বিরাজ করে একটি নক্ষত্রের মত বিন্দু। সেই নক্ষত্র থেকে ছড়িয়ে পড়া আণবিক কণায় যেন সমগ্র আকাশ পরিপূর্ণ হয়ে আছে। কখনও সেই নক্ষত্র স্বরূপ আলোর বিন্দুটি কাছে এগিয়ে আসে, কখনও দূরে চলে যায়। অদ্ভুত আকর্ষণ সেই বিন্দুটির। রহস্যময় খেলা খেলে যেন। ক্রমশ অদ্ভুত ভাবে আকর্ষণ বোধ করছি সেই বিন্দুটির দিকে। আর যতই আকর্ষণ বোধ করছি ততই বাইরে থেকে মন সরে যাচ্ছে। মন চলে আসছে দেহের অভ্যন্তরে।

এই নতুন পরিস্থিতি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে সেই সাধক জ্যোতিষী বললেন, তন্ত্র বলে, এই দেহের মধ্যে গুহ্যদ্বার ও লিঙ্গমূলের মাঝখান থেকে ভ্রূ-মধ্যস্থ স্থান পর্যন্ত ছ'টি চক্র আছে—মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ ও আজ্ঞাচক্র। যোগ সাধনায় মূলাধারস্থ কুণ্ডলিনী শক্তি জাগরিত হয়ে উর্ধ্বে উঠতে থাকে। এক একটি চক্র ভেদ করার মুখে তিনি সাধকের ধ্যানদৃষ্টিতে আকাশের নানা বর্ণ তুলে ধরেন। প্রথম দর্শন হয় লাল বর্ণ। তখন চেতনা মূলাধার ও স্বাধিষ্ঠানের মধ্যে থাকে। তারপর দেখা যায় সবুজ বর্ণ। এ সময় চেতনা থাকে স্বাধিষ্ঠান ও মণিপুর চক্রের মাঝখানে। এ দুটি চক্র পার হয়ে গেছেন আপনি। কিন্তু এ দুটি বর্ণ খেয়াল করে

১. ...If we peer into our telescope again a slightly different angle, we see an image of ourself. If we continue to peer into our telescope at yet another angle we will see another carbon copy. In fact if we continue to slightly change the angle of our vision we will see an infinite number of people, each peering into a telescope at the person in front of him.–Beyond Einstein, M. Kaku and J. Trainer, p. 174.

দেখেননি। বস্তুত রাত্রিবেলা যাঁরা ধ্যানস্থ হন তাঁরা স্পষ্টভাবে এই দুটি রঙ দেখতে পান না। আপনি দিনের বেলা বসে দেখবেন, একটু আলোতে, সূর্যের আলো যেখানে পড়ে; দেখবেন, চোখ বুজলে প্রথমেই গাঢ় লাল আকাশ দেখতে পাচ্ছেন। সেই লালের মধ্যে ধীরে ধীরে ফুটে উঠবে সবুজ বৃত্ত। ধীরে ধীরে লাল সরে যাবে, সবুজ ছড়িয়ে পড়বে। তারপর সবুজ ফিকে হতে হতে জলো জলো ভাব দেখবেন। এর-পরই মনের আকাশে সাদা রঙ উঁকি দেবে। জানবেন, সাধকের চেতনা তখন মণিপুর চক্রে এসেছে। নাভিদেশে মণিপুর চক্র। অগ্নির স্থান। শক্তি ঊর্ধ্বদিক থেকে নামার পথে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের এই স্তরেই প্রথম অণুকণা রূপে রূপান্তরিত হয়েছিল, অর্থাৎ বাষ্পরূপে বা গ্যাসীয় আকারে দেখা দিয়েছিল। এই রঙ রাত্রিবেলা ধ্যানে বসলেও দেখা যায়।[১] এবার থেকে সকাল বেলাতেও স্নান সেরে ধ্যানে বসতে পারেন।

অদ্ভুত একটা আকর্ষণ পাচ্ছিলাম ধ্যানে। একেবারে যে নিবিষ্টচিত্ত হতে পারছিলাম তা নয়। বাইরের যে কাঁটা মনের মধ্যে ফুটেছিল তা মাঝে মাঝেই যন্ত্রণার সৃষ্টি করছিল। ধ্যানে বসে অনেক সময়ই মনে পড়ে যাচ্ছিল হয় মিসেস মিত্রের কথা, নয় তো আরতির কথা। একথা আমার সাধক জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, জানবেন, মনও এক ধরনের সূক্ষ্ম বস্তু দিয়ে তৈরি। আমাদের এই স্থূল দেহটাই সব নয়। পরমাত্মা ছটি আবরণের দ্বারা দেহের মধ্যে আবদ্ধ আছেন। একে আমাদের শাস্ত্রে বলা হয়েছে ষড়কোষ। যে দেহটা আমরা দেখি এটা হল পরমাত্মার স্থূল কোষ। এর উপর একটা সূক্ষ্ম দেহ আছে, যে দেহ এই স্থূল দেহের খুব কাছাকাছি। মৃত্যুর পর আকাঙ্ক্ষাগুলি এই সূক্ষ্ম দেহে বাসা বেঁধে থাকে, যার ফলে আকাঙ্ক্ষা যদি খুব বেশি হয় এই সূক্ষ্ম দেহ ভূত আকারে দেখা দেয়। এই দেহকোষের নাম অন্নময় কোষ। এর উপর সূক্ষ্মতর আরও একটি কোষ আছে, যাকে বলে প্রাণময় কোষ। এর উপরও আছে একটি কোষ, মনময় কোষ। এর উপাদান, আরও সূক্ষ্মতর বস্তু। এই মনময় কোষের উপরে রয়েছে সূক্ষ্মতম উপাদান, এর উপরে আনন্দময় কোষ এবং সর্বোপরি বিজ্ঞানময় কোষ। যে পরমাত্মা বস্তুদেহের মধ্যে রয়েছেন সেই পরমাত্মারই সমুদ্রসদৃশ ব্যাপ্তি রয়েছে দেহের মধ্যে। কুলকুণ্ডলিনীর মাত্রা বৃদ্ধি হেতু কোষের বন্ধন ছিন্ন হয়ে সীমাহীন এক ব্যাপ্তি মানসনেত্রে প্রতিভাত হয়। এক একটি দেহ হল সমুদ্রের জলে ডুবে থাকা কলসীর মত। বাইরেও সমুদ্র, ভেতরেও সমুদ্র। শুধু আবরণের জন্য ভেতরের সমুদ্র সীমাবদ্ধ দেখায়। আবরণ ভেঙে গেলে আবার উভয়েই মিশে যায়। ভেতরের পরমাত্মাও কোনো বস্তু দিয়ে গঠিত নয়, বাইরের পরমাত্মাও কোনো বস্তু দিয়ে গঠিত নয়। আসলে ভেতরের পরমাত্মার উপর বস্তুদেহের আবরণ বাদে রয়েছে পাঁচটি কোষ, অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ, মনময়

১. এর বিস্তৃত ব্যাখ্যার জন্য পাঠক লেখকের 'দিব্যজগৎ ও দৈবীভাষা' গ্রন্থ পড়তে পারেন।

কোষ, আনন্দময় কোষ ও বিজ্ঞানময় কোষ। অন্নময় কোষ এই স্থূল দেহ থেকে কিছুটা তরল। চেতনা কুলকুণ্ডলিনী শক্তির ঊর্ধ্বগতির পথে মূলাধার অঞ্চলে থাকাকালে এই কোষ লালবর্ণে প্রকাশিত হয়। এর উপর স্বাধিষ্ঠানে হল প্রাণময় কোষ। এই কোষ সবুজ আকারে দেখা দেয়। তার উপরে মনময় কোষ, এই কোষ শরতের আকাশে সাদা মেঘের মত, গ্যাসীয় জগৎ। এখানে শক্তি প্রচণ্ড ভাবে ঘোরাফেরা করে মণিপুরে চক্র থেকে অনাহত চক্র পর্যন্ত। অনাহত চক্রে উঠলে এই কোষ দুর্বল হয়ে পড়ে। মানসিক ক্রিয়া তখন কমতে থাকে। স্নিগ্ধ নীল আকাশের মত আকাশ দেখা দেয়। এর পর নীলিমা সূক্ষ্ম ও জ্যোতির্ময় হতে থাকে। বিশুদ্ধে পৌঁছে এই আকাশ ক্রমশ গভীর নীল আকাশে প্রকাশিত হতে থাকে। এই নীলের বুকের উপর দিয়ে বয়ে যায় প্রচণ্ড জ্যোতির্ময় আলো। এই আলোর খেলা চলে বিশুদ্ধচক্র থেকে আজ্ঞাচক্র পর্যন্ত। নানা বিচিত্রভাবে এই আলোর খেলা চলতে থাকে। নানাভাবে রঙ বদলায়। এই স্তরে মন এত নিস্তেজ হয়ে পড়ে যে, সে আর যেন চিন্তাই করতে পারে না। কিন্তু মনের সূক্ষ্মতম অবস্থা 'অহংকার' তখনও পর্যন্ত কাজ করে। সুতরাং মনের ক্রিয়াকে সহসা বন্ধ করা যাবে না। দেহ যেমন এক্সারসাইজ করলে সুস্থ হয়, ডিসিপ্লিন্ড হয়, তেমনি নিয়মানুবর্তিতা শেখার জন্য ও সুস্থতা ফিরে পাবার জন্য মনকেও বিশুদ্ধচক্র অবধি বিচরণ করতে হয়। সুতরাং যা করছেন করে যান, একদিন আপনার মন নিজে থেকেই সুস্থ হয়ে উঠবে।

সাধারণ একটা লোকের পক্ষে আপনি যে কাজ করছেন তা করা সম্ভব হোত না। মন বিক্ষিপ্ত থাকলে যোগ সম্ভব নয়, কুলকুণ্ডলিনী শক্তিতে গতি সঞ্চার হয় না। আপনি জন্ম-জন্মান্তর সাধনা করে কুণ্ডলিনী শক্তিকে জাগরিত করে একে একে ছটা চক্রই প্রায় ভেদ করেছিলেন। কিন্তু কর্মক্ষয় করতে পারেননি বলে আবার জন্মেছেন। কর্মফল কাটাতে হচ্ছে। যা কিছু চিত্তের দুর্বলতা ছিল কাটাতে হবে। সূক্ষ্ম আকাঙ্ক্ষা আপনার চিত্তে সুপ্ত ছিল বলে আবার জন্মাতে হল। এবার সেই বন্ধন ক্ষয় করবেন। সেই জন্যই প্রেম ভালবাসার প্রতি আপনার এই আগ্রহ। কিন্তু গুরু আপনাকে বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকতে দেবেন না বলে প্রণয়িনীকে পেতে দেননি।

ধ্যানে বসতেই আপনার সেই প্রাক্তন যোগাভ্যাস সংস্কারের ফলে অতি দ্রুত জেগে উঠেছে। এই যোগভ্যাস করার জন্য আপনার কোনো গুরুর প্রয়োজন নেই। শুধু মোক্ষের মুহূর্তে গুরুকে আপনি দেখতে পাবেন। ধরুন, আপনি জাহাজের চালক। নদী দিয়ে জাহাজ চালাচ্ছেন। ক্যাপ্টেন আপনার হাতেই জাহাজের দায়িত্ব দিয়েছেন। মোহানা পর্যন্ত বিপদ কম। এ পর্যন্ত জাহাজ চালনাতে আপনার অভিজ্ঞতাও আছে। আপনার গুরু অর্থাৎ জাহাজের ক্যাপ্টেন এপর্যন্ত আপনার কাছে আসবেন না। কিন্তু যেই মাত্র জাহাজ সমুদ্রের অসীম বিশাল জলরাশির কাছে আসবে তখনই ক্যাপ্টেন নেমে আসবেন। কারণ, তা না হলে জাহাজডুবি হতে পারে। আপনি যা করছেন

করে যান। মন একদিন আপনিই নিয়ন্ত্রিত হবে।

জীবন-রহস্য প্রচণ্ড রকমের জটিল। সাধারণ মানুষ তো দূরস্থান মহা মহা বিজ্ঞানীরা পর্যন্ত এ ধাঁধার জবাব দিতে পারেননি। ভারতীয় যোগীরা দাবি করেন, তাঁরা এ জটিল রহস্যের সমাধান খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু তাঁদের কথার সত্যতা যাচাই হবে কী করে? নিজে যোগাভ্যাস করে সেই পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাতে না পারলে এর সত্যতা বিচার করা যাবে না। আমার সাধক-জ্যোতিষীর অনেক কথাই আমার কাছে হেঁয়ালি মনে হয়। অথচ ধ্যানে বসবার পর কতকগুলো বিচিত্র অভিজ্ঞতা তো আমারও হচ্ছে! সেইজন্য ভাবলাম কিছুদিন অভ্যাস করে দেখব।

জ্যোতিষীর কথামত সকালেও বসতে লাগলাম। দু'একদিন জানালা খুলে বসলাম, সামনে রোদের ঝলক রেখে। সত্যি সত্যি রোদের ঝলক সামনে রেখে যদি বসা যায় তাহলে ধ্যানের প্রথম প্রহরে চোখের উপর লাল রঙ ভেসে ওঠে। তারপর সেই লাল রঙের মধ্যে বৃত্তাকার একটি সবুজ রঙ ফুটে উঠে। সেই সবুজ ছড়াতে থাকে। তারপর জলো জলো ভাব হয়। এর পর মনের আকাশে সাদা বাষ্পীয় মেঘ দেখা দিতে থাকে।

সেই বাষ্পীয় মেঘ, আমার সাধক-জ্যোতিষীর কথায় যা মণিপুর চক্রের অঞ্চল, সেখান থেকে ক্রমশ চেতনাকে উর্ধ্বে উঠাবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

চুপ করে ভ্রূ মধ্যে মনকে স্থির করে রেখে দিগন্তে মনকে ছুড়ে দিলে ভেতরে অদ্ভুত ভাবে একটা বায়ুর খেলা চলতে থাকে যেন। মনে হয়, কি যেন মূলাধার অঞ্চল থেকে ঠেলে ঠেলে উপরের দিকে উঠতে চাইছে। যেন একটা পাখি ডানা মেলে দিয়ে উপরের আকাশে উঠছে এমন ভাব। কিছু কাল পরে সিরসির করে Spinal cord দিয়েও একটা চেতনা যেন কিছুদূর পর্যন্ত বেয়ে বেয়ে ওঠে। যতদূর ওঠে ততদূর পর্যন্ত শক্ত হয়ে যায়। ধ্যান করতে করতে হঠাৎ যেন কিছুদিনের মধ্যেই সাদা বাষ্পীয় মেঘ পাত্‌লা হয়ে উঠতে লাগল। সাদা মেঘ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হতে হতে একদিন মনে হল বাচ্চা ময়ূরের গলায় যেমন ধীরে ধীরে নীল রঙ ফুটে উঠে সেই রকম নীলের আভাস পাচ্ছি। সেই নীলের কিনারে গিয়ে পৌঁছানো মাত্র দেহের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে অণু-পরমাণুতে কেমন যেন আনন্দবোধ হতে লাগল। মন থেকে আপনিই রবীন্দ্রনাথের একটি গান ধ্বনিত হয়ে উঠতে লাগল—'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে।' সেই আনন্দধারা যেন অনন্ত। তার অপরিসীম স্বাদে মনপ্রাণ ভরে যায়।

নীলের সাধনা করতে করতে এক সময় নীলের মধ্যেই বিচিত্র খেলা শুরু হয়ে গেল। নীল কখনও সূক্ষ্ম, কখনও গাঢ়, আবার সূক্ষ্ম হতে লাগল। ক্রমশ ভেতরে ফুটে উঠতে লাগল এক স্নিগ্ধ নীল আকাশ। শরতের আকাশের মত নীল। সেই নীলের উপর যেন স্নিগ্ধ জ্যোৎস্নার একটা প্লাবন বয়ে যেতে লাগল। এত স্নিগ্ধমধুর এক বিশাল আকাশ যে, পার্থিব জগতে তার সমকক্ষ কিছু নেই। আমার সাধক-

জ্যোতিষীকে সে কথা বলতে তিনি বললেন, আপনি অনাহত চক্রে গিয়ে উঠেছেন। বহুকাল সাধনা করেও বহু সাধক এর সাক্ষাৎ পান না। এইবার অনেক কিছু দেখতে পাবেন।

বস্তুত অনেক কিছুই আমি তখন থেকে দেখতে পাচ্ছিলাম। যেমন বহু বিচিত্র জীবন্ত মানুষ, নানা শহর, কিছু তিব্বতি হরফ ইত্যাদি। সবচেয়ে আনন্দকর দৃশ্য তুষারাবৃত হিমালয়ের নানা শৃঙ্গ। জ্যোতিষীকে বলতে তিনি বললেন, এ-সব কিন্তু অলৌকিক কিছু নয়। এসব হল আপনার প্রাক্তন অভিজ্ঞতার প্রতিবিম্বিত ছবি।

এর মধ্যে একদিন হঠাৎ একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। রাত প্রায় বারোটা তখন। দেহ দুলছে। দেহভার অনেকটাই হাল্কা হচ্ছে। মণিপুর চক্রের শ্বেত বাষ্পীয় মেঘের স্তর পার হয়ে চেতনা নীল আকাশে ঘোরাফেরা করছে। সেই নীল আকাশে চেতনা যেন ডানা মেলে দিয়ে উড়ছে। হঠাৎ মনে হল, কে যেন বলছেন, ওঁ উচ্চারণ করো। আমি ওঁ উচ্চারণ করলাম। মনে হল নাভি থেকে শব্দটা উঠে আসছে। আর সমস্ত নীল আকাশ সেই ওঁ শব্দে ধ্বনিত হয়ে উঠছে—অ-উ-ম, অ-উ-ম। গুহায় দাঁড়িয়ে গম্ভীর আওয়াজ করলে তা যেমন প্রতিধ্বনিত হয় ঠিক সেই রকম। এত ভাল লাগে সে-শব্দ যে, বলে প্রকাশ করা যায় না। বারবার উচ্চারণ করতে লাগলাম—অ-উ-ম, অ-উ-ম, অ-উ-ম।

জ্যোতিষীকে বলতে তিনি বললেন, এই আপনার বীজমন্ত্র। যথাযথ এই মন্ত্র জপ করলে আপনি সমাধিস্থ হয়ে যাবেন। অবশ্য গুরু এখনও আপনাকে সমাধিস্থ হতে দেবেন না। কারণ আপনার অনেক কাজ আছে। তবে আপনি 'ওঁ' উচ্চারণ করে যান।

এর পর থেকেই অনাহত চক্রে উঠে নীল আকাশ দেখামাত্র আমার মনে হত 'ওঁ' উচ্চারণ করি। এই 'ওঁ' উচ্চারণ এত দীর্ঘ ও বিলম্বিত হতে লাগল যে, সাধারণ অবস্থায় এত দীর্ঘ সময় 'ওঁ' উচ্চারণ করা আমার পক্ষে সম্ভব হত না। সেই অ-উ-ম-এর রেশ ধরে চেতনাকে ছেড়ে দিলে ব্যক্তিসত্তা যেন কোথায় হারিয়ে যেতে চায়। ফলে ভয়ে-ভয়ে আবার ফিরে আসি। 'ওঁ' উচ্চারণ না করে নীল আকাশের একটা পাখির মত ডানা মেলে দিয়ে বেড়াতে থাকি। বস্তুত আমার সমগ্র সত্তাটাকেই তখন মনে হয় নীল আকাশে ভাসমান একটি দেহভারহীন পাখি। এই উড়ন্ত ভাবের নামই বিহঙ্গম যোগ।

অনাহত চক্রে উঠবার পর মন অনেকটা স্থির হচ্ছে। তেমন করে মিসেস মিত্র বা আরতির কথা আর মনে পড়ে না। মনে পড়লেও নীল আকাশের স্বাদ পাওয়া মাত্র তা যেন ভুলে যাই। বিভ্রান্ত মানব আত্মাকে একটা পাখির মতই মনে হয়। যতক্ষণ পিঞ্জরে থাকে, পিঞ্জরের চানা আর জলকেই পরম প্রাপ্তি বলে ভাবে। কিন্তু আকাশে একবার উড়তে পারলে পিঞ্জরে আর কখনও সে ফিরে আসতে চাইবে

না। সেই চন্দ্রজ্যোতি উদ্ভাসিত নীল আকাশে একবার যখন চেতনা সঞ্চরণশীল হয়, আর নিচে নেমে আসতে ইচ্ছে করে না।

ক্রমশ যেন ঘুরপাক খেয়ে উপরে উঠছি। আর যতই উপরে উঠছি, ততই ভাল লাগছে। দিনে-রাতে একটু অবসর হলেই মনে হয় চোখ বুজি, ভেতরের যে একটা অদ্ভুত নীলাকাশ আছে, তা দেখি। বাসে চলতে চলতেও চোখ বুজি। চোখের উপর ভেসে উঠে নীল আকাশ। প্রজাপতির পাখার মত যেন সেই নীল আকাশ পাখা নাড়ে। পাখাটা যেন একটা পর্দা। একটি পর্দা সরে যায় নিষ্কলঙ্ক আরও গভীর নীল আকাশ ফুটে উঠে। নীলিমায় নীল সে এক মনোরম আকাশ। আকাশটা ক্রমে ক্রমে স্থির হতে থাকে। কিন্তু এত সুদূরের আহ্বান সেই নীল আকাশে যে, অনেকক্ষণ সময় করে একদৃষ্টিতে সে দিকে তাকিয়ে থাকলে মনে হয়, কোথায় হারিয়ে যাব, আর ফিরতে পারব না।

একদিন সকালবেলা বিছানা ছেড়ে উঠতেই হঠাৎ কেন যেন মনে হল জল খাই। আকণ্ঠ জল পান করে নিলাম। তারপর মুখ-ধুতে গিয়ে যেই জিভ কচলাবার জন্য জিভে হাত দিয়েছি ভেতর থেকে যেন সমস্ত জল উগ্‌রে বাইরে বেরিয়ে এল। ভেতরের সমস্ত ক্লেদ বেরিয়ে এল তার সঙ্গে। শরীরটা হাল্কা মনে হল। সেদিন সকালে ধ্যানে বসতে মনে হল, চেতনা দ্রুত একটা রকেটের মত ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে। মুহূর্তের মধ্যে মণিপুর চক্র পার হয়ে সে অনাহত চক্রের নীল আকাশে এসে ভাসতে লাগল। স্পষ্ট বুঝতে পারলাম, দেহের ভেতর মুখ্যত দুটি বায়ু খেলা করে। একটি নিচে নামে, আর একটি উপরে ওঠে। বায়ু যখন উপরে ওঠে তখন গভীর নীলিমা চোখের সামনে ভেসে আসে। যখন নিচে নামে তখন আবার বাষ্পীয় মেঘে সাদা হয়ে যায়।

জ্যোতিষীর কাছে সে কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, দেহের ভেতর দুটি মুখ্য বায়ু আছে, প্রাণ বায়ু যা উপরে টানে; অপান বায়ু যা নিচে নামায়। দেহের ভেতর দুটো বাজপাখির মত খেলা করে। উভয়ে উভয়ের নখ আঁকড়ে ধরে যেন ধস্তাধস্তি করছে। যখন প্রাণ বায়ুর প্রভাবে চেতনা উপরের দিকে ওঠে—তখন জীবাত্মা মুক্তির দিকে ধাবিত হয়। যখন অপান বায়ুর প্রভাবে নিচের দিকে নামে তখন বন্ধনে আবদ্ধ হয়। কিছুদিন মূল্য থাকে সমান সমান। তারপর অপান বায়ু ক্রমে ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। মুহূর্তের মধ্যে সে প্রাণবায়ুর প্রভাবে নিস্তেজ হয়ে পড়ে। যোগী সাধক তখনই ঊর্ধ্বপথে নিরাপদ হয়ে ওঠেন। এই সময় দেহে আরও কয়েকটি বায়ু খেলা করে। যেমন সমান বায়ু। বায়ু স্থির হলে মনের আকাশের নীলিমা ক্রমশ সূক্ষ্মতর হতে হতে দর্পণের আকার নেয়। সেই দর্পণে তখন বিচিত্র দৃশ্য ফুটে উঠতে থাকে, ঠিক টি.ভি-র পর্দায় যেমন ছবি ফুটে উঠে, সেই রকম। তারপরই উদান বায়ু ও ব্যান বায়ুর খেলা শুরু হয়। ব্যান বায়ু সারা দেহের প্রতি রন্ধ্রে-রন্ধ্রে প্রবেশ করে দেহটাকে একটি টিউবের মত করে দেয়। ব্লাডারের মতন তখন সমস্ত দেহটা

হাল্কা হয়। দেহটা যেন ভাসমান কিছু, এমন মনে হয়। নিবিড় ধ্যান হলে এই সময় হঠযোগ হয়। দেহ তখন আসন ছেড়ে ঊর্ধ্বে উঠতে থাকে। উদান বায়ু কুলকুণ্ডলিনীতে চাপ সৃষ্টি করে spinal cord দিয়ে তাঁকে উপরে সহস্রারের দিকে ঠেলতে থাকে। এই মহাশক্তি যখন যে-চক্রে এসে উপস্থিত হন তখন সেই চক্র অনুযায়ী নানা রঙের খেলা চলতে থাকে। দেহে এই পাঁচটা বায়ুর স্পষ্ট প্রভাব অল্পদিনের মধ্যেই আপনি বুঝতে পারবেন।

অনাহত চক্র দিয়ে ক্রমশ যখন নবনব নীলিমার দিকে অগ্রসর হচ্ছি, তখন কিন্তু কতকগুলি ঝঞ্ঝাটও এসে জুটতে লাগল। কলেজে আমার বিরুদ্ধে একটি ষড়যন্ত্র হল। মিসেস মিত্র অদ্ভুত সব লোভনীয় চিঠি লিখে আমাকে আকর্ষণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কখনও কখনও সেইসব চিঠি পড়ে আমার মন তাঁর দিকে ধেয়ে যেতে লাগল। এমন সময় অঞ্জনাও এসে কয়েকদিন আমাকে বিরক্ত করল। ডে-কলেজের এক সুন্দরী অধ্যাপিকার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। একটা নির্দোষ নিবিড় বন্ধুত্বই গড়ে উঠেছিল। তা নিয়ে রীতিমত scandel ছড়িয়ে পড়ল। এসব ঘটছে কেন, আমার সাধক-জ্যোতিষীকে জিজ্ঞেস করতে তিনি বললেন, প্রকৃতির নিয়ম-অনুযায়ী এমন ঘটছে।

—অর্থাৎ?

—কোনো জিনিস যদি পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ কাটিয়ে উপরে উঠতে চায় তো কী হয়?

—কী হয়?

—পৃথিবী তাকে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দিয়ে আরও বেশি করে টানবার চেষ্টা করে নাকি?

—তা করে!

জ্যোতিষী হেসে বললেন, আপনি যে সাধনা করছেন, তা হল প্রকৃতির ঊর্ধ্বে ওঠার সাধনা। সে-ক্ষেত্রে প্রকৃতিও তো আপনাকে টেনে রাখবার চেষ্টা করবেই। সেইজন্য এ-সব ঘটছে। লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে, বিভ্রান্ত করে আপনাকে ধ্যানচ্যুত করতে চাইছে। কিন্তু পারবে না।

—কেন?

—যে রকেটের শক্তি বেশি, তাকে কি পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণ ক্ষমতা দিয়ে টেনে রাখতে পারে?

—না।

—আপনার মধ্যে যে শক্তি সঞ্চারিত হয়েছে, তা রকেটেরই মত শক্তিশালী। মাধ্যাকর্ষণ বৃত্তের বাইরে নিয়ে আপনাকে একবার ফেলতে পারলেই দেখবেন, সব ঝড়ো হাওয়ায় পাতলা মেঘের মত উড়ে যাচ্ছে। আপনার জীবনের পথে এ-সব কিছু আর থাকবে না।

ধৌতি ক্রিয়া ও নৌলি ক্রিয়া দুটোই করছি। করছি যোগ-ব্যায়াম। দেহকে নীরোগ না করতে পারলে বায়ুর নির্বিরোধ ক্রিয়া সম্ভব নয়। আর বায়ুর ক্রিয়া যদি ত্রুটিমুক্ত না হয় তাহলে কুণ্ডলিনী-শক্তি তেমন ভাবে উপরে উঠতে পারে না। তাছাড়া ভেতর যদি পরিষ্কার না হয় যে-কোনো সময় যোগসাধকের পক্ষে তা বিপদের কারণ হতে পারে। সুতরাং দেহের প্রতিও যত্ন নিতে হচ্ছে। ফলে সমস্ত দেহটি দিনের পর দিন হাল্কা হয়ে উঠছে। ধ্যান করতে গিয়ে দেখি, প্রাণায়াম হচ্ছে বিনা চেষ্টাতেই। অনাহত চক্রে উঠবার পরই শ্বাস প্রায় রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বায়ু এক একসময় এমন সমান হয়ে যাচ্ছে যে, প্রাণবায়ু বা অপানবায়ু কারো খেলাই অনুভব করা যাচ্ছে না। স্থির নীলাকাশ ক্রমশ বিবর্ণ হতে হতে একটা দর্পণের মত আকার নিচ্ছে। সেই দর্পণে অদ্ভুত অদ্ভুত জ্যান্ত ছবি ফুটে উঠছে। হ্যালুসিনেশন যা ইল্যুশন বলে একে ভাববার কোনো কারণ নেই। অদ্ভুত ভাবে পাঁচজন পরিচিত ব্যক্তিকে দেখলাম আমি। যে-সময় যে অবস্থাতে তাঁদের আমি দেখেছিলাম, ধ্যানের পর সেই সময় ও অবস্থার কথা নোট করে নিলাম। পরে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে সে-কথা বলতে তারা চমকে উঠলেন। যথার্থই সেই সময় সেই অবস্থাতেই তাঁরা ছিলেন।

আমার জ্যোতিষীকে সে-কথা বলতে তিনি বললেন, এ হল অষ্টসিদ্ধির এক সিদ্ধি। অনিমা লঘিমা আদি অষ্টসিদ্ধি আছে। যেমন দেহ হাল্কা হওয়া, ইচ্ছামত দেহকে ভারী করা, ইচ্ছেমত যে-কোনো লোককে দেখা ইত্যাদি। এগুলো হল পরমাত্মন লাভের পথে বিরাট অন্তরায়। এই ক্ষমতার মোহে আবদ্ধ হয়ে সাধক আর ঊর্ধ্বে উঠতে চান না। আপনার অদৃশ্য গুরু আপনাকে এ ক্ষমতা বেশিদিন রাখতে দেবেন না। আপনার যে বড় কাজ! যখন সমগ্র পৃথিবীতে ধর্মের গ্লানি চলেছে তখন ধর্ম পুনঃ প্রবর্তনের জন্য আপনাকে সৈনিকের মত খাটতে হবে। সুতরাং পরমাত্মনের স্বরূপ বোধ আপনার হবেই।

জিজ্ঞাসা করলাম, দর্পণসদৃশ যে দৃশ্য দেখছি সেটা কী?

জ্যোতিষী বললেন, আত্মার একটি পর্যায় মাত্র। অরবিন্দ বলেছেন, আত্মা হল Luminous তারই সামান্য পরিচয় পেয়েছেন মাত্র। সেই Luminous পরমাত্মন সর্বত্রই স্থির দর্পণের মত বিরাজ করেন। যিনি সেই পরমাত্মনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেন তিনি জগতের সব কিছুই দেখতে পান, জানতে পান। পরম যোগীপুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে পরমাত্মার স্বরূপ মুহূর্তের জন্যে বুঝতে দিয়েছিলেন বলেই অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করেছিল। এবার তাহলে আপনি নিজেই বুঝতে পারছেন যে বস্তু-জগতের ঊর্ধ্বেও একটা জগৎ আছে? বস্তু-বিজ্ঞান দ্বারা তার ব্যাখ্যা করা যায় না?

বললাম, এখন তাই মনে হচ্ছে।

—এখনও মনে হচ্ছে?

বললাম, যতক্ষণ পরমাত্মার স্বরূপ না বুঝব, ততক্ষণ সন্দেহ থাকা তো স্বাভাবিক।

জ্যোতিষী জিজ্ঞাসা করলেন, এই যে আপনি ঘরে বসে কয়েকটি লোককে স্পষ্ট দেখতে পেলেন, তারা তো অনেক দূরে ছিল, কি করে দেখতে পেলেন?

বললাম, সেটা আমি ব্যাখ্যা করতে পারব না।

—তাহলে আপনার অবিশ্বাস কেন?

কোনো জবাব দিতে পারলাম না।

অনাহত চক্রের নীল আকাশ ক্রমশ সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতার হচ্ছে। নীলের উপর একটা স্নিগ্ধজ্যোতি ক্রমশ আলোর আকৃতি নিচ্ছে। এই অবস্থাতে দেখতে লাগলাম নানা যোগীপুরুষের ছবি। একদিন দেখলাম বিবেকানন্দকে, জ্বলন্ত সূর্যের মধ্যে যেন তিনি রয়েছেন বীর্যদৃপ্ত ভঙ্গিতে। দেখলাম শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণকে। সারদামণিকে রোজই দেখতে লাগলাম। দেখলাম অরবিন্দকে। দেখতে লাগলাম দেবদেবীর প্রতিমূর্তি—কালী, দুর্গা, শিবলিঙ্গ ইত্যাদি।

সাধক জ্যোতিষীকে জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, সূক্ষ্মদেহে এই সাধকেরা এক একটি দেশে বিচরণ করছেন। আপনি ধ্যানে বসে সূক্ষ্ম দেহে সেইসব সূক্ষ্ম জগতে এঁদের দেখতে পাচ্ছেন। এঁরা কেউ পরমাত্মার সঙ্গে বিলীন হননি। জগৎ হিতায়চ আবার একদিন ধরাধামে আবির্ভূত হবেন। পরোক্ষভাবে এঁদের আত্মা আপনার প্রেরণাদাতাও বটে।

—এই যে মূর্তিগুলো দেখছি?

—এসব সংস্কার।

—মূর্তি তো কতকগুলি ভাবের প্রতীক মাত্র?

জ্যোতিষী হাসলেন। বললেন, সে-কথা বলব না। নিজেই আপনি অল্পদিনের মধ্যে তার জবাব পাবেন!

অনাহত চক্র পার হচ্ছি বুঝতে পারছি। ধ্যানে বসলে মুহূর্তের মধ্যে প্রাণবায়ু অনাহত চক্রে টেনে তুলছে। তারপর নীল আকাশে ক্রমশ জ্যোতি ছড়িয়ে পড়ছে। সেই জ্যোতি চোখের পাতা চেপে ধরলে লক্ষকোটি সূর্য হয়ে যেন একত্রে জ্বলে উঠছে। চতুর্দিক আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে যাচ্ছে। আবার নীল রঙ ফুটছে, নীলের বুকে আলো জ্বলে উঠছে। মনে হচ্ছে, আলো ছাড়া আর কিছু নেই। আশ্চর্য আলো, কোনো দাহ নেই। আলোর অঙ্গভরতি চন্দ্রকিরণের স্নিগ্ধতা। সমগ্র চেতনা সেই আলোময় হয়ে যাচ্ছে। ব্যক্তিসত্তার আর কোনো বোধই যেন থাকছে না। আনন্দময় এক পরম আলোর মধ্যে নিজের সমগ্র সত্তাকে আলোময় বোধ হচ্ছে।

কখনও কখনও সেই আলোর জগৎ ভেদ করে চেতনা আরও উর্ধ্বে ওঠার চেষ্টা করছে। আবার নীল, জ্যোতির্ময় নীলরঙ ফুটছে, আবার আলো। শ্বাসপ্রশ্বাস থাকছে না। ভ্রূমধ্যস্থ অংশে যেন প্রচণ্ড একটা শক্তি দুলে-ফুলে উঠতে চাচ্ছে। Spinal cord দিয়ে একটা শক্তি উপরে উঠে যাচ্ছে। সমগ্র Spinal cord তখন শক্ত হয়ে

দাঁড়িয়ে থাকছে! আসন ছেড়ে হাল্কা একটা পাখির মত উপরে উঠে যাচ্ছি। কখনও কখনও ভ্রূমধ্যস্থ অংশে যেন অগ্নি বিস্ফোরণ হচ্ছে। অগ্নিস্রোত লাভাস্রোতের মত ছড়িয়ে পড়ছে। কখনও কখনও গোধূলির আকাশের মত একটা স্থির আকাশ দেখতে পাচ্ছি। স্বর্ণবর্ণ আকাশ। অপরিসীম আনন্দ সেই আকাশে। আমার সাধক জ্যোতিষীকে সে-কথা জিজ্ঞাসা করতে তিনি বললেন, আপনি উপনিষদে বর্ণিত হিরণ্যগর্ভ পর্যায়ে প্রবেশ করেছেন। এঁকেই স্রষ্টা ঈশ্বর বলা হয়। আর বেশিদূর নেই, এবার কিছুদিন পরেই মহাসমুদ্ররূপ পরম শান্ত পরমাত্মনকে দেখতে পাবেন। এখন আর নিশ্চয়ই লোভ, ক্রোধ, ঘৃণা ইত্যাদি আপনাকে আকর্ষণ করছে না?

বললাম, না।

জ্যোতিষী বললেন, এগিয়ে যান। মোহ দ্বারা আচ্ছন্ন হয়েছিলেন। কর্দমমুক্ত হয়ে আপনার ভেতরের হীরকখণ্ড জ্বল জ্বল করে জ্বলে উঠছে। জন্ম-জন্মান্তরের সাধনা ছিল, তাই। নইলে বহু জন্ম কেটে গেলেও, যা আপনি লাভ করেছেন, তা পাওয়া যায় না।

দুঃখ-যন্ত্রণাকাতর এই পৃথিবীর বাইরে যেন বিরাট একটি আশ্রয় পেয়ে গেছি! যে-কোনো অবস্থাই আসুক না কেন আমাকে যেন তা আর স্পর্শ করতে পারছে না। সময় পেলেই সেই বিস্তীর্ণ স্নিগ্ধ আলোর জগতে ডুবে যাচ্ছি, যেখানে পৌঁছাতে পারলে কোনো ভয়, কোনো বেদনা, কোনো দুঃখ, কোনো লাঞ্ছনা আর থাকে না।

একদিন এরই মধ্যে অদ্ভুত এক দৃশ্য দেখে চমকে উঠলাম। আজ্ঞা-চক্রের মুখে অগ্নি-বিস্ফোরণ হচ্ছে। বিচিত্র রঙের খেলা চলেছে। হঠাৎ সব কিছু সাম্য অবস্থায় এসে গেল। অকস্মাৎ দর্পণ-সদৃশ এক স্বচ্ছ স্থির জগৎ সামনে ভেসে উঠল। সেই দর্পণে অদ্ভুত একটি দৃশ্য দেখে চমকে উঠলাম। একটি ব্যাঘ্রাম্বর পরিহিতা নারীমূর্তি। মাথার চুলে দ্বিতীয়ার চাঁদ। সৌন্দর্যের ছটায় চতুর্দিক আলোকিত করে হাঁটছেন। সৌন্দর্যের নিজস্ব আলোর ছটা যে কী, আগে বুঝিনি। এই প্রথম বুঝলাম। সমগ্র হৃদয় মন আমার চমকে উঠল—কে! কে ইনি! মনে হল, পরমযোগিনী শিবানী দুর্গা ছাড়া ইনি আর কেউ নন। এ দর্শন যে বিশ্বাস হতে চায় না! আমি আমার পরিচিত পাঁচজন ব্যক্তিকে যে ভাবে দেখেছিলাম ঠিক সেই ভাবে দেখলাম। তাহলে? মূর্তিকে তো আমি এতকাল প্রতিমা বলে বিশ্বাস করেছি! তাহলে তা কি মিথ্যা? এই মূর্তির জীবন্ত সত্তাও আছে? তাঁরাই দেবদেবী? তাহলে কি দেবদেবীর মূর্তি কল্পনা-প্রসূত নয়? সাধকদৃষ্ট? সেই পাঁচজন পার্থিব ব্যক্তির দর্শন যদি সত্য হয়, তাহলে অনুরূপ জীবন্ত দেবীদর্শন মিথ্যে হবে তাই বা ভাবি কী করে?

সাধক-জ্যোতিষীর কাছে ছুটে এলাম, সব বললাম। জিজ্ঞাসা করলাম, আমি কী দেখেছি?

উনি বললেন, আপনি মহামায়ার দর্শন লাভ করেছেন।

—কিন্তু আমি যে এতকাল মূর্তিকে প্রতিমা বলে ভেবেছি? এক একটি ভাবের ইঙ্গিতময় রূপ বলে জেনেছি?

জ্যোতিষী হেসে বললেন, আমরা জগতের অনেক কিছুই তো জানি না।

বললাম, এ দর্শনের অর্থ কী?

তিনি বললেন, যোগসাধনার আর একটি ধাপ আপনার কাছে এবার খুলে যাবে।

অপরিসীম ধৈর্য নিয়ে আমি বসে আছি, সহস্রারের পথে আজ্ঞাচক্র ভেদ করে নতুন কোন্ জগতের সন্ধান এবার পাব কি না কে জানে!

মানুষের দেহ নাকি ক্ষুদ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ড। যত ধ্যান করছি ততই যেন সেই কথাটতে বিশ্বাস জন্মে যাচ্ছে। দেহ সুস্থ থাকলে ধ্যানে বসলেই অতি দ্রুত যেন ঊর্ধ্ব এক জগতে উঠে যাচ্ছি। বুঝতে কোনো অসুবিধা হয় না যে, মূলাধার থেকে প্রচণ্ড এক শক্তি হু-হু করে ঊর্ধ্ব দিকে উঠে যাচ্ছে। অদ্ভুত এক বায়ু যেন। মনে হয়, সমস্ত দেহটাকেই যেন সে তুলে নিয়ে যাচ্ছে।

বায়ু কোন্ চক্র ভেদ করে কোথায় আসছে, স্পষ্ট যেন বুঝতে পারি। মূলাধার থেকে মণিপুর চক্র ভেদ করতে আর যেন মুহূর্তমাত্র বিলম্ব হয় না। অল্প সময়ের মধ্যেই অনাহত চক্র অর্থাৎ বায়ুর অঞ্চল ভেদ করে গভীর নীল ও সূক্ষ্ম আলোর জগৎ 'বিশুদ্ধ চক্রে' চলে যাই। আজ্ঞা চক্রে উঠলেই স্পষ্ট বুঝতে পারি। কপালে দুই ভুরুর মধ্যবর্তী অঞ্চলে একটা প্রচণ্ড শক্তি যেন আমাকে টানতে থাকে। বিচিত্র রঙের খেলা চলতে থাকে। দেখি প্রচণ্ড নীল জ্যোতি।[১] গ্যাসের আগুন দিয়ে ঝালাই করার সময় যে তীব্র নীল রঙ দেখা যায় সেই রকম। সেই নীল আগুন একসময় অকস্মাৎ শত সূর্যের মত যেন একসঙ্গে বিস্ফোরিত হয়। তারপর স্যাকরার হাতের কাঠে সোহাগা দিয়ে গলানো সোনার মত জ্বলজ্বল করতে থাকে।

একদিন আকাশ যখন সোহাগা-গলানো সোনার মত ঝলমল করছে, হঠাৎ সামনে দেখি বাবাজি মহারাজকে। মনে হল, যেন সমগ্র আকাশটাই তাঁর যোগাসন। তিনি যেন বোঝাতে চাইলেন, আমিই সর্বত্র ব্যাপ্ত হয়ে আছি।

কত অদ্ভুত জিনিস দেখি। একদিন দেখি একটি ইয়াতি। বরফের ওপর আমি বসে আছি। অকস্মাৎ আমার দিকে যেন বরফ ফুঁড়ে বেরিয়ে এল। আমি ভয় পেলাম না। মা কালীর পদযুগল দেখলাম। কালীঘাটের জ্যোতির্ময়ী কালীমূর্তি দেখলাম। এতো মূর্তি, প্রতিমা, তবে দেখলাম কেন? এসব হয়তো মনের সংস্কারেরই প্রতিচ্ছবি।

আজ্ঞাচক্র থেকে সেই প্রচণ্ড বায়ুসদৃশ শক্তি যদি আরও উপরে উঠতে চায় অদ্ভুত

১. বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রের কাছে আলো এমনই তীব্র নীলাভ হয়। See The Cambridge Atlas of Astronomy, p. 322. Ed. J. Audouze and G. Israel.

এক অভিজ্ঞতা হয় তখন। মনে হয়, সব কিছুই যেন কপালের উপর থেকে গোল হয়ে ব্রহ্মরন্ধ্রের দিকে যাচ্ছে, চৈতন্য প্রায় হারিয়ে যাচ্ছে, চলছে নানা বর্ণের বিচিত্র খেলা। কখনও তীব্র আলো, কখনও জ্যোতির্ময় বর্ণহীন মহাশূন্য। সে জ্যোতির বর্ণনা করা যায় না, কিন্তু বোধহয়। হঠাৎ যেন আজ্ঞাচক্র থেকে সূক্ষ্ম 'ওঁ'কার ধ্বনি একটানা উঠে নিজেকে হারিয়ে দিতে চায়।

হঠাৎ কোনো কোনোদিন দেহের অণুতে-পরমাণুতে কী এক জীবনশক্তি যেন সঞ্চারিত হয়। স্নিগ্ধ এক ছায়া ছায়া জ্যোতির্ময় জগতে প্রবেশ করি। হঠাৎ সেখান থেকে কেমন যেন গুটিয়ে যাই। সমগ্র দেহে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বোধ হারিয়ে যায়। শুধু মাথার কাছে একটা অদ্ভুত বোধ অনুভব করি। মাতৃগর্ভে শিশুর মত ছোট হতে হতে যেন ভ্রূণ হয়ে যাই। তারপর অকস্মাৎ কোথায় হারিয়ে যাই। কিন্তু সেখানেই যে বোধহীন অবস্থায় থাকি তা নয়, আবার জ্যোতিসমুদ্রে ফিরে আসি। সৃষ্টির এক নিত্যলীলা যেন প্রকাশিত হয়ে যায়। অনন্ত কাকে বলে আগে যথার্থ বোধ করিনি। এখন দেহের ভেতরকার বায়ু বিশুদ্ধ চক্রে এলেই সেই অনন্তের গভীর স্বাদ পাই। বিরাট ব্যাপ্তি বিহ্বল করে দিয়ে অপার আনন্দ দেয়। কোনো দিন সত্যি সত্যিই দেহটা এমন হাল্কা হয়ে যায় যে, আসন থেকে স্থূল এই দেহটা নিয়েই উপরে উঠে যাই। চেতনা ব্রহ্মরন্ধ্রের কাছাকাছি আমাকে এক অদ্ভুত আলোর জগতে নিয়ে যায়। মনে হয়, আমার চতুর্দিকে আকাশের জ্যোতিকণা একটি বলয় সৃষ্টি করছে যেন। যেন সমগ্র বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যমণি আমি।

কোনো কোনোদিন ধ্যানের তীব্রতা এত বেড়ে যায় যে, চোখ খুলে যায়। অনন্ত জ্যোতিসমুদ্রে সমগ্র বস্তুজগৎই তখন যেন ডুবে আছে। তাকিয়ে থেকেও চতুর্দিকে অনন্ত আকাশ দেখি।

অদ্ভুত কতকগুলি জিনিস দেখতে আরম্ভ করেছি ইতিমধ্যেই। বহু পরিচিত মানুষকে ধ্যানের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন কর্মব্যস্ততাতে দেখি। সময় মনে রেখে, তাদের জিজ্ঞাসা করতেই, তারা যেন চমকে উঠছে। আমি জানলাম কি করে ভেবে অবাক হচ্ছে।

আমার বন্ধু বেহালা ফোটো স্টোর্সের মৃত্যুঞ্জয় সামন্ত। একদিন দেখি হিমালয়ের এক জায়গায় পাথরে পা-দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথায় ক্রিকেট খেলোয়াড়দের টুপির মতন। তাকে জিজ্ঞেস করতে সে বললে, হিমালয়ে সে গিয়েছিল বছর বিশেক আগে। কী পোশাক পরে গিয়েছিল খেয়াল নেই। কিন্তু বহু ফোটো তাঁর কাছে আছে, খুঁজে দেখবে। কয়েক দিন বাদে তাঁর সঙ্গে দেখা হতে সে সেই ফোটোটি দেখাল। বলল, তুমি জানলে কী করে?

কী করে যে জানলাম তা আমিও বলতে পারব না।[১]

---

১. এর ব্যাখ্যা লেখকের 'দিব্যজগৎ ও দৈবীভাষা' গ্রন্থে আছে।

ক্রমশ যেন অবাক হচ্ছি। ধ্যানে নয়, জাগ্রত দৃষ্টিতেই যেন অনেক সময় চোখের উপর অদ্ভুত অদ্ভুত দৃশ্য দেখতে পাচ্ছি। এই বই লেখার সময়ই গত ২৫।৮।৮৩ তারিখে দুপুরবেলা বাড়িতে বসে দেখি কলেজ স্ট্রিটে প্রচণ্ড বৃষ্টি হচ্ছে। লোকজন হাঁটুজল ভেঙে হাঁটছে। অথচ টালিগঞ্জ, আমি যেখানে থাকি, সেখানে বৃষ্টির কোনো চিহ্নই নেই। চারটে নাগাদ মিনিবাসে করে বেরিয়ে যখন বিনয়-বাদল-দীনেশ বাগে গেলাম, তখন বৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে মেঘ মাথার উপর আনাগোনা করছে। হেঁটে কলেজ স্ট্রিট গেলাম। যখন পৌঁছোলাম টিপটিপ করে বৃষ্টি পড়ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই তুমুল কাণ্ড। সমগ্র কলেজ স্ট্রিট যেন ডুবে গেল। অতি কষ্টে বাস পেলাম। সত্যিই সারা কলেজ স্ট্রিটে লোকজন হাঁটুজল ভেঙে হাঁটছে। এ দেখার পেছনে যে রহস্য কি, আমি যেন নিজেই তা বুঝতে পারছি না। কিন্তু অদ্ভুতভাবে বিশ্বাস জন্মে যাচ্ছে আমাদের ঋষিবাক্যে, শাস্ত্রবাক্যে। ভগবদ্‌গীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন। বিশ্বরূপে ত্রিকাল অর্থাৎ অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একই সঙ্গে ধৃত। যা ঘটেনি, তাও ঘটে আছে। এতদিন একে হেঁয়ালি বলে ভাবতাম। কিন্তু আজ নিজের অভিজ্ঞতা থেকে মনে হচ্ছে এ তো মিথ্যে নয়! তা যদি হত, তাহলে বিশ বছর আগের মৃত্যুঞ্জয় সামন্তের ছবি আমি দেখব কী করে? কি করে কলেজ স্ট্রিটে ২৫।৮।৮৩ তারিখের বিকেলে যা ঘটবে, দুপুর বেলায় টালিগঞ্জে বসে তা দেখতে পাচ্ছি?

এ থেকে আরও একটি জিনিস যেন আমার জ্ঞান হচ্ছে। 'সচ্চিদানন্দ' শব্দের অর্থটাও যেন আমি বুঝতে পারছি। ধ্যানের মধ্যে তিনটি বিশেষ জগৎ এখন আমার কাছে অত্যন্ত পরিচিত—একটি জ্যোতিসমুদ্র, যা দেখলে অপার আনন্দ হয়। একটি দর্পণসদৃশ জগৎ, যেখানে গেলে ভূত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ সবই দেখা যায়। আর একটি অবর্ণনীয় স্নিগ্ধ-ছায়ার জগৎ, যেখানে গেলে গভীর নিদ্রার মত পরম শান্তি। জ্যোতিসমুদ্র সচ্চিদানন্দের আনন্দ-অংশ। দর্পণের জগৎ তাঁর চৈতন্য অর্থাৎ চিৎ-এর অংশ, যে চৈতন্যের কাছে সবই স্পষ্ট। ছায়া-ছায়া স্নিগ্ধ নির্বিকল্প জগৎ সৎ-এর জগৎ, অর্থাৎ নির্গুণ ব্রহ্মণের জগৎ। সেই সৎ-এর জগতে ওঠার আগে মাথার উপর গলানো রুপোর স্রোতের একটা আলপনা দেখি। তখন বুঝতে পারি, এই হল যোগীদের সহস্রারের চিত্র। তারপরই পরম স্নিগ্ধ ছায়া-ছায়া জগতে চলে যাই। ডান দিক থেকে বাঁ-দিকে ঘূর্ণাবর্তে যেন ঘুরতে থাকি। তারপর একটি বিন্দু লক্ষ্য করে এগিয়ে যাই। প্রতিমা যেমন ধীরে ধীরে জলে ডুবে যায় তেমনি এক মহা অবর্ণনীয় শান্ত জগতে হারিয়ে যাই।

– সমাপ্ত –